প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠ কবিতা

কবিশেখর কালিদাস রায়

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ১

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা

আদি-মধ্য ও আধুনিক যুগ ১৫·০০

আদি ও মধ্যযুগ ৮·৫০

আধুনিক যুগ ৭·৫০

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস ৯·০০

ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২০·০০

রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১২·০০

বাংলার বাউল ও বাউল গান ৩০·০০

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড ৫·০০

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ২য় খণ্ড ৫·০০

রবীন্দ্র-বিচিত্রা ৫·৫০

নানা-রকম ৬·০০

সুশীল রায়

বঙ্গ-প্রসঙ্গ ৭.৫০

মনিষী-জীবন-কথা ১০·০০

অধ্যাপক গোপাল হালদার

সংস্কৃতির-রূপান্তর ১২·০০

বাঙালী সংস্কৃতি-প্রসঙ্গ ৬·০০

ঋষি দাস

শেক্সপীয়র ৮·০০

বার্ণার্ড শ' ৬·০০

গান্ধী-চরিত ৬·০০

অধ্যাপিকা প্রতিভা গুপ্ত

সমাজ ও শিশু-শিক্ষা ৬·০০

সমাজ ও শিশু-সমীক্ষা ৮·০০

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৬·০০

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ৫·০০

ডক্টর সুরেশচন্দ্র মৈত্র

বাংলা কবিতার নবজন্ম ১৫·০০

● ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ●

ছোটখাটো পাহাড়ের টিলা-ছড়ানো মাঠে
বর্গির ঘোড়সোয়ারের মত মেঘের ছায়া হঠাৎ এসে পড়ে,
মাঝখানের উপত্যকায়
বালুশয্যাসঞ্চারিণী
প্রোষিতভর্তৃকা নদী
পূব হাওয়াকে মনে করে দূর বিদেশের হরকরা,
পিঠে তার মেঘের পুঁটুলি,
ঝর্নার ঝঙ্কারে শোনে তার বল্লমের ঘুন্টির আওয়াজ।

মেঘ আরো জমে,
ছায়ার উপরে পড়ে ছায়া,
নদীর জলের তলা অবধি অন্ধকার হয়।
যমুনার বন্যার মত ছায়ার সীমানা এগিয়ে আসে,
পড়ে ওই পাহাড়টার চূড়ায় ;
গম্ভীরের কণ্ঠে লম্বমান ছায়া,
ধূর্জটির কণ্ঠে কালনাগিনী।
মেঘের ছায়া আরো গড়ায়,
এসে পৌঁছায় তোমার আঙিনার উপান্তে।
আমি সেই কথাই ভাবছি।
আর ভাবছি
সেই কালো ছায়ার প্রত্যুত্তরে
তোমার কালো চোখের কূলে কূলে না জানি কি সম্ভাবনার জাগে আভা।
খসে-পড়া অঙ্গুরীর মত তোমার মন তলিয়ে যায় কোন্ অতলে ;
জেগে ওঠে কত অপূর্ব স্মৃতি,
কত বিচিত্র আহ্বান,
কত বিস্মৃত বেদনা,
কত প্রণয়,
কত জননান্তর সৌহার্দ্যের সুখোদ্বেগের কশা।

কালো চোখের কালো বিদ্যুতে
আর কালো মেঘের বিদ্যুৎমালায়
তখন চলে মাল্যবিনিময়ের প্রতিযোগিতা !
দুই-ই অফুরান ।

গুরু গুরু ডাকে মেঘ,
দুরু দুরু তার উত্তর—তোমার বুকে,
থম্ থম্ করে ছায়া,
ছল্ ছল্ করে জল—তোমার চোখে,
মেঘ রচনা করে অলকা,
তোমার আঙিনায় আজ উজ্জয়িনী,
মেঘের ভূর্জপত্রে বিদ্যুতের বাঁকা অক্ষরে কার বিরহলিপি !
সুন্দরী, তুমি চিরযুগের যক্ষিণী !
আজ আমি ভাবছি সেই কথা,
আজ আমি দেখছি সেই ছবি !
সত্যি কথাই বলছি,
আজকের আগে এমন ক'রে মেঘোদয় দেখিনি ।
তোমার প্রশ্নের উত্তর পেলে কি ॥

আমি টাইম-টেবল পড়ি

আমি টাইম-টেব্‌ল পড়ি,
জানালার ধারে ব'সে,
বাইরের দিকে তাকিয়ে
একা একা আমি টাইম-টেব্‌ল পড়ি ।
কালো-আঁক-কাটা পাতাগুলো
দ্রুত উলটিয়ে যাই,

প্রমথনাথ বিশীর

শ্রেষ্ঠ কবিতা

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল)
কলিকাতা ১২

প্রথম মুদ্রণ :
মাঘ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল),
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা ৬

বাঁধাই :
মডার্ণ বাইণ্ডার্স
কলিকাতা ৬

দাম :
ছয় টাকা

শ্রী জাহাঙ্গীর জিবাজি ভকল
প্রীতিভাজনেষু

১৯৬১

ভূমিকা

শ্রেষ্ঠ কবিতার শ্রেষ্ঠ শব্দ এখানে সামান্যার্থে গ্রহণ করতে হবে। তেমন জুৎসই শব্দ না পাওয়ায় শ্রেষ্ঠ শব্দ ব্যবহৃত হ'ল, কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করবার ইচ্ছা ছিল না।

পূর্বে প্রকাশিত আটখানি কাব্যগ্রন্থ হ'তে কবিতাগুলি নির্বাচিত। তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর ও 'প্রাচীন গীতিকা হইতে'র সমস্ত কবিতাই গৃহীত হইয়াছে—ওগুলি কাহিনীকাব্য।

'রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ের কবিতাগুলি সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রন্থাকারে প্রকাশ এই প্রথম। অগ্রন্থিতা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। অগ্রন্থিতা শব্দের তাৎপর্য্যও ঐখানে, যা গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।

'প্রাচীন আসামী' পর্যায়ের কবিতাগুলির বৃহত্তর সংস্করণ 'যুক্তবেণী' এ গ্রন্থভুক্ত হয়নি। আর 'প্রাচীন পারসীক' পর্যায়ের কবিতাগুলি এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, সময়ে ও সুযোগে হবে আশা করছি।

বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রুফ সংশোধনের গুরু দায়িত্ব না গ্রহণ করলে এ সংকলন আদৌ প্রকাশিত হ'তো কিনা সন্দেহ। তাঁর সঙ্গে আমার অশেষ প্রীতির সম্পর্ক, আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে সে প্রীতির গৌরব ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। অলমিতি—

প্র.

সূচীপত্র

ভূমিকা

॥ ১ ॥

বাংলার ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ একটি বিশিষ্ট ঘটনা। বাঙ্গালীর ভাগ্যপরিবর্তনের জন্য যে-সকল ঐতিহাসিক ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে হয় পলাশির যুদ্ধ তার মধ্যে একটি। লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় সামাজিক ব্যবস্থাতে যে-আলোড়ন এনেছিল পলাশির যুদ্ধের তুলনায় তা নগণ্য। পলাশির যুদ্ধ কেবলমাত্র এক পক্ষের জয় ও অপর পক্ষের পরাজয় সূচিত করে না, বরং এই যুদ্ধ বাঙ্গালীর মানসজগতে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। পলাশির যুদ্ধে বাঙ্গালীর পরাজয়ে গ্লানি আছে একথা সত্য, কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে বাঙ্গালীর কাছে যে-নবদিগন্তের সূচনা দেখা দিয়েছিল তা-ই ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মানসলোকে যে-অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেই কারণে পলাশির যুদ্ধকে গ্রাম্য কবি ছড়ায় গানে স্মরণীয় করে রেখেছে। ঐতিহাসিকেরা এই যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কাব্যে, নাটকে, ইতিহাসে এই যুদ্ধ বাঙ্গালীর হৃদয়ে নানা সময়ে বিভিন্ন প্রেরণা জুগিয়েছে। রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' গ্রন্থে কিংবা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি' পুস্তকে সিরাজের পতনের যে-দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে তাই আর একটু বিস্তৃত হয়ে মার্শম্যানের ইতিহাসে স্থান পেল। পরে সিভিলিয়ান Charles Stewart তাঁর 'History of Bengal' গ্রন্থে সিরাজউদ্দৌলার কাহিনী বিস্তৃততর করলেন। নবীনচন্দ্র সেন 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য লিখে বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাঁর আসন পাকা করে দিলেন। কবির ত্রুটি ক্ষালন করলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থ লিখে। এই ইতিহাসকে সম্বল করে গিরিশচন্দ্র লিখলেন তাঁর স্মরণীয় নাট্যগ্রন্থ 'সিরাজদ্দৌলা'। একালে তপনমোহন

চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'পলাশির যুদ্ধ' লিখে প্রমাণ করলেন যে এ-যুগেও সিরাজ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর কৌতূহল জাগ্রত। সুতরাং 'পলাশির যুদ্ধ' কেবলমাত্র বিষয়গৌরবেই যে বাঙ্গালীর চিত্তাকর্ষক হবে সে-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই।

নবীনচন্দ্র সেনের খ্যাতি রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের রচনার উপর নির্ভর করে। এই 'ত্রয়ী'র সমাজ-ইতিহাস-বিশ্লেষণের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 'ত্রয়ী'তে নবীনচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণের গূঢ় প্রেরণার দিকটিকে বিস্তৃত করেছেন, সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন; এক জাতি, এক প্রাণের মন্ত্র উচ্চারিত করেছিলেন। 'পলাশির যুদ্ধে' সে-রকম অভীপ্সার দাবি করলে অনেকেই আপত্তি করবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত বাঙ্গালীর শোচনীয় পরাজয় কবিকে যে পীড়িত করেছিল সে-তথ্য এ-কাব্যে আছে। কবি 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য রচনা করে বাঙ্গালীর চেতনাকে জাগাতে চেয়েছিলেন, ইতিহাসের অমোঘ সত্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন। এ-কাব্য যদি নিছক মুহূর্তের প্রেরণা-সঞ্জাত হত তবে হয়তো এর প্রাথমিক খসড়াটিকেই কবি বহাল রাখতেন। কিন্তু কবি ইতিহাসকে অবলম্বন করে যে-জাতীয় স্পন্দন অনুভব করেছিলেন তাকেই বিস্তৃত করে বৃত্ত রচনা করলেন প্রাথমিক কবিতাটিকে কেন্দ্র করে।

॥ ২ ॥

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র সেনের চট্টগ্রামে নোয়াপাড়া গ্রামে জন্ম হয়। পিতার নাম গোপীমোহন রায়, মাতা রাজরাজেশ্বরী। জাতিতে তিনি ছিলেন বৈদ্য। বাল্যকালে তিনি দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং জেনারেল এসেম্ব্লিস ইনস্টিটিউশনে শিক্ষালাভ করেন। চট্টগ্রামে জন্ম বলে সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য কবির কাব্যে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রভাব

ফেলেছে। অনেকে মনে করেন পার্বত্য অঞ্চলের প্রকৃতির যে-রুদ্র-মূর্তি প্রকাশ পায় তাই কবিকে উচ্ছ্বাসপ্রবণ করে তুলেছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কবির বিবাহ হয়। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে কবি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান। চাকুরি-জীবনে তিনি নানা লোকহিতকর কার্য করেছিলেন। তাঁর সরকারী বিচারবিচক্ষণতার খ্যাতি হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সঙ্গে কবি বহুকাল যুক্ত ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভার অতি অল্প বয়সেই বিকাশ হয়েছিল। 'এডুকেশন গেজেটে' তাঁর বহু কবিতা বার হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় নবীনচন্দ্রের কবিতার অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং আর্থিক দুর্গতির দিনে বিদ্যাসাগর মহাশয় নবীনচন্দ্রকে সাহায্য করেন। বঙ্কিম-পরিবারের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। নবীনচন্দ্রের কবিতার গুণগ্রাহী ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা 'আমার জীবনে' উল্লিখিত আছে। সঙ্গীতচর্চায় কবির যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি কবির প্রবল কৌতূহল ছিল। ধর্মমত সম্বন্ধে কবির কোন গোঁড়ামি ছিল না। বুদ্ধদেব, খ্রীষ্টকে তিনি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। কবির রচনাবলীর একটি তালিকা দিচ্ছি ঃ

অবকাশ-রঞ্জিনী,	প্রথম ভাগ,	১২৭৮ বঙ্গাব্দ
অবকাশ-রঞ্জিনী,	দ্বিতীয় ভাগ,	১২৮৮ ,,
ক্লিওপেট্রা	...	১২৮৪ ,,
পলাশির যুদ্ধ	...	১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ
রঙ্গমতী	...	১৮৮০ ,,
রৈবতক	...	১৮৮৭ ,,
কুরুক্ষেত্র	...	১৮৯৩ ,,

গাড়ির উল্টো মুখে যেন
উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে
মাইল-স্টোনের পাথর।

ওই জানালার ধারে ব'সেই আমার ট্রেন লম্বা পাড়ি দেয়।
ঘন ঘন নদীনালার সাঁকো,
ছ'দিকে ধানক্ষেত,
পচা পুকুর,
বাঁশঝাড়,
আম-কাঁঠাল-নিম-শিরীষের জড়ানো ছায়াতে
ধোঁয়া-ওঠা কুটির,
বিলে শাপলা,
মাঠে কৃষাণ,
আকাশে চিল,
ধূলোর-আঁচল-ওড়া পথের প্রান্তে এইমাত্র-মিলিয়ে-যাওয়া
গোরুর গাড়ির আর্তনাদ,
তন্দ্রাভাঙা কুকুরের ক্ষুধিত কণ্ঠ,
মাঝখানে ট্রেন ছুটেছে জাঙাল-বাঁধা পথে।
আমি কিন্তু জানালার ধারেই ব'সে।

ক্রমে পৃথিবীর চেহারা বদলে আসে।
নারকেলের জায়গায় তাল,
আমের জায়গায় শাল,
বিলের জায়গায় বাঁধ
চমকিত করে তার ইস্পাতধবল বারি,
মাটিতে ঢেউ জাগে,
ভূস্তরের নিস্তব্ধ ওঠাপড়া বিস্তারিত হয়ে যায়
দিগন্তের দিকে,

বনচিহ্নহীন নিঃসীম দূরত্বে
কয়েকটি শীর্ণ তাল
শূন্যতার কঙ্কাল।
হঠাৎ শালবনের মধ্যে গাড়ি ঢুকে পড়ে।
সাঁকোর ঝঙ্কারে বাইরে তাকিয়ে দেখি
নদীর বালুশয্যায় পাথর-চুয়ানো জল,
অর্ধমগ্ন মহিষের পাল ;
মনে মনে ডুব দিয়ে নিই।
পরে পরে এসে পড়ে ছুটো সিগনালের খুঁটি,
তারপরেই স্টেশন।
গাড়ি থামে,
লোক নামে ;
কেউ কেউ চড়ে,
কেউ কেউ বা শুধুই ছুটোছুটি ডাকাডাকি ক'রে মরে।
হুইস্‌ল বাজে,
নিশান দোলে,
গাড়ি ছেড়ে দেয়।
আবার মাঠ, আবার বন,
আমি কিন্তু জানালার ধারেই ব'সে।

হেলে-পড়া সূর্যের চক্‌চকে সাঙন
জানালা দিয়ে খোঁচা মারে,
চম্‌কে স'রে বসি,
বুঝতে পারি, দিন শেষ হয়ে আসবার মুখে।
একে একে জনপদের চিহ্ন দেখা দেয়—
কল, কুঠি, ধোঁয়া, শব্দ,
কুলিদের সারিবদ্ধ বারিক।

প্রভাস	...	১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ
খৃষ্ট	...	১২৯৭ বঙ্গাব্দ
অমিতাভ	...	১৩০২ „
অমৃতাভ	...	১৩১৬ „
ভানুমতী	...	১৩০৭ „
আমার জীবন	...	১৩১৪-২০ „

'বঙ্গদর্শন', 'জন্মভূমি' ইত্যাদি পত্রিকায় কবির লেখা বার হত।

॥ ৩ ॥

'পলাশির যুদ্ধ' লিখে নবীনচন্দ্র অতি সহজেই জাতির চিত্তে সাড়া আনতে পেরেছিলেন। তার কারণ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে তখন পরাধীনতার গ্লানি দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল। নিজবাসভূমিতে পরবাসী হয়ে থাকার বেদনা যে বাঙ্গালীকে পীড়িত করে তুলছিল সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দেশীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন। আত্মমর্যাদা-প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যাসাগর প্রমুখ দেশীয় মনীষীদের কথা স্বভাবতই মনে আসে। রঙ্গলাল তাকেই সাহিত্যে প্রতিভাত করতে চেয়েছিলেন। এমন কি মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যেও স্বদেশচর্চার ইঙ্গিতটি দুর্লক্ষ্য নয়। সব দিক থেকে সর্বাঙ্গীণ জাতীয় উন্নতির জন্য তখনকার বাঙ্গালী যে-চেষ্টা করেছিলেন তার একটি উজ্জ্বল চিত্র শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে দিয়েছেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের 'মৃণালিনী' হেমচন্দ্রের 'স্বদেশ-সঙ্গীত', চৈত্র-মেলা, ন্যাশন্যাল থিয়েটার ইত্যাদি বাঙ্গালীর আত্মজাগরণের ইতিহাস। এই সময়ে যে-সমস্ত নাটক বেরিয়েছিল সেগুলির বিষয়বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় প্রেরণাই এগুলির মুখ্য উৎস ছিল। বিশেষ করে হিন্দু-মেলার বিবরণ অনুধাবন

করলে এটা স্পষ্ট হয় যে নবীনচন্দ্র পরোক্ষভাবে হলেও স্বদেশ-চর্চার বাণীটি এখান থেকে কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করেছিলেন। সুতরাং এই সময়ে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য যে তুমুল সাড়া জাগাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

'পলাশির যুদ্ধ' রচনা করবার বহু আগে থেকে নবীনচন্দ্রের স্বদেশচর্চার ইঙ্গিত পাই। তিনি খণ্ড কবিতায় স্বদেশপ্রেমের কথা উচ্চারণ করেন। সে-সম্বন্ধে কবির উক্তি শোনা যেতে পারে। 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র কবিতাগুলি কেন অনেকের ভাল লেগেছিল সে-সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র বলেছেন: "'এডুকেশন গেজেটে' লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয়, স্বদেশ-প্রেমের নামগন্ধ বাঙ্গালীর কাব্যে কি কবিতায় ছিল না। হেম বাবুর 'ভারত-সঙ্গীত' আমার স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক বহু কবিতা-প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয়। এই নূতন যুগ এমনই একটা নূতন উচ্ছ্বাস সকলের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়াছিল যে, যশোহরের বন্ধুরা আমার কোনও কোনও কবিতা মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং সর্বদা আওড়াইতেন। তাহার একটি কবিতা—

'ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর
কেন পড়িলাম? আহা! কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়?
আর্যবংশ-কীর্তিচয়—
কেন দেখিলাম? আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর।'

"এ কবিতাটি বন্ধুরা মুহুর্মুহুঃ আবৃত্তি করিতেন। এ-স্বদেশপ্রেম কলেজে অধ্যয়নসময়ে আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, এবং যশোহরে শিশিরবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া উহা দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকে। বোধ হয়, শিশিরবাবু গদ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এবং আমি পদ্যে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণ করি। চত্বারিংশ বৎসর পরে সেই স্বদেশ-প্রেমের ক্ষুদ্র নির্ঝর-ধারা কলনাদিনী

ভাগীরথী-রূপে কর্জন-ঐরাবতকে উড়াইয়া ছুটিয়াছে। এত দিনে আমরা প্রকৃতরূপে মা পতিতপাবনীর দর্শন পাইয়াছি। মা, তুই সগরবংশের ধ্বংসপ্রাপ্ত ষাট হাজার সন্তানকে উদ্ধার করিয়াছিলি। আজ মা, মহাভারত সাগরবেষ্টিত সগরবংশের তোর ত্রিশকোটি অধঃপতিত সন্তানকে উদ্ধার করিয়া তোর পতিতপাবনী নাম সার্থক কর্ মা।" (আমার জীবন; বসুমতী সংস্করণ; পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪)।

কবিকে বোঝার দিক থেকে এই উক্তি মূল্যবান্। নবীনচন্দ্রের প্রাণে স্বদেশমন্ত্রের বীজ উপ্ত হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে। আর মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবন্ধাদি কবিকে যে অনুপ্রাণিত করেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহও যে কবিকে উৎসাহিত করেছিল সে-কথাও কবি আগে বলেছেন। তবে কবি যে বলেছেন 'এডুকেশন গেজেটে' লেখবার আগে স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধও কেউ জানত না সেটা অতিশয়োক্তি। অন্তত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রঙ্গলালের নাম কবির করা উচিত ছিল। সে যাই হোক, নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধে'র জন্য প্রস্তুতির কিছু ইঙ্গিত আমরা পেলাম। স্বভাবতই তখন স্বদেশপ্রেমের বাণী প্রচারের উৎস ছিল টডের রাজস্থান। কিন্তু নবীনচন্দ্র টডের রাজস্থান থেকে কাহিনী কেন গ্রহণ করলেন না তার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। এমন হতে পারে, কাব্যরচনার উপযোগী বিষয় তিনি তখন পর্যন্ত রাজস্থানের গল্পগুলির মধ্যে পাননি। তবে রাজস্থানকে বাদ দিয়ে বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রহণ করার পশ্চাতে ভিন্নতর কারণও থাকতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বাংলার কথা বলেছেন। তিনি বখতিয়ার খিলজির কাহিনীতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রকৃত তথ্যের অভাবে সংশয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠা করে বাংলার পুরাবৃত্তের আলোচনায় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী হয়ে বাংলার বেদনাকে প্রকাশ

করতে উদ্যত হলেন। তিনিও সব তথ্য পাননি। সংশয়স্থলে নিশ্চিত হতে পারেননি। কেবল বিষয়বস্তু নির্বাচন করে কবির বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। আশা করেছিলেন সিরাজের পতন বাঙ্গালীকে সচেতন হতে সাহায্য করবে। মোহনলালের বীরত্ব 'মলিন ভারত-মাতা'কে স্মিত হাস্যে ভূষিত করবে। 'পলাশির যুদ্ধে'র অন্য কৃতিত্ব যা-ই থাক না কেন, এই কাব্য যে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে পুরাবৃত্ত-চর্চায় কিঞ্চিৎ পরিমাণেও উদ্বুদ্ধ করেছিল তাতেই কাব্যটির সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে।

॥ ৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষকে নবীনচন্দ্র এক পত্রে তাঁর 'পলাশির যুদ্ধে'র পটভূমি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। সেখান থেকে জানতে পারি, নবীনচন্দ্র 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য রচনা করবার জন্য মার্শম্যানের ইতিহাস পড়েছিলেন। মার্শম্যানের ইতিহাসে (অতি সংক্ষিপ্ত) সিরাজের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করা ছিল। অন্ধকূপ-হত্যা সম্বন্ধে মার্শম্যান নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিছু পরে Stewart-এর 'History of Bengal'-এ সিরাজ-ক্লাইভ-মিরজাফরের কাহিনী বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হল। নবীনচন্দ্র নিশ্চয়ই এ-বই পড়েছিলেন। নবীনচন্দ্রের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির যে-অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে তা যে সঠিক নয় এ-বইগুলো থেকে তথ্য উদ্ধার করলেই তা বোঝা যাবে। পরবর্তী গবেষণা নবীনচন্দ্রের পক্ষে জানবার কথা নয়। 'পলাশির যুদ্ধ' লেখবার সময়ে নবীনচন্দ্রের সম্বল ছিল পূর্বোক্ত ইংরেজদের দ্বারা লিখিত ঐতিহাসিক তথ্য। এ ছাড়া দেশীয় ঐতিহাসিকদের গবেষণাও যে কিছু ছিল না তা নয়। তবে সিরাজের প্রসঙ্গ যাঁরাই উত্থাপন করেছেন তাঁরাই তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। নবীনচন্দ্র বলেছেন, তিনি ইতিহাস রচনা করেননি, কাব্য রচনা করেছেন মাত্র। সুতরাং যদি দেখি ঐতিহাসিক তথ্যের যাথার্থ্য মেনেও তিনি নূতন কিছু সংযোজন করতে পেরেছেন তবে

তা কৃতিত্বের বস্তু হবে। অবশ্য দেখতে হবে, এই সংযোজন কাহিনীর সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করেছে কিনা। ঐতিহাসিক কাব্যকার আরও একটি বিষয়ে কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। তা হল তিনি তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে কল্পনার যে-জাল বুনেছেন সেইটি যদি পরবর্তী গবেষণায় প্রামাণিক বলে প্রতিপন্ন হয়। কল্পনাকে প্রামাণিক হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু কল্পনাও যদি 'সত্যে' উপনীত হয় তা যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এবারে ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয় নেওয়া যাক। স্টুয়ার্ট অন্ধকূপ-হত্যা সম্বন্ধে যে-বিবরণ দিয়েছেন তার বিশদ বিবরণ এখানে উল্লেখ না করলেও চলবে। সৈন্যদের কারাগারে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর, স্টুয়ার্ট বলেছেন, "The door was immediately closed and locked ; and 164 (?) persons were thus confined, in the month of June, and in the torrid zone, in a room not twenty feet square, with only two small windows to admit air. For the detail of the horrid sufferings of these unfortuate persons, the reader is referred to the historian mentioned in the beginning of this chapter : Suffice it to say, that out of one hundred and forty six persons, only twenty-three survived the fatal night ; and these were so reduced they could barely stand." (Charles Stewart's, 'History of Bengal,' Pp. 539 ; Bangabasi Edition)। সম্ভবত এই উদ্ধৃতির মধ্যে একটি ছাপার ভুল আছে। প্রথমে ১৬৪ জন সৈন্যের কথা উল্লেখ করে পরে স্টুয়ার্ট ১৪৬ জনের কথা বলতে পারেন না। এই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝতে পারি, অন্ধকূপ-হত্যা কি বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সিরাজ-

চরিত্রের এই দূরপনেয় কলঙ্ককে কেউ কেউ ক্ষালন করবার চেষ্টা করেছিলেন। স্টুয়ার্ট যথন তাঁর বই রচনা করেন তখনও কেউ কেউ এ-সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁদের কথা স্মরণ করে স্টুয়ার্ট পাদটীকায় লিখেছেন : "For the credit of human nature, we would fain to believe the assertions of the native historians, who say the Nuwab knew nothing of this transactions; and that the conduct of the officer who confined them proceeded entirely from stupidity, and not from malevolence of cruelty." যদি সিরাজের অজ্ঞাতসারেও এ-ব্যাপার ঘটে থাকে তথাপি সিরাজকে এ-ব্যাপারে দায়ী না করে পারা যায় না। তার কারণ, রাজ্যের কর্তা তিনি। সুতরাং এ-কর্মের জন্য দায়ীও তিনি। অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় নবীনচন্দ্র সেনের প্রতি বিরূপ ছিলেন এই কারণে যে, নবীন 'অন্ধকূপ-হত্যা'কে সিরাজের উপর চাপিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্যের খাতিরে মৈত্রেয় মহাশয়ের এই অভিযোগকে সমর্থন করা যায় না। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী কালে আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয় 'অন্ধকূপ-হত্যা'র ঘটনাটি স্বীকার করেছেন (দ্রষ্টব্য 'History of Bengal,' Vol II; Dacca University)। তবে সৈন্যের সংখ্যা তিনি আরও কম বলেন। নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যে অন্ধকূপ-হত্যা সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করেননি, কিংবা ভ্রান্ত স্বদেশচর্চার মোহে ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকারও করেননি। এখানেই কবির কৃতিত্ব।

'পলাশির যুদ্ধে' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে সিরাজ-উদ্দৌলা সম্পর্কে কবির যে-ধারণা তা সিরাজের অনুকূল নয়। সিরাজ মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল, রমণী-আসক্ত ইত্যাদি। এগুলিও ইতিহাস থেকে নবীনচন্দ্র পেয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সিরাজ সম্বন্ধে এ-সকল উক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্য নয়। সিরাজ যে অত্যাচারী ছিলেন সেকথা আগে ও পরে অনেক ঐতিহাসিকই

বলেছিলেন। বিশেষত সিরাজের অত্যাচারের কথা তখন কিংবদন্তীর আকার ধারণ করেছিল। কিংবদন্তীতে বিশ্বাস-স্থাপনের প্রয়োজন নেই। তবে বাহুল্য বর্জন করে যেটুকু তথ্য আমরা পাই তাতে করে সিরাজকে আদর্শ নবাব হিসেবে দাঁড় করান যায় না। যদুনাথ সরকার Jean Law নামে কাশিমবাজারের ফরাসী প্রধানের উক্তি উদ্ধার করেছেন। এঁর উক্তিকে অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। কারণ, ইনি সিরাজকে রক্ষা করবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি বলেছেন: "The character of Siraj-ud-daulah was reputed to be one of the worst ever known. In fact, he had distinguished himself not only by all sorts of debaucheries, but by a revolting cruelty." জগৎশেঠদিগের মন্ত্রণার যে-ছবি নবীনচন্দ্র কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন তা যে সর্বৈব সত্য Jean Law-র উক্তি থেকেই তা প্রমাণিত হবে। সিরাজকে কেন্দ্র করে তখন যে-ষড়যন্ত্রের বীভৎস রূপ আমরা লক্ষ্য করি তা মোগল-আমলের পতনদশার অনুরূপ। নবীনচন্দ্র নবাবী আমলের শেষ দশার চিত্র দিয়েছেন। এই সময় বাঙ্গলার সমাজব্যবস্থায় অনাচার এসেছিল, নবাবী ঐতিহ্য কলঙ্কিত হয়েছিল। যদুনাথ সরকার মহাশয় 'The fall of Moghul Empire', পঞ্চম খণ্ডে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তথাপি নবীনচন্দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের অভিযোগ মেনে নিয়ে বলেছিলেন সিরাজের জন্য তিনিই সর্বপ্রথম দুফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন। সিরাজের প্রতি নবীচন্দ্রের এই সহানুভূতি রাণী ভবানীর উক্তিতে পাই, কাব্যের শেষে সিরাজের শোচনীয় পতনের পূর্বমুহূর্তগুলিতে পাই। বলা বাহুল্য, এ-সিরাজ বাংলার আশা-আকাক্ষার প্রতীক। সিরাজউদ্দৌলা উপলক্ষ্য মাত্র। কবির বেদনা সিরাজের পতনমুহূর্তে পরিস্ফুট হয়েছে:

"নামিল যখন,
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ ; নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা,—হইল স্বপন!"

কবির ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে চমক নেই। কেননা, সত্যই সিরাজের পতনই ইংরেজ-প্রভুত্ববিস্তারের প্রথম মাইলস্টোন। সুতরাং 'পলাশির যুদ্ধে' দেশচর্চার যে-ইঙ্গিত রয়েছে তা সিরাজ-চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখানো সম্ভব ছিল না। অপেক্ষাকৃত জ্ঞাত চরিত্র সম্বন্ধে কল্পনার আশ্রয় নেওয়াও সম্ভব নয়। কবি সেই কারণে স্বল্পজ্ঞাত চরিত্র মোহনলালের সাহায্যে তাঁর কথা বলবার অবসর পেয়েছিলেন। মোহনলাল নবীনচন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি। মোহনলালকে অবলম্বন করে পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্র রায় যে-সুদীর্ঘ উপন্যাস রচনা করে-ছিলেন তার উৎস বোধকরি নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য। গ্রন্থমধ্যে রাণী ভবানী, জগৎ শেঠ, ক্লাইভ সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। নবীনচন্দ্র এঁদের সাহায্যে কাব্যটিতে ঐতিহাসিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। রাণী ভবানী সম্বন্ধে পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। সুতরাং নবীনচন্দ্র রাণী ভবানীকে কাব্যে চিত্রিত করে বাঙ্গালীর হৃদয়মন আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আরও একটি কথা, গ্রন্থের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার যে-চিত্র নবীনচন্দ্র এঁকেছেন তা-ও সে-যুগের লোকের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল। মৃণালিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র যা ইঙ্গিতে বলেছেন নবীনচন্দ্র এই কাব্যে তা স্পষ্ট করেছেন।

॥ ৫ ॥

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য-রচনার ইতিহাসটি নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' এইভাবে বলেছেন : "কলেজে অধ্যয়ন-সময়ে রামপুর-বোয়ালিয়া যাইবার পথে পলাশির যুদ্ধের ও যুদ্ধক্ষেত্রের যে-গল্প শুনিয়াছিলাম,

তাহা আমার সর্বদা মনে পড়িত এবং যুদ্ধক্ষেত্র সর্বদা আমার নয়নের সমক্ষে ভাসিত। আমি বলিলাম, আমি 'পলাশির যুদ্ধ' লিখিব। এরূপে কি কার্যের অঙ্কুর শ্রীভগবান কোথায় আমাদের অজ্ঞাতভাবে স্থাপন করেন, তাহা তিনিই জানেন। * * * আমি চিরদিনই একজন ব্যস্তবাগীশ। আমি তখনই 'পলাশির যুদ্ধ' একটি দীর্ঘ কবিতাকারে লিখিলাম। * * * আমি গবাক্ষের কাছে জাগরণ-ক্লান্ত ভাবে চেয়ারে বসিয়া পা দুখানি গবাক্ষের কাষ্ঠের উপর য়া, সেই উষার মনোহর বিকাশ-শোভা দেখিতেছিলাম এবং ধীরে ধীরে সদ্যরচিত এই কবিতাটি একরূপ অজ্ঞাতসারে জাগরণ-সুখ-কণ্ঠে আওড়াইতেছিলাম।"

"পোহাইল বিভাবরী পলাশি-প্রাঙ্গণে," ১৮৬৮ সালে এইভাবে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের গোড়াপত্তন হল। কবি ১৮৭৩ সালে এই কাব্যটি সমাপ্ত করেন। "একখানি ভগ্নাবশেষ বাঁশের দেউড়ির ঘরের এক কক্ষ কাপড়ের পর্দার দ্বারা সজ্জিত করিয়া আমার কবি-কক্ষ করিয়া লইলাম। গৃহ-নির্মাণের কার্যে তত্ত্বাবধান করিয়া প্রাতঃকালে মধ্যে মধ্যে যে-সময়টুকু পাইতাম, সে-সময়ে 'পলাশির যুদ্ধ' লিখিতাম।" কতদিনে এই কাব্যটি লেখা সমাপ্ত হয় কবি ঠিক বলতে পারেননি। তবে বেশি দিন লাগেনি। 'পলাশির যুদ্ধে'র খসড়াটি দেখবার সুযোগ কেউ পেয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে এইটি বুঝতে পারা যায়, অংশটি চতুর্থ সর্গের ছিল। বলা বাহুল্য, 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে চতুর্থ সর্গটিতেই কবির নিরাবরণ প্রকাশ বেশী। এই সর্গেই মোহনলালের উপস্থিতি। প্রথমে যে-খসড়া করেছিলেন তাতে স্বদেশ-সঙ্গীতের মোহময় বাণী নিশ্চয়ই ছিল। একটা দিব্য প্রেরণার বশে যে সে-খসড়া করেছিলেন এ-ও আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু কবিতাটিকে বিস্তৃত করবার উপদেশ তিনি পেয়েছিলেন। সেই কারণে প্রাথমিক খসড়াটিকে অবলম্বন করে একে একটি ঐতিহাসিক কাব্যের আকার দিলেন। ফলে নানা

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ক্লাইভ-প্রসঙ্গ, সিরাজউদ্দৌলার তথ্য কবিকে
সন্নিবেশিত করতে হল। এর ফলে কাব্যটির গুরুত্ব অনেকখানি
বেড়েছে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য
'Next, if at all, to Meghnad' হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির
বিচারের প্রয়োজন আছে। তিনি 'মেঘনাদ-বধে'র সঙ্গে এ কাব্যের
প্রায় সমকক্ষতা দাবি করেছিলেন কেন? 'মেঘনাদ বধে'র সঙ্গে
'পলাশির যুদ্ধে'র গঠনের দিক থেকে কোন সাদৃশ্য আবিষ্কার করা
দুরূহ। চরিত্র-পরিকল্পনার দিক থেকে 'মেঘনাদ বধে'র কোন
চরিত্রের সমকক্ষতা করবার দাবি 'পলাশির যুদ্ধে'র নেই। দুইটি
কাব্যের আবেদনও দুইরকম। মনে হয়, 'মেঘনাদ-বধে'র ইন্দ্রজিৎ
এবং মোহনলালের সাহসের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে পড়ে থাকতে
পারে। বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইন্দ্রজিতের পতন আর
মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় মোহনলালের পতন। ইন্দ্রজিৎ
উনিশ শতকের Young Bengal-এর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।
মোহনলাল ঠিক তা না হলেও স্বদেশপ্রেমের দিক থেকে খানিকটা
তা-ই। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মধুসূদনের প্রতিভা নবীনের ছিল না।
মধুসূদনের ছিল মহাকবির প্রেরণা। নবীনচন্দ্র রচনা করেছিলেন
স্কটের আদর্শে Metrical Romance। বলা বাহুল্য, প্রথম উচ্ছ্বাসে
যে-খসড়াটি রচনা করেছিলেন তার পর কবিকে সমগ্র কাব্যের
পরিকল্পনা নূতন করে করতে হয়। এই কারণে 'পলাশির যুদ্ধে'র
মধ্যে নানা বিষয়ের উপস্থাপন দেখতে পাই। কবির বর্ণনাও সর্বত্র
নিপুণ হয়নি। নবীনচন্দ্রের মধ্যে ছিল গীতিকবির প্রেরণা। কিন্তু
কবি আবেগকে বশে রাখতে পারতেন না। সেই কারণে উচ্ছ্বাসের
কাছে কবি প্রায়ই আত্মসমর্পণ করেছেন। বর্ণনাগুলি দীর্ঘ, অতি-
বিস্তৃত, ভাবাতিরেক-প্রবণতার দ্বারা বিজড়িত। স্থানে স্থানে কবিত্বের
প্রকাশ মনোহর। কিন্তু কবির ধ্যান প্রায়শই বিক্ষিপ্ত। উচ্ছ্বাসের
প্রাবল্য কবিকে আত্মবিস্মৃত করেছিল। আবার এই উচ্ছ্বাসই

কাব্যটির মধ্যে এক জ্বালাময় অগ্নি বিকিরিত করেছে। বাঙ্গালীর হৃদয়ের অবরুদ্ধ কামনা কবির কল্পনার মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে। মোহনলালের চরিত্রে, তাঁর উৎসাহময় আহ্বানে এই উচ্ছ্বাস তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকে বাঙ্গালীর মধ্যে বীরত্বের যে-পিপাসা জেগেছিল সে পিপাসাকে নবীনচন্দ্র কথঞ্চিৎ রূপ দিতে পেরেছিলেন। কবি যে লিখেছিলেন 'পলাশির যুদ্ধ' ছাপা হওয়া মাত্র "বঙ্গসাহিত্য-জগতে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল।"—সেকথা সর্বৈব সত্য। 'বঙ্গদর্শনে', 'আর্যদর্শনে', 'বান্ধবে' এই কাব্যের প্রশংসামূলক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সে যাই হোক, নবীনচন্দ্র যে Metrical Romance লিখতে চেয়েছিলেন সে-বিষয়ে আরও দু'-একটি তথ্যের উল্লেখ করি। Romance-এ প্রেমের বর্ণনা প্রায়ই থাকে। 'পলাশির যুদ্ধে' প্রেমের বর্ণনার অবসর ছিল কম। তথাপি নবীনচন্দ্র ইংরেজ সৈনিকের মারফৎ ইংরেজের প্রণয়গীতিকা পরিবেশন করেছেন। প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখি। কবি ব্রিটানিয়া দেবী, কিংবা ইংরেজের যুদ্ধ-বর্ণনাতে যে-উচ্ছ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন তা অনেক সময় আতিশয্যদোষে দুষ্ট বলে মনে হবার সম্ভাবনা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইংরেজ-প্রশস্তির মধ্য দিয়ে নবীনচন্দ্র অনেক সময়েই বাঙ্গালীর হীনমন্যতার পরিহার এবং জাগরণের জন্য উৎসাহ-বোধ জাগ্রত করবার মানসেই এই-সকল বর্ণনা দিয়েছেন। নবীনচন্দ্র সেন যুদ্ধের যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা-ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা অর্জন করেছিল। রঙ্গলালের কাব্যে যুদ্ধবর্ণনা আছে। কিন্তু তা বাস্তব গুণোপেত নয়। মধুসূদনের যুদ্ধবর্ণনা মহাকাব্যের। নবীনচন্দ্র ঐতিহাসিক কাব্যকে অবলম্বন করে যে-যুদ্ধবর্ণনা দিয়েছেন তাতে কবির প্রশংসা করতে হয়। এ-যুদ্ধের মধ্যে ইংরেজের বলদৃপ্ত পদধ্বনি শোনা যায়। আর বাঙ্গালীর পদাতিক-জীবনে মোহনলালের যুদ্ধসজ্জা এক অসামান্য দীপ্তির সঞ্চার করে। উঁচুসুরে বাঁধা জীবনের গোরব-মহিমা নবীনচন্দ্র মোহনলালের আচার-আচরণে পরিস্ফুট করেছেন।

মেট্রিক্যাল রোমান্সে চরিত্রের প্রাধান্য থাকে না। বর্ণনার মনোহারিত্বই এই-সকল কাব্যের প্রাণ। কাহিনীর বিন্যাসও অবশ্য এ-কাব্যের অন্যতম লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে নবীন-চন্দ্রের কাব্যের সঙ্গে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'-এর তুলনা করে বলেছিলেন 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে চরিত্র-অঙ্কনের চেষ্টা নেই বলে এ-কাব্য হেমবাবুর বক্তব্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য শোনা যাক্। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' (পৃঃ ১৪৭, বসুমতী সংস্করণ) বলেছেন: "বঙ্গদর্শনে পলাশির যুদ্ধেরও খুব উচ্চ রকমের সমালোচনা বাহির হইল। উহাতে বঙ্কিমবাবু আমাকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিলেন। কাব্যখানির একটি মাত্র দোষ দেখাইয়াছিলেন—হেমবাবুর 'বৃত্রসংহারে' চরিত্র-চিত্র আছে, পলাশির যুদ্ধে তাহা নাই। কিন্তু চরিত্র-চিত্র করা কি 'পলাশির যুদ্ধ'-রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল?" সুতরাং কবি স্বয়ং স্বীকার করেন যে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে চরিত্রচিত্রণ কবির অভিপ্রেত ছিল না। কবি চরিত্র আঁকবার চেষ্টাও করেননি। একটি মহৎ ভাবনা মোহনলালকে উজ্জ্বল করেছে, করুণা, আন্তরিকতা, সমবেদনার মূর্ত প্রতীক রূপে চিত্রিত হয়েছেন রাণী ভবানী। এই সকল গুণই বাঙ্গালী পাঠক উপভোগ করে, এই কাব্যের আকর্ষণও এইখানে। ক্লাইভকে আশ্রয় করে কবি ইংরেজের বীরত্ব, স্বদেশপ্রেম, ইংরেজ জাতির উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কৃচ্ছ্রসাধানার চিত্রই অঙ্কন করেছেন; সিরাজ-মহিষীর করুণ দিকটি উদ্ঘাটিত করে নারীচিত্ত-গহনের মর্মান্তিক বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। বস্তুত 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের ভাবগুলিই প্রধান। কবিও ঊনিশ শতকের বাঙ্গালীকে চরিত্রগঠনে, দেশচর্চায়, উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ফলে 'পলাশির যুদ্ধ' উচ্চভাব-ব্যঞ্জক প্রকাশের বাহন হতে পেরেছে।

আগে বলেছি, 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে লিরিকের উচ্ছ্বাস আছে। বলা ভাল, অনেক সময়েই এই লিরিক-প্রবণতা কাব্যটিতে

জলাভূমি সৃষ্টি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মোহনলালের উক্তির দীর্ঘত্বের কথা বলেছেন। আমরা বলি, কবি প্রকৃতি-বর্ণনায়, ব্রিটানিয়া দেবীর বক্তব্য-উপস্থাপনে, সিরাজের স্বপ্নবৃত্তান্তে, সিরাজ-মহিষীর করুণা-প্রকাশে কিঞ্চিৎ Fancy-র দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। ভাবের পাল তুলে তিনি কাব্যতরণীকে যথেচ্ছ বিহার করিয়েছেন। কিন্তু যে-পাকা মাঝি হাল ধরে তরণীকে লক্ষ্যে উপনীত করায় সে-মাঝির কুশলতা নবীনচন্দ্রের ছিল না। তথাপি নবীনচন্দ্র প্রথম সর্গে প্রকৃতির যে-ভয়ঙ্কর রূপ বর্ণনা করে বাংলার ভাগ্যকে প্রকাশ করেছেন, পলাশি-প্রাঙ্গণের যে মর্মন্তুদ চিত্র উপস্থাপিত করেছেন তাতে কবিত্বের স্ফুরণ ঘটেছে। এমন বহু জায়গা দেখান যেতে পারে যেখানে কবি বর্ণনায় সিদ্ধকাম। সেকালে খণ্ডকাব্য লেখবার আদর্শ ছিল 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য। নবীনচন্দ্র 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যের শব্দসম্ভারের ব্যবহারের নিপুণতা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেননি। সেজন্যে স্থানে স্থানে মধুসূদনীয় অনুকরণ কিঞ্চিৎ কষ্টকল্পনার নিদর্শন বলেই বিবেচিত হবে। আবার মধুসূদনীয় অনুকরণ যে মাঝে মাঝে বর্ণনায় চকিতচমক দীপ্তির সঞ্চার করেছে এ-ও অস্বীকার করা যায় না।

'পলাশির যুদ্ধ' বার হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। 'আনন্দমঠ' কিছু পরে লেখা। 'আনন্দমঠ'-এর স্বদেশচর্চার পটভূমি 'পলাশির যুদ্ধ' তৈরি করেছিল একথা বলি না। কিন্তু 'পলাশির যুদ্ধ'-এর কবি বাঙ্গালীর প্রাণে স্বদেশচর্চার মহান্ বীজটি উপ্ত করে দিয়ে 'আনন্দমঠ' এর স্রষ্টার মতই যে বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

দেয়ালি

১

গাও গাও গো বাউল, তোমার তরল একতারাতে তান তুলে
নামভোলা ঐ নীল আকাশের বুকের মাঝে ঢেউ আনি ;
দখিন্ হাওয়া থম্‌কে দাঁড়াক্ চম্‌কে শুনুক কান খুলে
স্বপ্নপুরের সেই বাণী !
মউল কেন ধর্‌লো আজি পউষরাতের আমবনে,
কোন্ ফাগুনের স্বপ্ন দেখে জাগ্‌লো কোকিল চোখ চেয়ে ;
শীতের সাঁঝে শিরীষশাখে কি যে বাজায় আন্‌মনে
সেই বারতা যাও গেয়ে !
শিশির-শ্যামল মাঠের পথে চল্‌বো তোমার গান শুনে
রাতের ছোঁয়া লাগ্‌বে আমার কঠিন পায়ের চারপাশে,
বনের ছায়া কাঁপ্‌বে তোমার একতারাটির তান শুনে
চল্‌বো আমি তার আশে !
বনের ঘন স্বপনখানি বাজ্‌বে না কি সেই সুরে
হাওয়ায় যে-গান ঘুমিয়ে আছে প্রাণের মৃদু আহ্বানে ?
বল্‌বে কি সে 'এই যে আমি তোমার কাছে, নেই দূরে
ডাকো আমায় কোন্‌খানে ?'
শোনাও আমায় দূর-আকাশের ভাষাবিহীন গান আনি
মানস-সরের কলধ্বনি একতারাতে তান তুলে ;
চোখ চলে না এমন দেশের ছায়ার মতন রূপখানি
দেখবো আমি সব ভুলে।

গাও   গাও গো বাউল, তোমার অবুঝ একতারাতে তান দিয়ে
ব্যথার বনে শন্‌শনিয়ে লাগুক্‌ কাঁপন্‌ মন-হরা,
গাঁয়ের পথে চলবে তুমি সাথে আমার প্রাণ নিয়ে
হব তোমার পথ-ধরা।

২

ঊষর ধূসর সাহারা সমান
তৃষিত উরস মম,
সজল-জলদ আবাস ত্যজিয়া
এস অয়ি নিরুপম।
শীতল পবন ছুটিবে অমনি
পায়ে ধ'রে কেঁদে লুটিবে অমনি
চিত্তকুসুম ফুটিবে অমনি, ওগো অন্তরতম।

কেহ হেরিবে না অয়ি সুন্দরি
তোমারে, শোনো গো শোনো,
বহুবাঞ্ছিত হৃদয়ে তোমার
রবে না চিহ্ন কোনো।
শুষে লব তোমা অন্তরে মোর
প্রেমের প্রবল মন্তরে মোর,
মানসমরুর প্রান্তরে মোর শ্রাবণ-স্বপন বোনো।

৩

আমি   নিজেই জ্বালানু এ অনল সখি
নিভাবো কেমনে বল !
চারিধারে চাই— কোনো গতি নাই
ঝরে শুধু আঁখি জল।
কোথা হ'তে আসে দীর্ঘ নিশাস
হু হু ক'রে ওঠে আগুনের ত্রাস,
তবু শুনি দূরে করুণার নদী
গেয়ে যায় কল কল্ !

বুকের ভিতরে কি বিষম ব্যথা
কেমনে বোঝাবো আর,
কঠিন হিমানী হয়ে গেছে মোর
ঝরা অশ্রুর ধার।
কার নয়নের কিরণ আঘাতে
গলিয়া অশ্রু পড়িবে ধরাতে—
কাহার চরণ ঘিরিয়া ঘিরিয়া
কাঁদিবে প্রাণের তল !

৪

চামেলী ফুলের মালা অমলিন
কঙ্কনে দেবো জড়ায়ে,
কৃষ্ণচূড়ার কচি দলগুলি
ধূলি তলে দেবো ছড়ায়ে।

ভালো নাহি লাগে সে মালা তোমার
পথের ধূলায় ক'রো পরিহার—হায়
ছিন্ন কুসুমে ফেলো না চরণ
দূরে রেখে দিয়ো সরায়ে।

তবু দেবো দেবো মনটি আমার
লুকায়ে বকুল হারে,
ভুলিয়াও কভু দেখনি যাহারে
তুলে কি লইবে তারে।
কীট থাকে তবু সে কুসুমভার
মালিকায় ঠাঁই পায় গো তোমার—হায়
মন যদি থাকে তবে কি সে ফুল
ফেলে দিবে পথধারে।

৫

কাল্‌কের দিন বেশ কেটেছিল
আমের বনে
গল্পে, হাসিতে, গানে ও ভ্রমণে
বন্ধু-সনে।
অলস অবশ বহেছিল বায়ু
ঢালিয়া কায়া—
রাঙা রোদখানি পরালো নয়নে
মধুর মায়া।

স্বচ্ছ আকাশে ভেসে গেল মেঘ
হাল্কা কত
আজিকার এই অবকাশ-লঘু
দিনের মত!
ডানা দুটি থির ভেসে যায় চিল
স্বপন সম,
বারে বারে ঘুমে ঢুলে ঢুলে আসে
নয়ন মম।
হুহু ক'রে হাওয়া চ'লে আসে বেগে
সুদূর হ'তে
ধানের ক্ষেতের পরান উদাসি'
অধীর স্রোতে!
সমুখে পুকুরে উঠেছে ফুটিয়া
পদ্মরাশি
সুনীল-নয়না সরসী-রানীর
মধুর হাসি!
ডাকে দূরে কাক, চরে মাঠে ধেনু,
মধুর কিবা!
কত কাল পরে ফিরে আসে পুন
এমন দিবা!
নাহি কোন কাজ, পড়ে আছি আজ
ঘাসের পরে,
আকাশে ভাসিছে কত কি স্বপন
থরে বিথরে!
মিথ্যা হয়েছে মধুর আজিকে
তাহাই চাই,
সত্যটা নিক কাজের লোকেরা
দুঃখ নাই।

আজি ফাগুন আগুন নিভে যায়,
মৃদু সজল সুরভি পূবে বায়
ফুলবন আহা আন্‌মনা,
উধাও-পক্ষ মেঘ-ছায়
পূবে বায়ু করে হায় হায়!

আহা আলোল-মালতী ফুটে ওই,
যেন আষাঢ়ের আশে ছুটে ওই
শালবনে ধারা ঝর ঝর,
দ্যুলোক-পুলক টুটে ওই
কারে খুঁজে বলে কই কই!

আজি কেতকীর হিয়া টুটেছে রে,
বনে কদম্ব বুঝি ফুটেছে রে,
নাম-হারা কত ফুলবাস
মধু-অভিসারে ছুটেছে রে,
পথে পথে তারা জুটেছে রে!

ওরে বনপথ আজি ছায়াময়
দূর অলকার মত মায়াময়,
উল্লাসে যারা ছোটে সেথা
তারা ধরণীর কায়া নয়;
আঁধারে আলোক হ'ল ক্ষয়!

আমি উদ্দাম হয়ে উঠিতে চাই,
চল- বিদ্যুৎ বেগে ছুটিতে চাই,
অঞ্চল-বাধা সরমের
ঝঞ্ঝার বেগে টুটিতে চাই,
তনু-সৌরভ লুটিতে চাই!

আমি হৃদয়ে হৃদয়ে করি খোঁজ,
মোর হৃদয়কে বলি, বোকা বোঝ্
দুর্মদ যারা কেড়ে নেয়
ধরাতে তাদেরি রসভোজ;
বর্ষা মেলে না প্রতিরোজ!

আহা জীবনে আষাঢ় যদি আর
নাহি আনে গো পরশ মদিরার
এইবার তাই প্রাণপণে
ঘুচাইয়া লব হৃদিভার,
ঝরুক্ বরষা মধুধার!

৭

সন্ধ্যা হ'লে গ্রামের বধূ
ফেরে যখন ঘরে
নদীর পাড়ে বাব্‌লা বনে
আঁধার নেমে পড়ে;
মাঠের পথে গাভীর দলে
উড়ায় ধূলিকণা
রবির তেজে চিক্‌চিকিয়ে
ছড়ায় যেন সোনা!
হাটের লোকে ফিরলে ঘরে
তারার আলোতলে,
খেয়ার মাঝি করলে সারা
নৌকাবাওয়া জলে,

তখন আমি একলা ব'সে
ভাবি দিনের শেষে
এমন কালে প্রিয়া আমার
অনেক দূর-দেশে।

প্রহর পরে শিয়াল যবে
বনের ধারে ডাকে
ক্লান্ত পাখী ঘুমিয়ে যবে
পড়ে নীড়ের শাখে ;
নীরব গ্রামে জ্যোৎস্নারাশি
লুটিয়ে পড়ে শুধু
নদীর পাড়ে বালুর চরে
কর্‌তে থাকে ধূ ধূ ;
আকাশভরা তারার দলে
প্রহর বসি গোনে
আর কেবলি শূন্য মাঠে
শিয়াল ডাকা শোনে ;
নীরব রাতে একলা ব'সে
ব'সে আকুল-বেশে
ভাবি কেবল প্রিয়া আমার
অনেক দূর-দেশে !

যখন ধীরে তারার দলে
বিদায় নিতে থাকে
শান্ত বায়ু শিউরে ওঠে
বনের শাখে শাখে·

উষার আগে খবর তারি
কোথাথেকে আসে
স্নিগ্ধ মধু গন্ধ ছোটে
শিশির-ভেজা ঘাসে!
শুকতারাটি বিদায় নিতে
করুণ চোখে চায়
নিশার শেষে ঘুমের নেশা
আরেক দেশে ধায়;
উষা নিশার বাসর গেহে
সেই রজনীর শেষে
তখন ভাবি মনে কেবল
প্রিয়া যে দূর-দেশে।

৮

আমার কবিতাগুলি
মোর ইতিহাস,
মানস-সরসতীরে
উড়ে-আসা হাঁস!
যাদের বেসেছি ভালো
যাদের প্রীতির আলো
মোর মনে ঘুচায়েছে
আঁধারের বাস
তাহাদেরি,সুখে দুখে
যে ব্যথা বেজেছে বুকে
তা-ই ইহাদের মুখে
মৃদু কলভাষ।

৯

কখন্ যে কারে ভালো লেগে যায়
কেমনে বলি,
নেয় যারা তারা পলকেই নেয়
পরান ছলি।
এতদিন যারে শতেকবার
দেখিয়াছি বৃথা—নয়নে তার
তারে যে সহসা ভালো লাগে কেন
কেমনে বলি!
শুভখন কার কখন যে আসে
যায় না বলা,
সংসারে তাই চারিদিকে চেয়ে
সুধীরে চলা।
ছাড়ি না কারেও সবার পানে
উৎসুক চাহি—শত নয়ানে,
কারে বাদ দিতে সকলি হারাব
যায় না বলা।

১০

ওই ব্যস্ত চরণ আস্তে ফেলো
বনপথ আমি বনপথ,
মোর ধূলায় ধূলায় খচিত রচিত
শত পথিকের মনোরথ,
আমি বনপথ।

আমি ধরণীর বুকে পেতে কান
শুনি ঘাসের সুখের কত গান,
কত মৌমাছিদের মধুর তিয়াসা
নয়নেতে লাগে মায়াবৎ,
আমি বনপথ।

ওই ত্রস্ত চরণ সুস্থে ফেলো
ধীরে যাও ওগো ধীরে যাও,
না হয় বলিলে না-ই বা আমায়
কোথা হ'তে তুমি ফিরে যাও।
শুধু রজনীর এই তারাদল
যারা ধরণীতে হ'ল ধারাজল
ওই স্বপন-মগন শিশিররাশির
পানে একবার ফিরে চাও,
ওগো ধীরে যাও।

কোন্ স্বপ্নে যে ওরা মগ্ন আছে
মধুময় কোন্ রজনীর ?
যারা পথের বুকেতে বসিয়া কেঁদেছে
তাহাদেরি বুঝি আঁখিনীর !
ওরা পথিক-পায়ের পেলে সাড়া
কেন গ'লে গিয়ে হয় জলধারা ?
আর শীতল কোমল অমল পরশে
আনে প্রশান্তি কি গভীর,
ওরা আঁখিনীর !

ওরা অশ্রু কিম্বা হাস্যকণা
নারিলাম হায় বুঝিবারে,

কত প্রভাত-আলোতে ঝলিতে দেখেছি
জ্বলিতে দেখেছি বারে বারে !
শেষে তুলিবারে গিয়ে সুখভরে
হায় হেরিয়াছি কেঁদে ঝর-ঝরে,
যত পলকের ধন পুলক ভুলিয়া
গলিয়া পড়েছে সারে সারে
কত বারে বারে !

ওই ফুল্ল যে সব পুষ্পরাশি
ফুটিয়াছে মোর দুটি পাশে
ওরা সারাদিনমান চেয়ে[illegible]থ শুধু
এই [illegible] কারা [illegible] যায় আসে !
মোর তনু ঘিরি যত বনলতা
এরা আমারি মনের আকুলতা,
দেয় পথিকের পায়ে শিথিল-শিকল
বিকল হৃদয়ে আঁখি ভাসে
মোর দুটি পাশে !

ওগো ছিন্ন করিয়া খিন্ন-ডোরে
দেশে দেশে যারা গেছে চলি
আমি মৌনকণ্ঠে গাই তাহাদের
একদা-তরুণ পদাবলী !
সেই চরণচিহ্ন মেখলারে
প'রে রয়েছি বসিয়া একেলা রে,
তাই বলি বার বার—তরুণ পথিক,
আস কেন যদি যাবে ছলি ?
সবে গেছে চলি !

আমি মুগ্ধ স্বপন কুঞ্জবনের
ধিজন-বিহারী বনপথ,
তাই ঘাসের বাসেতে বাসনা ঢেকেছি
মোর উদ্দাম মনোরথ।
তবু কেন যে পথিক এত হায়
মোরে দূরে এসে দাগা দিয়ে যায়!
আমি বুঝিতে না পারি এ জগৎখানি
নয়নেতে লাগে মায়াবৎ!
আমি বনপথ।

১১

শশী যদি শুধু একবার উঠি'
আর না উঠিত, তবু
জগৎ কি তারে পলকেরো তরে
ভুলিতে পারিত কভু!
কতদিন ধ'রে আসে পূর্ণিমা
তবুও ধরণী, হায়,
প্রতিবারই যেন নূতন করিয়া
তাহারে দেখিতে পায়।

১২

ডাকিব না তোমা, অয়ি শ্বেতভুজা,
চরণ সঁপিতে কাব্যে মোর,
আমি মোহান্ধ মায়ায় মুগ্ধ,
থাকুক্ ঘিরিয়া আঁধার ঘোর!

মেঘ বমলিন আকাশের ভালে
রবির যেমন রাঙা-উদয়
তেমন কভু কি নির্মলদ্যুতি
খরতরজ্যোতি গগনে হয় ?
ডাকিব না তোমা, হে দেবী দেবতা,
এ আসন মোর ক্ষুদ্র অতি,
রচয়িতা সেও আরো ছোট হায়
বিশেষত সে যে শূদ্রমতি।
দয়া ক'রে যদি দূর হ'তে সবে
কৃপাকটাক্ষ করিয়া থাকো
তাই যে কোথায় ধরিয়া রাখিব
ভাবিয়াও কূল পাই যে নাকো।
স্রষ্টার প্রতি নাহি মোর লোভ
সৃষ্টিরে যদি বুকেতে পাই,
সেই সুখে আমি স্রষ্টার যশ
দশমুখে আহা গাহিয়া যাই।
বিধাতা তো হায় চিরকাল ধ'রে
ভরিয়া আছেন ভুবনখানি,
মোরা চ'লে যাই পলক ফেলিতে
হায় রে হতাশ ক্ষুদ্র প্রাণী!
বিধির চেয়েও বড় হয়ে, সখী,
দাঁড়াও কেবল ক্ষণেক তরে,
কেহ কিছু মনে করিলে করুক,
বিধাতাই জয়ী হবেন পরে!
কুসুম যেমন বৃন্তটি তার
ঢেকে ফেলে দেয় পুলকে ফুটি
তার পরে হায় সন্ধ্যাবেলায়
একে একে দল যায় রে টুটি,

অয়ি মোর সখী, তেমনি আজিকে
ঢাকো ঢাকো ঢাকো বিধির স্থান,
এখন নহে এ মেলা মোদের,
আসিবে সন্ধ্যা ফুরাবে গান।

১৩

হে নগরী, তব রুক্ষ বক্ষের উপরে
কোন্‌খানে বল আজি ডেকেছে কোকিল ?
যে গান হেথায় বাজে মাঠে ভিতরে
তার সাথে সে গানের আছে কি গো মিল ?
ধূলিস্নাত রাজপথে অট্টালিকারাজি,
সেথাও আনন্দ আছে জানি আমি জানি ;
মাঠের সঙ্গীত সেথা নব সুরে বাজি
নয়নেতে আনে জল বাধা নাহি মানি।
সেথা কেন গাহে পিক ভেবে নাহি পাই,
পেয়েছে কি ফাগুনের চরণের ধ্বনি ?
পুরীর পাষাণ প্রাণে জেগেছে কি তাই
অতীত সে জীবনের কোন রনরনি ?
হেথায় ফাগুন যাহা করিবারে নারে
সেথা ফাগুনের দূত একা তাহা পারে।

১৪

বিপুল জলধিকূলে রহিয়াছে পড়ি
অচ্ছোদ ঝিনুক এক ; সিন্ধু হাস্য করি
ফেনার কুসুম তুলি তরঙ্গের শিরে
ধূসর বালুকাতটে রাখি যায় ধীরে।

শতকোটি বরষের গভীর গর্জন,
স্তব্ধ রজনীর নত নক্ষত্রভাষণ,
সাত সাগরের হাতে তরল তুলিতে
বরণের মৌন সুরে রয়েছে তুলিতে
চিত্রিত ঝিনুকে এই। আমি চেয়ে দেখি
যুগান্ত তোমারে ঘিরে নৃত্য করে একি!
সূর্য যথা ধরা দেয় শিশিরের পরে,
অন্তহীন কাল বসি তোমার ভিতরে

ক্ষুদ্রের বনের শাখে বাঁধিয়াছে নীড়—
উথলে প্রেমের গান অসীম গভীর।

১৫

হে কোপাই, তব তীরতরুচ্ছায়া-তলে
এই কোলাহল হ'তে দিয়ো মোরে ঠাঁই!
তোমার অমৃতস্নিগ্ধ নীলাঞ্জন জলে
সভ্যতার হলাহল ধুয়ে যেন যাই!
তোমার কৌমুদীশুভ্র বালুকার তটে
তব তীরে জম্বু-বন-পল্লব-অঞ্চলে,
তব শিরে অচঞ্চল নীলাম্বর পটে,
তোমার বালুকাশায়ী মন্দগতি জলে,
যে শান্তি হেরেছি আমি যে মধুজীবন
যে মহা পূর্ণতাখানি রয়েছে বিস্তার,—
সে মোর ছাপায়ে দেহ ভরিয়াছে মন
তুলেছে বীণায় মোর অপূর্ব ঝঙ্কার।

একবার মনে হয় লোকালয় ছাড়ি
তোমার নির্জন তীরে দিতে হবে পাড়ি

চাই না আমি মূক বনানীর কুঞ্জকোমল শ্যামলস্নেহ,
হায় নগরী ! হায় পাষাণী !
পাই যদি হায় তোমার বুকে পাষাণগাঁথা স্তব্ধ গেহ !
রচ্‌বো সেথায় সুধার স্রোতে
নিত্য ঢালি বক্ষ হ'তে
মানসসরের নূতন ছবি কোমল যেন তরুণ মেহ !
হায় পাষাণী, হে রাজধানী, অহল্যা কোন্ তন্দ্রাগতা !
স্বপন কি তোর ভাঙবে না রে,
শরণ কারো মাঙবে না রে,
চরণপরশ দরশ দিতে আস্‌ছে নাকি আজ্‌কে কেহ ?

আবার মোরে আরেকটিবার বক্ষে তোমার বুকের তলে,
পাষাণপুরী হে রাজধানী !
লও টেনে লও নিঠুর স্নেহে কঠিন তোমার বিপুল কোলে।
কঠোর বাহুর নিবিড় পাশে
নিষ্পেষিয়া অট্ট হাসে
চূর্ণ করি দাও ফেলি দাও যেথায় শত যাত্রী চলে !
হে রাজধানী পাষাণপুরী, কঠিন শিলা মর্মহীন,
তোমার মতন চেতনহারা
কর আমায় অমনধারা,
চরণপাতের রণন্ শুধু শোনাও মোরে পল বিপলে !

কান আছে যার শুন্‌তে পাবে তোমার ধূসর পথের মাঝে,
বিরাটকায়া হায় পাষাণী !
চম্‌কে উঠে ক্ষণে ক্ষণে মানসসরের গান যে বাজে !

চোখ আছে যার দেখবে তারা
তোমার বুকে মানসধারা
ঢেউ ছুটে যায় কেউ কি তারে দেখবে না তার সকল কাজে?
বিরাটকায়া হায় পাষাণী, মর্ম্মে তোমার কি ধন আছে!
রূপ কি শুধুই বাইরে ফোটে!
যার পরানে উৎস ছোটে
সেই তো দেখে সুধায় বিধুর মলিন পথও মধুর সাজে!

১৭

আমি ছোট গলি মহানগরীর
দীন দুঃখিনী মেয়ে,
যেমন মলিন ধূলায় বিলীন
দেখে না কেহই চেয়ে।
পাংশু ধূসর হ'ল মোর দেহ
ভালোবেসে কেউ করে নাকো স্নেহ;
জয়ধ্বজা তোলে কত না আগাছা
ফাটলে সুবিধা পেয়ে!

তুমি রাজপথ, বিপুল গরব,
কর্ম্ম অন্তহীন,
বুঝিতে পার না কোথা দিয়ে তব
আসে আর যায় দিন।
আমার দিবস কাটিতে না চায়,
দণ্ড প্রহর চলে পায় পায়,
আমি আনমনে আকাশে চাহিয়া
এ দেহ করিনু ক্ষীণ।

তুমি রাজপথ, সার্থক তুমি
মানবের কাজ করি,
জটিলকর্মে এক হয়ে গেছে
তব দিবা বিভাবরী!
মোর হাতে হায় কোন কাজ নাহি
সুদূর আকাশে আছি শুধু চাহি,
হৃদয়ে আমার মানসের ঢেউ
উঠিতেছে মর্মরি!

কখন যে আসে কোন্ ঋতু হায়
ধরণীর খেলাঘরে
আমার ক্ষুদ্র সংসারে বসি'
বলি তা কেমন ক'রে।
ফাগুনে এখানে দক্ষিণ বায়
নাহি ফোটে ফুল শাল-বীথিকায়,—
মদিরমুকুল বকুলগন্ধ
পশে না প্রাণের পরে!

শরতের নব ইন্দুকিরণ
আসি এ ধূলির মাঝে
অমনি আকাশে ফিরে যেতে চায়
মূর্চ্ছিত হয়ে লাজে!
কূল-ভরা নদী নাহিকো হেথায়
গাং-শালিকের বাসা ডুবে যায়,
শুধু উঠে আঁখি জলে উদ্ভাসি'
দিনের সকল কাজে!

বিশ্বাস কর রাজপথ মোরে,
বিশ্বাস কর কথা,

আমারো পরানে জাগে রহি রহি
অকারণ আকুলতা!
স্থদূর বনের নিঃশ্বাসটুক
কাঁপায় আমার শিলাময় বুক,
মোর সাথে কথা কহিবারে চায়
রজনীর নীরবতা!

ছোট সংসারে মোর সব কাজ
সন্ধ্যা না হ'তে সারা,
আমার আকাশে ফুটে উঠে ক্রমে
গোটা দুই-চার তারা!
অমনি পরান উঠে গো কাঁদিয়া,
মনে হয় যদি কবরী বাঁধিয়া
তাহাদের সনে পারিতাম যেতে,
হায় রে সঙ্গীহারা!

ওগো রাজপথ, তোমার মহান্
কর্মের গৌরব,
নাহি মোর কোনো অশ্ব শকট
জনগণ বৈভব।
আমি নাহি ধাই নগরে নগরে
ধনসম্পদ বহি দুই করে,
মোর গতি শুধু পাড়ায় পাড়ায়
মিলনের উৎসব!

কর্ম-সাগর-মথিত অমৃত
হোক্ তব, রাজপথ,
চ'লে যাও মহাসম্পদ-পুরে
লঙ্ঘিয়া পর্বত!

আমি থাকি যেন পাড়ায় পাড়ায়
মিলনের বিনা-কাজের তাড়ায়,
হাতে মোর থাক্ পাতার বাঁশরী
এই মম মনোরথ।

১৮

ছেড়ে চ'লে যাই যবে মনে জাগে আশা
আবার ফিরিতে পারি অনাগত কালে ;
হায় রে মানব-মন, মূঢ় ভালবাসা,
জানো না তো চলে বিশ্ব কি অজ্ঞাত তালে।
আবার ফিরিতে পারি প্রিয়তম পাশে
কিন্তু কি ফিরিবে আর পুরানো সময় ?
কালের চঞ্চল স্রোতে চিত্ত যার ভাসে
অচল তটের বাধা তার তরে নয়।
জানি প্রেম চিরন্তন তাই ভয় মনে
চিরদিন ব্যথা তার জ্বালিবে আগুন ;
শীতের শীর্ণতা শেষে ফিরে আসে বনে
বারবার অন্তহীন সান্ত্বনা ফাগুন !

সময়ের সিঁধকাঠি পাঁজর কাটিয়া
প্রেমের গোপন ধন কোথা যায় নিয়া !

১৯

সোনার হরিণ চলিয়াছে ছুটে
বিশ্বভুবন পরে,
পলকে পলকে চমক লাগিছে
অন্তরে অন্তরে।

চরণে তাহার কনকনূপুর
কাঁদিছে করুণ সুরে,
প্রতিধ্বনি তার ক্ষীণতর হয়ে
বাজিছে হৃদয় জুড়ে।
তারি চরণের ললিত তালেতে
তটিনী চলিছে ব'য়ে,
ঝিম্ ঝিম্ কাঁপে শরতের রোদ্
মদিরা-অলস হয়ে !
সেই চরণের পরশ-পুলকে
বীচিরোমাঞ্চ নদী
জগতের মাঝে চির-আনন্দ
বহিতেছে নিরবধি।
কেহ কভু তারে পায় না হেরিতে
আড়ালেতে থাকে সে,
পলকের তরে হিরণ-আভাস
কেঁপে ওঠে আকাশে।
কখনো তাহার কণ্ঠে দোহল্
অচিন্ হাতের মালা
আকাশের পটে ঝলসি উলসে
রামধনুকেতে ঢালা।
মাঝে মাঝে তার আঁখি-কটাক্ষ
নীল আকাশের কোণে
চমকি উঠিয়া অমনি মিলায়
কার আঁখি আনে মনে !
বারে বারে শুধু বর্ষা-নিশীথে
আঁকা-বাঁকা শিং তার
তড়িৎ-লতায় পলকে বিকাশে
রঙীন্ চমৎকার।

পিছনে তাহার ছুটেছে সবাই
ছুটেছে নিখিল ধরা,
ক্ষণে ক্ষণে শুধু হয় মনে মনে
এবার পড়িবে ধরা।
জোয়ার ভাঁটায় ছুটেছে সাগর,
আকাশে ভাসিছে মেঘ,
ধরণী-তরীর গগনের পালে
কোথা হতে লাগে বেগ।
কুসুম-কাননে কুসুম ফুটিছে
ছুটিছে গন্ধ তার,
রবি-কিরণের পদ-পথতলে
ঘুচিছে অন্ধকার।
আমি বসে যবে বিজন গেহেতে
পুঁথি-পত্তর নিয়ে
কোথা হতে আসে অবোধ বাতাস
কি খবর যায় দিয়ে!
মোর চারি পাশে মূঢ় তরু যত
কহে নিঃশ্বাস ফেলি—
তবে কেন তুই মোর গৃহ হতে
একদিন চলে এলি?
মনে নাই তোর বহুযুগ আগে
আমারি সনেতে ছিলি
আমার শাখায় আমার পাতায়
আমার আশায় মিলি।
তনু নিয়ে তোর ধরণীতে এসে
বসিয়া রহিলি ওই,

ধরিতে তাহারে নারিলি অবোধ,
সোনার হরিণ কই ?

আদিম ফাগুন সহসা মনের
বনের শ্যামল-শাখে
ভুলে-যাওয়া কোন্ নামটি ধরিয়া
রহিয়া রহিয়া ডাকে।
চমকি উঠিয়া ছুটে চলে যাই
মনে পড়ে তবে সেই
লক্ষযুগের আদিম ধরণী
মানুষের বাস নেই।
সেই সারাদিন রৌদ্র-অলস
দক্ষিণ হ'তে হাওয়া
অজানা সে কোন্ ঘন বনশাখে
শুধু করে আসা-যাওয়া !
ভাষাহারা সেই ক্ষীণ স্বরটুকু
উন্মনা করে প্রাণ,
চমকি উঠিয়া করিবারে যাই
হরিণের সন্ধান।
সাত সাগরের সাত তারে জোড়া
এই ধরণীর বীণা
কোন্ বীণকার বাজায় বসিয়া
কোমল অঙ্কে লীনা !
শরতের রোদ কেন অকারণে
নয়নেতে আনে জল,
শরতের হাওয়া কানে কানে বলে,
ছুটে চল্ ছুটে চল্ !

ধায় গ্রহতারা ছায়াপথ বাহি
রবি-শশাঙ্ক ধায়,
সোনার হরিণ কোথায় পালালো,
সোনার হরিণ হায় !

হায় চাঁদ, তুমি—তুমিও পড়েছ
এই মৃগয়ার দলে,
তুমি তো বন্ধু আরামেই ছিলে
শ্যাম ধরণীর তলে।
কি যে মনে হ'ল একদিন তোর
পৃথিবীর কোল ছাড়ি
সোনার হরিণ ধরিবার তরে
আকাশেতে দিলি পাড়ি
তারপর হতে কত দিবানিশি
ছুটিলি তাহার পিছে,
আজ বুঝেছিস্ সে সব প্রয়াস
হয়েছে যে তোর মিছে !
সোনার হরিণ রহিল ছুটিতে,
তোমার কি লাভ তায় ?
দুরাশা তাহার কলঙ্ক হয়ে
হৃদয়ে তোমার ভায় !
মাঝে মাঝে ধরা-জননীর স্নেহে
দিয়ে আপনার ছায়া
কলঙ্ক তব ঢাকিবারে চায়
আবরিতে তব কায়া।

বিশ্বমরুর মরীচিকা-মৃগ
না জানি তাহারে আমি,
যুগ যুগ ধরে চলেছে ছুটিয়া
ক্ষণেক না রহে থামি।
তারি পিছে পিছে ত্বরিত ছুটিয়া
ধরণীর কোল ছাড়ি
অপরূপ এক বাস্তবহীন
জগতেতে দেবো পাড়ি।
এ ধরণীখানি সেই ধরণীর
ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুধু,
সব জগতের ফুল হতে তোলা
সকলের সেরা মধু।
তোমরা যাহার শোন নাই নাম
হেথায় নাহিকো যাহা
সে যে কি রতন কেমন ধরন
আমিও জানি না তাহা।
দিবানিশি ধরি চলেছি ছুটিয়া
স্বর্ণমৃগের পাশে
অজানা অশোনা অদেখা অচেনা
কোন্ রতনের আশে।

২০

বাহুর বাঁধন বিফল হয়েছে, তাই
চাই গো তোমারে বাঁধিতে ছন্দ-মাঝে,
যে-সব ফাগুন দিগন্তে হ'ল হারা
তারাও কবির স্মৃতি-নিকুঞ্জে রাজে।

বাহুপাশে যদি আপনারে দিতে ধরা
সে পাশ একদা চলিত শিথিল করা,
আজিকে তোমারে যেখানে বসানু প্রিয়া
সেথা হতে আর সরিতে পারিবে না যে।
অনন্তকাল চেয়ে রবে তব মুখে
অসংখ্য হৃদি দুলিবে তোমার সুখে,
অটুট মানস-শতদল পরে মরি
রহিতে হবে যে চিরতরুণীর সাজে, —
তখন আমারে দূষিতে নারিবে প্রিয়া
রাঙা হবে যবে স্তুতিভাষণের লাজে !

২১

হে নগরী, তুমি বুঝি করিয়াছ পান
সভ্যতা—এ সমুদ্রের দৃপ্ত হলাহল ;
তোমার সর্বাঙ্গ ঘেরি ভৈরবের গান
গভীর গর্জন মাঝে স্তব্ধতা অতল।
ঝঞ্ঝা ফিরে চারিপাশে বজ্রকাটা পথে,
রৌদ্র হাসে নির্মমের দশন বিকাশি,
কর্ম-দানবেরা ধায় লৌহময় রথে,
চক্রতলে ভেসে যায় অশ্রু রাশি রাশি !
সে তো শুধু সুকুমার কুসুম-মধুর
তোমার শুষ্কতা পরে কল্পনার লিখা,
কখন্ ঝরিবে এই আশঙ্কা-বিধুর
তোমার প্রদীপ ভরি সৌন্দর্যের শিখা !
বিষদিগ্ধ বক্ষে তব অমৃতের স্মৃতি
মরণে মধুর করি রাখিয়াছে নিতি।

২২

হিমাদ্রি-শিখর সানু গৈরিক শিলায়
মগ্ন ছিলে নিত্য নিশি কি নৃত্য-লীলায়
স্বচ্ছতনু অয়ি তন্বী তটিনী চঞ্চল—
ছায়াঘন দেবদারু-অরণ্যশয্যায়
সুপ্ত ছিল যে স্তব্ধতা গোপন কুলায়
তরঙ্গে মুখর করি তব মৌন জল
উচ্ছলি ছুটিল দূর-দিগন্তের পানে
কূলেরে আকুল করি উচ্ছ্বসিত গানে
বিতরিয়া তীরে তীরে স্বপ্ন অতীতের ;
হেথা নগরীর এই আকাশ অধীর
শত-কল-শৃঙ্গ-চূড়া-চীৎকারবধির
সে মৌন মন্ত্রটি তব পায় নাই টের !
দাও সেই ঘুমঘোর নয়নে আনিয়া,
সুপ্তি তার স্বপ্নজালে উঠিবে রাঙিয়া।

২৩

ভক্ত তুমি পাড়ি দিয়ে নীল যমুনায়
চলে যেয়ো বৃন্দাবনে মন যদি চায়।
হে প্রেমিক, বসন্তের জ্যোৎস্নাঘন রাতে
চিত্রিত বকুলবীথি যবে ছায়া পাতে,
থেমে যায় রচি দিয়া মুগ্ধ মায়া-পাশ
অৰ্দ্ধেক উচ্ছ্বসি যবে বনের নিঃশ্বাস,
তখন সে যামিনীর গুপ্ত দ্বার দিয়া
মৃদু পদে যেয়ো যেথা স্বপ্নশ্লথা প্রিয়া
দূর উজ্জয়িনী পুরে।

মোর ভালো এই
ধূলিলীন কলিকাতা,—রেবা হেথা নেই ;
আছে গঙ্গা, তবে কিনা কলধ্বনি তার
জাহাজের আর্তনাদে কানে শোনা ভার।
কালিন্দী নাহিকো হেথা নাহি নিধুবন,
আছে শুধু মন এক মনের মতন।

২৪

প্রান্তরের পরপারে পলাশবনের
সুদূর ধূসর রেখা ভালো লাগে মোর—
ভালো লাগে শূন্য মাঠে উদাস তৃণের
অধীর নিঃশ্বাসটুকু আনন্দে বিভোর।
ক্ষণে ক্ষণে তবু যেন কি অতৃপ্তি ভরে
নগরের সৌধ-চূড়া জাগে আঁখি পরে।
ভালো লাগে ক্লান্ত মাঠে মৌন তাল-সারি
আপন ছায়ার সনে ধ্যাননিমগন ;
উচ্চাকাশে শঙ্খচিল চলেছে ফুকারি—
দিগন্তরে মরীচিতে উঠিছে কম্পন।
তবু মনে পড়ে সেই কৃষ্ণচূড়া তরু,
সেই জনাকীর্ণ ম্লান জীর্ণ গলি সরু।
প্রান্তরলক্ষ্মীরে মোর ভালো লাগে, তবু
নগরলক্ষ্মীরে মোর না ভুলিনু কভু।

২৫

বেশি নহে, শুধু, নদী, গোটা দুই কথা
পরবাসী পথিকের আর্ত আকুলতা
বহি নিয়ে যেয়ো, পথে পড়িবে সে পুরী
পরিচয় কলিকাতা ;—দীর্ঘ ঘাট জুড়ি

রিক্ত শাখা-মাস্তুলের অরণ্যে সঙ্কুল
জাগিছে তরণীদল ; তব কুল-কুল
শুনিবে না কানে কেহ, তবু ব'লো ধীরে,
"যে তোমারে ভালোবাসে সে আসিবে ফিরে।"
হিমাচল-শিখরের শীত-শুভ্র দান,
দেবদারু অরণ্যের কত মৌন গান,
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের কত পুণ্য-স্মৃতি
বহিয়া চলেছ তুমি ; ছোট এই গীতি
তার মাঝে হবে, নদী, বেশি কি এতই,
ফেলে তারে চলে যাবে, হে রহস্যময়ী !

২৬

আজকে কোকিল একটু থামো,
ক্ষান্ত কর গান,
বৃথায় আজি কূজন তব,
কার ভাঙাবে মান ?
কাল সে ছিল রাগের ভরে
দুয়ার দিয়ে আপন ঘরে
আজকে হের সলিলে তার
ভাস্‌ছে দুনয়ান !

দোহাই কোকিল, তোমারি ওই
আকুল করা গানে
কার পরানে শুষ্ক নদী
উঠছে দুলে বানে !
আজ সে নাহি, তাহার তরে
বুকের মাঝে কেমন করে !
ব্যথার পরে বিষম ব্যথা
হেনো না আর প্রাণে।

২৭

এখনো বসন্ত আছে, তবে তুমি কেন
নিশা না হইতে শেষ স্বপনের হেন
চলে গেলে? আজো ফোটে তরুশাখে ফুল,
কোকিলের গানে গানে শিহরে বকুল।
এখনি উঠিবে চাঁদ ব্যথা দিতে শুধু,
আজি সে ঢালিবে বিষ, কাল দিল মধু!
প্রতি পরিচিত ঠাঁই রহিয়াছে পড়ি,
শুধু তুমি হেথা নাই! আসিছে শর্বরী,
স্মৃতির কণ্টক যত আছে তীক্ষ্ণধার।
সফল সাধনা মোর অয়ি পুষ্পসার,
তুমি যদি চ'লে গেলে দিবসাবসানে
এই সব প্রকৃতির আর কিবা মানে!
আনন্দের উৎস মোর, অয়ি শুভহাসি,
আজিকে ঝরিছে চোখে অশ্রু রাশি রাশি।

২৮

ফাগুন সহসা যদি চমকিয়া উঠি
বীণার বদলে হাতে করে মৃদু বাঁশি,
সুরের হিল্লোলে দোলে কাশ রাশি রাশি,
মসৃণ-শেফালিপুঞ্জ পড়ে যদি লুটি!
রবিকরউদ্ভাসিত নির্মল গগনে
সাদা মেঘে ভেসে যায় আগমনী গান,
নির্জন নদীর চরে পাখী দেয় তান,
অকারণ অশ্রু জাগে উৎসুক নয়নে।

দিগন্তের নীড় হ'তে উড়ে আসে হাঁস,
পরিপূর্ণ পালে ধায় তরী একখান,
মাঠভরা ক্ষেতে ক্ষেতে সবুজের বান,
আকাশে সোনার রোদে মরীচিকাপাশ।
বাহিরে ফাগুন আজ ; অন্তরেতে তবু
মোর চিরশরতের অস্ত নাহি কভু।

২৯

গিয়েছিলাম অচিন্ দেশে
আবার যাবো চ'লে,
এবার যাবো একটি কথা
তোমার কানে ব'লে!
ফিরালে মুখ অভিমানে
তাকাবো না সেদিক্ পানে,
অশ্রু যদি পড়ে পড়ুক
কঠিন হিয়া গ'লে!

এখনো নয় সেই কথাটি,
শূন্যে উঠুক ভাসি
কোন্ বিরহীর অশ্রুঝরা
তারার রাশি রাশি।
ঢাকিলে মুখ অন্ধকারে
হৃদয় হ'তে নীরব ধারে
পড়বে ঝ'রে সেই কথাটি—
'তোমায় ভালবাসি।'

৩০

ভিখারী হৃদয়, কার দ্বারে যাস্,
মনে কিবা তোর আশা!
দয়া ক'রে কেউ দিয়ে যদি ফেলে
একটুকু ভালবাসা?
দেয় মণিহার, দেয় তারা ধন,
দিতে পারে খুলে মাথার রতন;
ভালোবাসা সে কি ভিখ দেওয়া যায়,
বৃথা আশা, বৃথা আশা!

৩১

ওগো কোন সন্ধ্যায় এসেছিলে তুমি কোন সন্ধ্যায় ভুলে-যাওয়া
অলস-কলসী ভ'রে নিতে মরি চপল ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে,
পেলে কি না বারি বলিতে না পারি সে কাহিনী আজ
ভুলে-যাওয়া,
মনের ভিতরে কেঁদে কেঁদে মরে অগাধ অতীত উচ্ছ্বাসে!

তুমি সারা সৈকতে রেখে গেলে শুধু চরণের ছায়া একখানি,
লোলুপ উর্মি তরল-অধরে মুছে নিতে চায় চঞ্চলি;
সে যে মোর প্রাণে হায় রৌদ্র-ছায়ার সোনার স্বপন একখানি,
মোর আশা কত ভ্রমরের মত তারে ঘিরে ফেরে চঞ্চলি।

আমি রেখে দিব তারে রেখে দিব মোর কান্না-হাসির মাঝখানে
অচেনা অদেখা অশোনা অরূপ স্মৃতি-কমলের অন্তরে!
মোর জীবনের সকল ধনের আমার আমির মাঝখানে
রেখে দিব তুলি সেই পদধূলি মহাবিশ্বের অন্তরে।

সখী   তোমার অজানা নামটি আমার
অফুরান মধুচাক,
আমি যে মুগ্ধ আমি যে লুব্ধ
হতবাক্ নিরবাক্।
যে সুধা পড়িছে আহা ঝরি ঝরি
বলো হৃদয়ের কোথায় তা ধরি,
শুধু ঐ নাম মুখে গুঞ্জরি
ঘুরে মরি শত পাক।

বলো সখী মোরে নামটি তোমার
আদরে শিখিয়া লব,
মধুর আবেশে জ্যোৎস্না-নিশীথে
মনে-মনে আমি কব।
ফুলের গোপন অন্তর হ'তে
আনিবে সমীর আকাশের পথে,
তলহীন তব নাম হতে সখী
ঝরিবে অমৃত নব!

আমার অধরে নামটি তোমার
যতনে লিখিয়া দাও,
আঁখিতে আমার নামের মধুর
কাজল আঁকিয়া যাও।
গ্রহে গ্রহে শশী তারায় তারায়
নাম তব ঝরে রসের ধারায়—
সে অমিয়া আমি ক'রে লব পান,
বারেক ফিরিয়া চাও।

কি যে তব নাম জানি না বন্ধু,
শুধু জানি তাহা মধু,
জানি না বলিয়া আরো মিঠে তাহা,
জানি না বলিয়া বঁধু।
খুলিয়া নামটি ব'লো না কখনো,
পলে পলে তারি ছায়াখানি হেনো,
আমি ছুটে যাবো অধীরে পিছনে,
আমি ছুটে যাবো বঁধু।

৩৩

কত বনানীর খোঁপা হ'তে খসা কত চাঁপা ফুল দুলায়ে
বিচিত্ররেখা তটের ললাটে কি স্নেহের হাত বুলায়ে—
কোন কবি কবে বাজালো বাঁশরী,
তুমি তারি সুরে সকল পাশরি
মরি মরি আজি চলিয়াছ সাজি কুলু কুলু কোন্ কুলায়ে?
শীতল পরশে যেই তীর ছুঁলে
নিদল-আলসে চোখ পড়ে ঢুলে,
অমনি কোথায় গতি তব হায় মন নিয়ে যাও ভুলায়ে!

তব তীরে জাগে কত ঘন বন, ছায়া দোলে তার সলিলে,
এ-তটের গান ও-তটের কানে কত না ছন্দে বলিলে!
কত রজনীর মন হ'তে টানি
বাহির করেছ হারা গানখানি
কত যে ঊষার রঙ বরিষার রক্তিম রাগে ঝলিলে!
দুই তীর চাহে করুণ কাঁদনে
বাঁধিতে তোমারে ব্যথার বাঁধনে,
কত আশা দিয়ে হৃদয় ছলিয়ে তবু তারে পায়ে দলিলে?

বিদিশার নারী তব নীরে যারা করেছিল লীলা একদা
বিদেশে আজিকে কত যুগ শেষে মনে পড়ে কি গো সে কথা !
ললিত তনুর ক্ষলিত সে সুধা
মিটাতে কি তব পেরেছিল ক্ষুধা !
আজি কি গো তার স্মৃতির বাহার মনেতে জাগায় সে ব্যথা !
মাঝে মাঝে কোন বায়ুর পরশে
ভুলে-যাওয়া কথা বুঝি মনে পশে,
অমনি গো হায় ঢেউ থেমে যায় অতীতের পায়ে আনতা !

যেদিন পড়িত ফাগুনের রাত সুরের সুরায় ঢলিয়া
হৃদয়-বাসনা ঝরিত আকাশে বিবিধ বরনে গলিয়া !
তারা-হারা কোন্ কাননকুঞ্জে
যে-গান চলিত গোপন গুঞ্জে
তাহাদের সুখে তোমার ও বুকে যেতো কি তিয়াসা ছলিয়া ?
পূর্ণিমা রাতে তরুণ নয়ন
সুখের কুলায় করিত বয়ন,
তাহাদের মেলা তুমি যে একেলা দিতো কি সে কথা বলিয়া ?

সেদিনের ফুল পড়েছে ঝরিয়া, তবু ভেবে দেখ আজিকে
তেমনি তরুণ রেখেছে ভরিয়া বনানীর ঘন সাজি কে ?
যে সুখ টুটিছে যে সুখ ফুটিছে
যে সুখের আশা ধূলায় লুটিছে
সবাকারে নিয়ে তুলিছ গাঁথিয়ে কত সুখদুখরাজিকে
সে মালিকা গাঁথা হইলে তোমার
সাগরের পায়ে দাও উপহার,
শেষে চাও সুখে আগামার মুখে অনন্ত তব আজিকে !

ইঁটের পাঁজা নহে মহানগরী আজ,
পাঁজরে আছে তার প্রাণের নীড়,
কত না গতকালে পাষাণ-বাসাতলে
বাসনা রাশি রাশি করেছে ভিড়!
নয়ন যদি থাকে মেলিয়া দেখো তবে
নিমের শাখা দোলে প্রাচীর পাশে,
তাহারি স্বনস্বনে পড়ে কি না গো মনে
বনের ঘন বাণী গভীর শ্বাসে!
আকাশ ঢাকে মুখ কুয়াশা-ধোঁয়া তলে,
দূরের সাড়া আর নাহি যে প্রাণে,
মানস-সরোবরে যে ঢেউ উঠে পড়ে
কাঁপে না মন তার তরল তানে!
চিলের ডাকে ডাকে আকাশ কেঁদে উঠে
দূরের বুকে খোঁজে ঘরের পথ—
আকুল সরণীতে রয়েছে বাঁধা যেন
অলকাপুরগামী ব্যাকুল রথ!
পাতিয়া কান শুধু শুধাও জনে জনে
মনে কি পড়ে কোন বনের গান,
ঘরের পাশে পাশে ঘুরিয়া ফিরে কি গো
শিকল পায়ে মাগি হারানো তান?
গভীর জনতায় যখন পথে চলি
সবার মুখে চাই দেখিব ব'লে—
পথের সাড়া কোন পেয়েছে কি না তাই
দোদুল-দোল-খাওয়া হৃদয় তলে।
যেদিকে ফিরে চাই নাই রে নাই নাই,
কেবল বাড়িঘর আকাশ-ভেদী,

তবুও জানি আমি গোপন-গলি মাঝে
রয়েছে পাতা চির-প্রেমের বেদী।
গগন-মূলে যবে তপন দেখা যায়
নিখিল-নভে জাগে অরুণা উষা,
তেমনি মনে লাগে তোমারি পরশনে
কঠিন ইঁট যত তরুণ ভূষা।
নিদল-দল টুটি আলোতে এলো ফুটি
স্বপনখানি মোর অলস-আঁখি,
শ্যামল-শাখে তারি কুলায় রচিয়াছে
আকুল-পাখা কত স্মরণ-পাখী।
তাদেরি গীতস্বরে নয়ন ঢুলে পড়ে
অতীত আসে আহা নূতন হয়ে,
বিদিশাপুরী, মরি, কনোজ কাশী কত
কলিকাতার কানে যায় যে ক'য়ে।
সাগর-গরজনে শ্রবণে পশে মোর
নিঝর ঝর ঝর শিখর ঘরে,
তেমনি আজি এই নগর-কল্লোলে
করুণ সুর পশে হৃদয় পরে।
মুকুতা কাঁদে যথা সাগরজল-তলে
আলোর লাগি প্রাণে কি আকুলতা,
আমিও আছি শুয়ে স্বপন-রসাবেশে
বলিতে চাই কারে মনের কথা।
ডুবুরী কে গো তুমি নীল-সলিল-নীচে
আঁধারে নেমে এস নীরব পায়ে,
দেখিবে সেথা ঝরে প্রবাল হ'তে আলো
মুকুতা-তরুটির কোমল ছায়ে।
আজিকে ম্লান-রোদে এসেছে ভেসে বুঝি
সুদূর হ'তে মধু স্বপনরাজি,

সঘন কোলাহলে অবশ হিয়াতলে
মানস মরমর উঠিছে বাজি !
নগরী, তব রূপে ভুলেছে মন মোর
তুলেছে মরমেতে যে মৃদু তান,
গ্রামের পথে তারে বহিয়া নিতে পারি,
দখিন বায়ে যেন রাখে সে প্রাণ !
কালের নভতলে রঙীন আলো সম
মিলায়ে যাবে যবে সুদূরে তুমি—
মরণহীন কোন কবির মনপটে
তখনো রবে তব স্মৃতিটি চুমি।

৩৫

আলো তুলে ধর, অয়ি নিশীথিনী, তুলে ধর তব লক্ষ তারা,
অজানা সরণে পড়ুক আসিয়া হাসিয়া বিমল রশ্মিধারা ;
ব্যর্থ হবে না দীপালি তোমার একটি প্রদীপ পাথকে দিলে,
ধরার ধূলায় হয় যদি ম্লান ধুয়ে নিয়ো তারে সকলে মিলে।

অনেক আলোক জুটেছিল মোর এই ধরণীর যাত্রাপথে,
প্রবীণ শাস্ত্র এসেছিল উঠে দীপ নিয়ে তার কুটীর হ'তে ;
ললাটে তাহার শত-শতাব্দী চিহ্ন রেখেছে নিত্য ক'রে,
আমি ঠেলে তারে চ'লে আসিয়াছি আমার আপন পথের পরে।

বিজ্ঞ বন্ধু পাণ্ডা প্রাচীন মতামত সব ঠেলেছি পায়ে,
পাকা রাজপথ ছেড়ে দূরে আজ এসেছি নিভৃত বনচ্ছায়ে ;
তোমারে বরিয়া নিয়েছি আমার সকলের চেয়ে আপন ক'রে,
হৃদয় আমার ভ্রান্ত হৃদয় দেখা দু'জনার পথের পরে !

৩৬

আর একটি বার সাধবো শুধু কওনা কথা বউ,
যবে আতার ডালে বসবে তোতা ডালিম ফুলে মউ!
তোমায় সাধে সবাই কিনা
তাই তো তোমার নাই ঠিকানা,
আকাশ কাঁদে পাখীর সুরে—বউ কথা কও, বউ!

তোমার লাগি ঝাউয়ের শাখে বাজায় বাঁশি বায়,
ঢেউ যে বলে, স্বপন ভেঙে আয়রে চ'লে আয়!
দুষ্টু তুমি এমনি বেশি
লতায় ফুলে রইলে মিশি,
সকল জা'গায় আছ তুমি, খুঁজবো কোথায় হায়?

মান ক'রে আর কত-না কাল কাটবে বল বউ?
হঠাৎ কবে দেখতে পাবে
বসন্ত সে ফুরিয়ে যাবে,
নয়তো জীবন অস্তে নাবে—সময় নাহি বউ,
তবু আতার ডালে বসবে তোতা ডালিম ফুলে মউ।

৩৭

আমি গাবো শুধু প্রেমের গাথা,
নাহি ধারি ধার কোনো দেবতার
হৃদিমাঝে যার আসন পাতা!
আমি গাবো গান কেমন করি
ফুলের খবর পায় রে পাতা;
কে ভরিয়া তোলে রজনী ধরি
শিশির-আখরে ধরার খাতা;
আমি গাবো সেই প্রেমের গাথা!

আমি গাবো শুধু নারীর গান,
কখনো দেবেরে কোনো মানবেরে
দেবো না বিকায়ে আমার প্রাণ।
রজনীর দুটি চরণ ঘিরে
ফুটে ওঠে যথা দিনের ফুল,
উচ্ছ্বসি আমি উঠিব সুরে
হেরিয়া দু'খানি আঁখি অতুল !

তোমরা, দেবতা, ক'রো না রাগ,
জীবন-প্রভাত কাটে যে হায়,
ফাগুন থাকিতে খেলে নি' ফাগ
যৌবন-বন-তরুর ছায় !
মাধবীলতার মাধুরী চোর
লীলায়িত লোল বাহুর পাশ
ফুলে পুলকিত ললিত ডোর
কণ্ঠে আমার রচিছে ফাঁস !
দে টান্ দে টান্ দে টান্ জোরে
মরি যদি মরি ফুলের ঘায়,
চ'লে যায় ওই যায় রে ওরে
ফাগুন যায় রে ফাগুন যায় !

ফাগুন যায় রে ফাগুন যায় !
সাথে যায় ওই ফুলের দল,
অগস্ত্য-তৃষা মিটে না হায়,
অশ্রু-সায়রে না মিলে তল !
ফোটে নাই কুঁড়ি এখনি তারে
বোঁটা হ'তে কেন ছিঁড়িয়া লও,

দেবো নাকো তাহা কোনো দেবতারে,
সবুর সও গো সবুর সও।
ফুটিয়া উঠিলে পড়িবে ঝরি
তাদেরি চরণে সঁপিবে প্রাণ,
আমার ব্যর্থ জীবন ভরি
গাবো আমি শুধু যাদের গান!

বসন্তসেনা

একদিন গৃহ-পাশে ক্ষণকালতরে
হয়েছিলে কেনা,
আজিও সে স্মৃতি জাগে বিশ্বের অন্তরে,
হে বসন্তসেনা !

সেদিনের মালিকার ঝরে গেছে ফুল—
চাঁপা, যূথী, হেনা,
নূতন বাঁধন লাগি অন্তর আকুল,
হে বসন্তসেনা !

ক্ষণ-ইন্দ্রধনুসম যে চুম্বনখানি
থরে থরে থরে
উঠেছিল বিকশিয়া, হে গুণ্ঠিতা রাণী,
তোমার অধরে—

চির-যৌবনের নভে আজো জাগে সেই
আকাশ-কুসুম,
তাহারে রাঙায়ে দিতে আনিয়াছি এই
স্বপ্নের কুঙ্কুম।

জ্যোৎস্না-লুপ্ত বলভির শ্লথশয্যাপরে
অর্ধজ্ঞানগতা,
প্রমোদ অধীর ছুটি ভঙ্গুর অধরে
কত বৃথা কথা,

ক্ষিপ্ত বক্ষ আন্দোলনে আর্ত আকুলতা,
কুচাগ্র বন্ধুর
তোমার বক্ষের পরে—কোথায় গেল তা
গেল কোন্ দূর ?

শিয়রে কনক-পাত্রে বুদ্বুদ-উজ্জ্বল
মত্ত ফেনিলতা,
পরুষবল্লভ করে প্রায় শ্লথ হ'ল
তব বেণীলতা।

ইন্দ্রিয়ের বাধা টুটি মর্মে প্রবেশের
সেই যে সন্ধান,
সীমার দিগন্ত ভাঙি অচক্ষু-দেশের
এই যে সন্ধান—

কোথা বল শেষ তার, কোথা অন্ত হায়,
কোথা সমাধান,
দেহের অর্গল ভাঙি দস্যুদল প্রায়
প্রাণ চাহে প্রাণ !

কে দেখেছ ভেদ করি মাংসের জঞ্জাল
রহস্য আত্মার,
মুক্ত সে যে অকলঙ্ক শাণিত-বিশাল
নগ্ন তরবার !

কারু-সুললিত ওই স্বর্ণ-কোষখান
জানি মধুময়,
কেহ না লভিল হায় এই যে কৃপাণ
তার পরিচয়।

দেহের খিলান-তলে ব্যগ্র তুই চোখে
চলি হাতড়িয়া,
জানি একদিন চক্ষু হঠাৎ আলোকে
যাবে ঝলসিয়া।

আত্মার বিদ্যুৎদীপ্ত সে রহস্যখান
আজিও অচেনা,
আছে আশা একদিন পাইব সন্ধান,
হে বসন্তসেনা!

চার্বাক

বাইশ বসন্তে বোনা এই জীবনের
শিশির-উজ্জ্বল ফুলে গাঁথা মালাটিরে
কারে সমর্পিব ছিল ভাবনা মনের—
হেন কালে তব নাম মনে এল ধীরে,
কিশোর চার্বাক!
অথই বিস্ময়ে তাই তাকাইনু ফিরে।

শাস্ত্র যবে শস্ত্র হাতে দাঁড়াইল উঠে
তুমি তারে স্মিতহাস্যে করেছ আহ্বান,
তোমার রোষাগ্নি বাণ পড়িয়াছে লুটে
তীক্ষ্ণ অবজ্ঞায় বিঁধি সংহিতার প্রাণ।
মূর্খ পণ্ডিতেরা
রাজাশ্রয়ে রাখিয়াছে আপনার মান।

স্নিগ্ধ উপেক্ষায় ভরা তব হাস্যখানি
সুমেরুর শ্রান্ত নভে অরোরার মত
তুষারের হিম বুকে জ্বালাইয়া বাণী
গুহার আঁধারে শুভ্র দেখায়েছে পথ—
যাহারে ধরিয়া
একমাত্র যেতে পারে মত্ত মনোরথ।

ক্ষুদ্র এই জীবনের দশদিকে হেরি
সতত কাঁপিছে এক মহা অন্ধকার—
লক্ষ শাস্ত্র-দীপশিখা চারি পাশ ঘেরি
পারিল না টুটিবারে মোহবন্ধ তার।
তুমি এসে ধীরে
হাস্য-দীপে করি দিলে আলোক সঞ্চার

যুগ-যুগান্তর-জমা পথপার্শ্বে ওই
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতার শাস্ত্ররাশি যত,
শুকায়ে হয়েছে যেন কাগজের খই,
আগুন লাগায়ে দাও, হোক সব গত।
দিক মৃদু আলো—
জ্বলিয়া মরুক এবে জ্বালায়েছে যত।

তুমি তো চলনি কবি পুঁথি-পন্থী পথে
অহোরাত্রি জোগাইয়া শাস্ত্রের মজুরি—
আমরা চলিব সবে আপনার মতে,
যায় যদি নিয়ে যাক বিষাদের পুরী।
উপদেশ যদি
কারো কাছে চেয়ে নিই সেও ঘৃণ্য চুরি।

কল্পিতেরে মনে মনে শ্রেষ্ঠাসন দিয়ে
প্রত্যক্ষেরে অবিশ্বাস পারি না করিতে,
সম্মুখের সরোবরে অবস্তু ভাবিয়ে
কল্পনার কুম্ভ মোর পারি না ভরিতে।
চোখে দেখি যাহা
তারাই লেগেছে মোর হৃদয় হরিতে।

কাননের প্রান্তে এসে নবীন ফাল্গুন
আমের মুকুলে ফুলে উঁকি দিয়ে যায়—
ক্ষয়হীন ধরণীর যৌবনের তূণ
মোর দ্বারে আসিবে সে একবার হায়,
তাই ব্যগ্র করে
বাসনা-শৃঙ্খল দিই তার দুটি পায়।

আমার এ দেহ হবে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ,
আমার অধর হবে মধুরস হারা,
তখনো কাঁদিবে চিত্ত পিপাসায় দীন,
আঙুলে গলিয়া যাবে সব জলধারা।
আমারি যৌবন
একবার দ্বারে শুধু দিয়ে যাবে সাড়া।

তাই আরো ব্যগ্র করে উন্মুখ অধরে
পিপাসার সরোবর মরিতেছি খুঁজি ;
দোষ যদি নাহি থাকে পূর্ণ সরোবরে,
কেন তাহা পানে দোষ—নাহি পাই বুঝি।
হে যুবা নির্ভীক,
কর এর সমাধান শুভ্র সোজাসুজি

মানুষের তনু ভোগে নাহি কোনো পাপ,
এ বিশ্বে একটি কথা বুঝেছি অন্তত,
এই দেহ পরে আছে বিধাতার ছাপ,
নহিলে এ দেহ হেন সুন্দর কি হ'ত!
বলুক যে যাহা,
আমি এই দেহ-স্বপ্নে আছি তন্দ্রাহত।

বিধাতার তাম্রলিপি আতাম্র অধরে
এনেছে বহন করি তনুতীর্থা নারী,
রহস্য-লোলুপ তাই ছুটি চক্ষু ভ'রে
নির্নিমেষ চেয়ে আছি—বুঝিতে না পারি।
হে চারু চার্বাক,
উদ্‌ঘাটিয়া দাও তারে আলোক সঞ্চারি।

সেদিন ফাল্গুন প্রাতে বনদীঘি জলে
কূলে কূলে ক্ষীণ শ্যাম শেহলা শুকায়,
আজিকে ফাল্গুনে এই শালবীথিতলে
মরণ-অলস পাতা ঝরে পড়ে হায়—
অমর চার্বাক,
ক্ষীণ এই কণ্ঠ তব কানে কি পৌঁছায়?

প্রেমের জয়

সুদূরে রহি গোপন প্রেম আমার সে তো নয়—
সকল দেহময়
তোমার গাথা একটি গানে
উঠিবে বাজি তরুণ তানে,
ডুবিবে দেহ দেহের বানে
লজ্জা দ্বিধা ভয়
সকল দেহময়।

সুধা কি শুধু রুদ্ধ রবে ক্ষুধা কি কিছু নয়!
রূপ যে ধরাময়
ছড়ায়ে আছে মাধবী রাতে,
জড়ায়ে আছে শেফালি সাথে,
গড়ায়ে পড়ে তরুর পাতে,
এমন কেন হয়—
রূপ যে ধরাময়!

দেহের তৃষা মিটিলে তবু করিব না গো ভয়,
প্রেমেরি হবে জয়।
আমার তুখ-মৃণাল পরে
উঠিবে ফুটি গরব ভরে
নিত্য মহাকালের তরে
স্মৃতির কুবলয়,
প্রেমেরি হবে জয়।

তোমারে যবে ভুলিব তবু তখনো নাহি ভয়,
প্রেমেরি হবে জয়।
আবার কেহ নূতন বেশে
হৃদয় মাঝে দাঁড়াবে হেসে,
নূতন করে নূতন দেশে
পুরানো অভিনয়,
প্রেমেরি হবে জয়।

জীবন যবে অস্তে যাবে তখনো নাহি ভয়,
প্রেমেরি হবে জয়।
আমার চির মিলন-আশা
অগাধ মম যে ভালবাসা
নূতন শাখে বাঁধিবে বাসা
ক্ষণিক সে তো নয়,
প্রেমেরি হবে জয়।

তনু-তীর্থ

তোমার মাথায় চুল পেকেছে ব'লে
সকল মাথাই নয়কো শাদা নয়,
তোমার চোখে হয় তো লাগে ঘোর,
সকল চক্ষু নয়কো আঁধা নয়—
খুঁজলে শিরে দেখবে আছে ঢাকা
দু-একটি চুল নয় যা তেমন পাকা।

ফাগুন-সাঁঝে মনের ক্ষণ ভুলে
ভালোয় যদি ব'লেই থাকি ভালো,
চাঁদের আলোর ভরসা রেখে যদি
নিবিয়ে থাকি প্রদীপটারি আলো,
এইটি ভেবে ক্ষমো আমায় ক্ষমো—
তোমার চেয়ে বয়স আমার কম ও।

শিশির-ছোঁওয়া অঘ্রাণেতে যদি
প্রিয়ার নামে একটি লিখি গান,
নূতন-গাঁথা বেণীর পাকে যদি
গুঁজেই থাকি একটি গুছি ধান,
স্মরণ রেখো বয়স যবে কুড়ি
এমনতরো ঘটেই ঝুড়ি ঝুড়ি।

মৃণাল-রুচি তরুণ তনুখানি
তিলক ক'রে আঁকিই ভালে যদি,
মহুয়া-ঘন মাধুরী আহা তার
অঙ্গে মম জড়াই নিরবধি,
মনেতে রেখো দেহের বাতায়নে
দেহাতীতের ফিরি অন্বেষণে।

মনেতে রেখো যাত্রী আমি চির
নানা তনুর তীর্থে মরি ঘুরে,
কাহারে চাই নিজেই জানি না যে,
আছে কি কাছে আছে কিগো সে দূরে ?
কোথায় আছে জানি না আমি তাই
সবার দিকে লোভীর মত চাই।

তরুণ-তরুণী

জগৎ জুড়ি যেথায় যত আছে,
ওগো আমার তরুণ তরুণী,
যাদের কভু পাইনি হাতে কাছে,
ফিরিছে যারা স্মৃতির পাছে পাছে,
তাদের লাগি তৃষ্ণা জাগি আছে
পরাণ মাঝে মনের মাঝে গো,
ওগো আমার তরুণ-তরুণী !

যাদের কভু হয়নি চোখে দেখা—
ওগো আমার মানস-মৃগ-তৃষা—
হেরিনি কভু যে দেশ পথ-রেখা,
হেরিনি কভু যাদের রথ-লেখা,
তাদেরি মাগি তাদেরি মাগি দেখা
সকল দেহে সকল দেহে গো,
ওগো আমার মানস-মৃগ-তৃষা !

পেয়েছি যারে তাহারে চাহি আরো,
ওগো আমার পরশরসখনি,
কোথায় তলা দেখিব আছে তারো,
বাহুর ডোরে উঠুক্ জমে গাঢ়
কেবলি পাওয়া বেড়েই চলে আরো
স্মরণসুখে স্মরণসুখে গো,
ওগো আমার পরশরসখনি !

একাকী কারো নহি গো আমি নহি,
ওগো নিখিল তরুণ-তরুণী,
হৃদয়ে মম যে প্রেমধারা বহি
ফুরাবে না তা বাড়িছে রহি রহি,
তাই তো আমি একারো কারো নহি
আঙিনা-ঘেরা বিজন গৃহ কোণে,
ওগো নিখিল তরুণ-তরুণী !

রক্তে বাজে অধীর আকুলতা,
ওগো চপল তরুণ-তরুণী,
এ মনে আছে এতই প্রেম কথা
বিলাতে পারি যা খুশি যথা তথা—
বিদেশে দেশে আমার আকুলতা
দুমুঠা ভরি দুমুঠা ভরি গো,
ওগো চপল তরুণ-তরুণী !

একটি লয়ে কেমনে পাবো সুখ,
ওগো অনেক, ওগো বিবিধ-রূপা,
সবার সনে কাঁপিছে মম বুক,
সবার সনে আমার সুখ দুখ,
তাইতো আমি পাই না ঘরে সুখ,
ওগো অঘরা, ওগো ভুবনময়ী,
ওগো অনেক, ওগো বিবিধ-রূপা !

ওই যে কাঁপে নবীন তৃণ পরে
নূতন শীতে শিশির ছলছল,
তেমনি মন কাঁপিছে ব্যথা ভরে

কখনো সুখে কখনো মহাডরে
বিশ্বজন মানস-তৃণ পরে,
ঝরে না তবু পড়ে না লুটে গো,
নূতন শীতে শিশির ছলছল।

কাহারে চাই আমি কি তাহা জানি!
ওগো অরূপ, ওগো অচিন্ তুমি!
বৃন্ত হ'তে ছিড়িয়া মনখানি
নিঙাড়ি তারে যে সুধা টেনে আনি—
চাহি কি তাহা? তাও তো নাহি জানি,
বেদনা শুধু বেড়েই চলে হায়!
ওগো অরূপ, ওগো অচিন্ তুমি!

কে তুমি ওগো করিছ লুকোচুরি
নয়ন-টানা রূপের আড়ে আড়ে!
আশায় তব বক্ষ উঠে পুরি,
ব্যথায় তব নেত্র মরে ঝুরি,
রাখো গো রাখো লাখো এ লুকোচুরি—
থেকো না ওগো থেকো না চিরদিন
নয়ন-টানা রূপের আড়ে আড়ে।

তৃষ্ণা ওগো তৃষ্ণা হানে শর
রৌদ্র-রাঙা হৃদয় মাঝে গো,
সাহারা মরু তারে না করি ডর,
পিপাসা লাগি রয়েছে নির্ঝর,
ইসারা করে তোমার খরশর
কোথায় আছে বনের শ্যামছায়া,
রৌদ্র-রাঙা হৃদয় মাঝে গো!

কোথায় আছে দেখায়ে দাও সেই,
ওগো নিখিল তরুণ-তরুণী,
চোখেতে কভু যাহার দেখা নেই
আছে যে তবু সকল জা'গাতেই,
কোথায় আছে বল না মোরে সেই
যাহারে পেলে সকল পাওয়া হয়,
ওগো নিখিল তরুণ-তরুণী !

ততঃ কিম্‌

না হয় তোমার রূপের সুধা পান করিলাম শেষ করি,
না হয় দেহের রাগ রাগিণী বাজল আমার অঙ্গুলে,
না হয় হলই সব বাসনা সফল আমার প্রাণ ভরি,
না হয় ভোগের ভোগবতী সে ভাসায় দুকূল ঢেউ তুলে,
না হয় যারে চেয়েইছিলাম পেলাম তারে অন্তরে।
তার পরে কি—তার পরে ?
না হয় তোমার আঁখির তলে দেখনু দুদিন নিজ ছায়া,
কাজল সম রইলে তুমি না হয় আমার চক্ষেতে,
মোহের মত লাগলো দেহে সুধার মত ওই কায়া,
মালার মত বইনু তোমা তৃষ্ণা-দাগা বক্ষেতে,
না হয় পরশমণির ছোঁয়ায় হলেম সোনা অন্তরে।
তার পরে কি—তার পরে ?
না হয় গেল এক সাহারা তোমার সুধায় পার হওয়া,
তার পরে কি মিলবে সখি শ্যামল-ছায়া বন্‌ভূমি ?
শেষ আছে কি এই মরুভূর ? কতই বল যায় সওয়া ?
অন্ত তোমার পেতেই হবে সেই যে ছোট সেই তুমি—
না হয় তোমার শেষ মিলিল বাহির এবং অন্তরে।
তার পরে কি—তার পরে ?

আছেই আছে

তুমি যবে হবে পরের ঘরণী আমি হব যবে পরের কবি,
আজিকার এই দিনের কাহিনী হবে যবে শুধু ছবির ছবি,
স্বপনেও আর কথাটি আমার পড়িবে না যবে তোমার মনে,
তরুণ প্রেমের করুণ তপন ডুবে যাবে যবে বিস্মরণে,
তখনো তখনো তখনো সখী রে মিথ্যা এ নয় আমার কাছে,
কোনো খানে কিছু আছেই আছে।

তুমি সেজেছিলে চাঁপার তরুটি মনে পড়ে গেল অনেক আগে,
আমি ছিনু ওই কালো মূক মাটি সেই কথা আজো চিত্তে জাগে,
শত শিকড়ের ব্যাকুল প্রয়াসে আঁকড়িয়া ছিলে বক্ষে জোরে,
মৌন-বেদনা সৌরভ-ভাষা ফুলের সুধায় বাঁচালে মোরে—
চোখের সমুখে নাই যারা তারা চির জাগরূক স্মৃতির পাছে,
কোনো খানে কিছু আছেই আছে।

এই মহাকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে কাছাকাছি দোঁহে হলাম হায়,
জানার সিকতা ডুবায়ে ডুবায়ে অজানার মহাস্রোত যে ধায় ;
স্বপন-সুদূর আঁখি দুটি তব মিথ্যা নহে গো মিথ্যা নয়,
তবু জানিয়াছি তারো চেয়ে বড় আছে কোথা কিছু সুনিশ্চয় ;
সব শেষ হ'লে হয় নাকো শেষ তাইতো জগৎ আজিও বাঁচে,
কোনো খানে কিছু আছেই আছে।

শয্যা-বল্লভ

জ্যোৎস্নাঢালা শয্যাপরে
শুভ্র নীলিমার
একটি পাশে একলা শুয়ে চাঁদ ;
তারার পাখি ধরার লাগি
পাতা সে নির্জনে
সুধায় মাখা ক্ষুধায় ভরা ফাঁদ।

তেমনি তুমি পড়েছ শুয়ে
এলায়ে দেহভার
ব্যাকুল-বাহু অগাধ বিছানায়,
বন্ধু সম বিশ্বাসেতে
রেখেছ তব গাল
হংস-শাদা বালিশটিতে হায়।

দিনের বেলা যে সব কথা
মনের কোণে কোণে
ছায়ায় মিশে বেড়ায় চুপে চুপে
রাতের বেলা সুযোগ পেয়ে
পালক-লঘু পায়
বাহিরে তারা আসে স্বপন রূপে।

ঘুমের বেড়া টুটিয়া গিয়া
পড়ে কি মনে তব
দিনের বেলা আছিল কারা সাথে!
স্বপনে শুধু মেটে কি আশা!
আলোক-ভীরু তারা
চকিত সম মিলায়ে যাবে প্রাতে।

চন্দ্র যবে অস্তে চলে
ফেলিয়া যায় রেখে
কবরী হ'তে শুকতারাটি হায়,
একটি শুধু লেবুর ফুল
পড়িয়া থাকে, মরি,
সকাল বেলা তোমার বিছানায়।

কোমল তব দেহের চাপে
কোমল শয়নেতে
আধেক রেখা আঁকিয়া রাখে আর,
এই খানেতে হাতটি ছিল,
আঁচল-খসা বুক
এই খানেতে ছাপ রেখেছে তার।

খানিক তব দেহের বুঝি
রাখিয়া গেছ এই
শয়ন-তলে আমার লাগি, প্রিয়া!
তোমায় বুকে পাইনা তবু
আধেক মেটে সাধ
শয্যাখানি বক্ষে আঁকড়িয়া।

মাটির পুতুল

জানি জানি তুমি মাটির পুতুল,
জানি জানি তুমি পুত্তলিকা!
জানি জানি তুমি দু-দিনের দীপে
চিরদিনকার জ্যোতির শিখা!
কাঁপে তব তনু নিঃশ্বাস ভরে,
তবু প্রাণ মোর বিশ্বাস করে
তুমি অচপল পুলক-অতল
গত-হলাহল সুধার টিকা।
জানি জানি তুমি পুত্তলিকা!

আকাশ-নদীর উজান বাহিয়া
ডিঙায়ে তারার উপল নুড়ি,

কাল স্রোতধার বহে অনিবার
সৃষ্টির মুখে বাজায়ে তুড়ি।
সে প্রবাহ বলে ভাসিছে জগৎ,
চমকিয়া উঠে দূর ছায়াপথ,
লাগে ঢেউ তার পাঁজরে আমার,
কাঁদে হাহাকার জগৎ জুড়ি,
সৃষ্টির মুখে বাজায় তুড়ি।

এই যে ধরায় কত যুগ হ'তে
শিশির-আখরে রজনী ধরি
গোপন কাহিনী কোমল আঙুলে
বারে বারে হায় উঠিছে ভরি,
অলখ্ পায়ের স্তুতি-ছন্দেতে
লুটায় শেফালি মৃদু গন্ধেতে,
এরা তো মরে না, এরা তো ঝরে না,
এরা তো ডরে না, কালের তরী
বারে বারে হায় উঠিছে ভরি।

যে গোপন টানে শেফালির ছায়া
ঝরে-পড়া ফুলে ভরিয়া উঠে,
আকাশের সুখ ছায়ালোক-পাতে
ধরণীর বুকে নড়িয়া উঠে,
নয়নে তোমার যায় ওই দেখা
চির-জীবনের অঞ্জন-রেখা,
অধরে তোমার, প্রাণেশ, সভার
সঙ্গীত ধার কাঁদিয়া লুটে।
ঝরে-পড়া ফুল ভরিয়া উঠে।

মৃত্তিকা আজি অমৃৎ হয়েছে
কালো মাটি আর মাটি সে নয়,
তব তনুখানি তিলক করিয়া
আঁকিব আমার ললাটময়।
অমৃতের সেই জ্যোতি-স্বাক্ষর
দেখাইবে মোরে ওপারের ঘর,
চিরকাল সুখে সবার সমুখে
গাহিব এ মুখে তনুর জয়।
কালো মাটি আর মাটি সে নয়।

প্রিয়া-প্রদক্ষিণ

রক্তে মোর লাগিয়াছে দোল,
বক্ষে মোর বৃন্ত-হীন শত আনন্দের
উঠিতেছে উল্লাস কল্লোল।
কাল-নভে ঘূর্ণমান যত সব উর্ম্মিনীহারিকা
ছন্দের তরঙ্গে তারা লিখিতেছে জ্যোতির বিশখা—
তারি ছোঁয়া লাগিয়াছে তীক্ষ্ণ চুম্বনের
ওই তব কম্পিত বসনে,
ললিত নয়নে,
ওই তব চিকুর চিক্কণে,
নূপুর নিক্কণে ;
ওই তব কঙ্কণের কমনীয় হৈম আলো-টিকা
অঙ্গে মোর আঁকি দেয় পথিকের পদাবলি-লিখা,
মর্মে আনে আদিম হিল্লোল,
রক্তে মোর লাগিয়াছে দোল ॥

সখী মোর দাঁড়াও ক্ষণিক,
তরল দুচোখে তব শেফালি-সরল
স্বচ্ছতাটি করে ঝিক্‌মিক।
ওই তব অনবদ্য কুসুমিত কপোলের তরে
চন্দ্র সূর্য তারা জ্বালি, বিশ্ব হের আরাধনা করে,
ওই তনু ভঙ্গিমাটি মিশ্রিত গরল,
ওই তব গলিত কবরী
গ্রীবাটি আবরি,
ওই তব স্খলিত অঞ্চলে,
দুচোখ চঞ্চলে,
দাঁড়াও দাঁড়াও সখী একবার আগ্রহের ভরে
ভেঙে দেখি, টুটে দেখি, কে আছে এ মন্দির ভিতরে,
বন্দি তারে আঁখি নির্নিমিখ্।
সখি মোর দাঁড়াও ক্ষণিক ॥

একবার ছুঁয়ে লই তব
কম্পমান বসনের প্রান্ততম কোণে
শেফালিকা পুষ্প অভিনব।
কে জানে এ জীবনের লক্ষ্যে আছে নিশ্চয় মরণ!
হয় তো ছুটিছে মৃত্যু জীবনের মাগিয়া শরণ
সৌর পরিবার সম অনন্ত গগনে!
ওই আলো আঁধারের মত
কাঁপিছে নিয়ত,
কেবা আগে রয়েছে কে পিছে,
উপরে কে নীচে!

তিমিরের মাঝে এই কেন দুটি তারার স্ফুরণ !
হয় তো আলোর কোলে অন্ধকার করি বিচরণ
লভিতেছে জন্ম নব নব !
একবার ছুঁয়ে লই তব ॥

তুমি আছ আর কিছু নাই,
সত্য যদি এ কথায় হয়েছে প্রত্যয়
একবার বলে লই তাই ।
একবার দেখে লই তুমি সখী ভুবনে ভুবনে
অসীম আশার মত বাসনার গগনে গগনে
অবকাশলীলাময়ী দাঁড়ায়ে তন্ময় ।
ওই তব আঁচল আন্দোলে
লক্ষ প্রাণ দোলে,
ওই তব শিথিল কবরী,
চির বিভাবরী ;
শত যুগ বিকশিয়া আপনার কাল-শতদল
দণ্ড পল ফিরে গান গাই' ।
তুমি আছ আর কিছু নাই ॥

সত্য যদি মিথ্যা হয় শেষে,
কোন সান্ত্বনার দ্বারে দাঁড়ায়ে মোদের
রুদ্ধ আঁখি যাবে জলে ভেসে !
এই আকাশের তলে তারকার চোরা-বালিপরে
যে বিশ্ব তুলেছি গড়ে বহু ব্যর্থ জাগরণ ভরে,
হঠাৎ নড়িয়া গিয়া ভিত্তি স্বপনের
চূর চূর হয় যদি হায়,
কি তবে উপায় !

সেই ভাঙা ভুলের ভূলোকে
পড়িবে কি চোখে
সত্য মিথ্যা কোথা আছে! সেই মহাপ্রলয়ের ঝড়ে
নব সত্য নব রাজ্য নব স্বপ্ন জাগিবে অন্তরে
পুরাতন নবতন বেশে,
সত্য যদি মিথ্যা হয় শেষে ॥

বাতায়নিকা

জাল-বোনা এই জীবনখানার
বাতায়নের পারে
তোমার বাসা হায়,
লোহায় গড়া গরাদগুলো
তোমায় রাখে ধরে
মৌন পাহারায়।

সূর্য যবে প্রথম উঠে
আশার লালে লাল
পায়রা-রঙা নভে,
তখন তব পাই যে সাড়া
গানের দিতে তাল
কিঙ্কিণী-উৎসবে।

দুপুর বেলা খোঁজে যখন
লেবুর কচি ফুল
পাতার ছায়া ক্ষীণ,
খন তুমি স্বপন দেখ
চিত্ত-নীলিমায়
নয়ন দুটি লীন।

সন্ধ্যাবেলা সূর্য যবে
অস্তাচল পারে
ক্লান্ততর হয়,
দিক্‌বালিকার কর্ণে যেন
রৌদ্রে ম্রিয়মাণ
করুণ কুবলয়,

তখনো তুমি রয়েছ ব'সে
চক্ষে জাগে ওই
বাতায়নের পারে,
স্বচ্ছ শশী দিগন্তরে
চরণ টিপে টিপে
আধেক উঁকি মারে।

ঝরিয়া পড়ে আঁধার ধীরে
কুলায়-তৃষাতুর
হাঁসের পাখা হ'তে,
তারার দলে ছুটিয়া এসে
ঝাঁপায়ে পড়ে যেন
মন্দাকিনী স্রোতে।

তখনো কেন রয়েছ ব'সে
অমন ক'রে একা
বাতায়নের বালা?
হয়েছে দেখ অনেক দূরে
সপ্ত-ঋষি দেশে
ধ্রুবতারাটি জ্বালা।

বাহিরে তুমি আসিতে নার,
বলনা মোরে খুলে
কিসের বাধা তব ?
আমিও নারি ভিতরে যেতে
আয়স-বাধা ভাঙা
আয়াস-অভিনব।

জীবনখানা রয়েছে প'ড়ে,
কঠিন বড় লাগে,
কঠিন যেন শিলা,
ইহারি মাঝে ফুটাতে হবে
মূর্তি মরমের
কে হেন কাজ দিলা ?

দুঃখে সুখে বাটালি ধ'রে
দিবস নিশীথে
আঘাত করি হায়,
তারার মত পাথর-কুচি
এদিক ওদিকে
ছড়িয়ে প'ড়ে যায়।

কি ছবি হেথা উঠিবে ফুটি
একদা অবশেষে
কেউ কি তাহা জানে,
কখনো তারি আভাস পাই
ছায়ার চেয়ে ছায়া
তোমারি মাঝখানে।

বুকের তব পরশ পেয়ে
তপ্ত হয়ে ওঠে
গরাদ লোহা-গড়া,
সকল ছেড়ে পাথরে শেষে
বাতায়নের বালা
দেবে কি তুমি ধরা ?

রিক্তা

নৃত্যপরা,
কম্পিত-কায়া,
চম্পক ছায়া
পুষ্পঝরা,
সন্ধ্যা-আকাশে আঁধারের মত
তন্দ্রা-ভরা,
তালে তালে যার কবরী বিতত,
নৃত্যপরা।

অঞ্চল খোলে, ঝরে পড়ে ফুল,
দিগন্ত যেন তারকা-আকুল,
তরঙ্গ যেন উচ্ছলি কূল
রবির কিরণে
কলস্বরা,
নৃত্যপরা।

মুঞ্জরিতা,
নব মধুমাসে
গোপন নিশাসে
চঞ্চলিতা।

পুষ্প-পরশ কটিতে মেখলা
গুঞ্জরিতা,
ভ্রান্ত ভ্রমর ফেরে সারাবেলা,
মুঞ্জরিতা।
নন্দন বায়ে বাহু আন্দোলি
ঢালো দিকে দিকে ফুল অঞ্জলি,
স্বর্গ যেনরে এলো কাছে চলি,
আকাশ গঙ্গা
সঞ্চরিতা,
মুঞ্জরিতা।

নৃত্যশীলা,
হ'ল শেষ তব
ভাঙ্গিল নীরব
ফল্গুলীলা।
অহল্যা যেন টুটি দৃঢ় অতি
মাটির ঢিলা ;
বীণা ভেঙ্গে সুর নিলে কি মূরতি,
নৃত্যশীলা !
দেহ-কুঙ্কুম গেছে গেছে পুড়ে,
ওই ছায়া-ধূপ ওঠে ঘুরে ঘুরে,
নয়নে হেরি—না দুটি কান জুড়ে
ও তনু তোমার
সম্ভাষিলা।
নৃত্যশীলা।

বল্লরিণী,
লাগে সন্দেহ
ওই বীণা-দেহ

চিনি কি চিনি!
কাঁপে যে গগনে অগণ্য তারা
ঝিনিকি ঝিনি!
ওই করতালি জানে কি তাহারা,
বল্লরিণী।
অন্তরে মোর শুনি ওই তাল
কম্পিত হিয়া হ'ল এত কাল।
চন্দ্র-সূর্য ধরি করতাল
নাচে দিগ্বালা
তরঙ্গিনী,
বল্লরিণী।

রিক্তা, মরি,
যাবে অবশেষে
নৃত্য-আবেশে
সকলি ঝরি।
কাঞ্চী কেয়ূর স্থানগৌরবী
কলস্বরী,
প্রাণবহ্নিতে হবে সব হবি,
রিক্তা, মরি।
সরম-সূক্ষ্ম বসন টুটিয়া
অলোক-কুসুম উঠিবে ফুটিয়া,
রুক্ষ-বৃন্ত যাবেরে ঢাকিয়া,
শাশ্বত রবে
আকাশ ভরি।
রিক্তা, মরি।

অঘ্রাণী

স্তিমিত-তারার দেশে কোন দূর নিশীথ-নভসে
তব রাজধানী !
অবসন্ন শেফালিকা বিদায়ের বিষণ্ণ প্রদোষে
শিশির-কুণ্ঠিত প্রাতে গন্ধাতুর যেই প'ল খ'সে'—
আসিলে অঘ্রাণী।

কেঁপে ওঠে ভ্রূ-বঙ্কিম কাননের বসন প্রান্ত রে
পরশন জানি,
শস্য-কাটা শূন্য-ছবি উদাসীন প্রাচীন প্রান্তরে
অকস্মাৎ দিয়ে ফেলি লগ্নহারা মোর প্রাণ তোরে
অলগ্না অঘ্রাণী।

উতলা কুন্তলে তব একগুছি ধানের মঞ্জরী,
দোলে শীষখানি,
নিটোল আঙুলে তব পদ্ম এক হিমে ঝরি-ঝরি,
কুয়াশা-অঞ্চলতলে তনুলতা উঠিছে শিহরি,
হে তন্বী অঘ্রাণী।

আতপ্ত অঞ্চলে সুধারৌদ্রখানি এনেছে বহিয়া
তব দুটি পাণি,
ঝরে-পড়া শেফালির বোঁটা দিয়ে মালাটি গাঁথিয়া,
সুপ্ত নূপুরের স্বপ্নে দিকে দিকে নিদ্রা বিথারিয়া
এসেছ অঘ্রাণী।

আপক্ক ধান্যের ক্ষেতে সুধাভারে আনম্র ফসলে
লঘু পদ হানি,
হিমোৎসুক নগ্নমাঠে নবান্নের মায়া মন্ত্রবলে
সঞ্চারিয়া, গ্রামে গ্রামে সঞ্জীবিয়া এস এস চলে,
হে লক্ষ্মী অঘ্রাণী।

পূর্ণিমা

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
আকাশের চাঁদ লক্ষ্যি!
নিটোলগড়ন মধু চাকখানি
কনক-চাঁপার মধু আনি আনি
ভরিয়া তুলিছে সারারাত জাগি
তারাদল মধুমক্ষি।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি,
যায় যদি রাত শোক কি!
শেফালি-শিথিল সমীরণে যদি
তারার প্রদীপ নিভে নিরবধি,
চাঁদের আলোয় আমরা জাগিব,
সাথে জাগিবেন লক্ষ্মী।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
আঁখি হ'তে ঘুম রক্ষি'!
ফিরিছে স্বপন কাঁদিয়া কাঁদিয়া
মালতীর চোখে পরশ সাধিয়া,
আকাশে শুভ্র মেঘ-মল্লিকা
জাগে অতন্দ্র অক্ষি।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি,
আসে নিদ্রার ঝোঁক কি !
ঘুমাক সকলে, আমরা ক' জনই
উত্তারায়ণে কাটাবো রজনী,
চিত্তের ক্ষুধা মিটিবে আজিকে
স্বপ্নের ফল ভক্ষি'।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি,
ঘুমে ঢুলে পড়ে চোখ কি !
এমনি নিশীথে পারি বুঝিবারে
মথন-ক্লান্ত আদি পারাবারে
নব বিশ্বের বিস্ময় সম
উঠেছিলা চির-লক্ষ্মী।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি,
ঘুমায় না নীড়ে পক্ষী।
আঁখি মেলে দেখি একি মনোরম,
কামনা-নদীর সঙ্গম সম
কল্পসাগর—সেথা শতদলে
শরৎ-মাধুরীলক্ষ্মী।

খোয়াই

শূন্য-হৃদয়ের মত রয়েছে পড়িয়া
দিগন্ত ভরিয়া
রক্তিম কাঁকর-ঢালা ধূসর খোয়াই।
যে দিকেতে চাই
শীর্ণ মাঠ ছেয়ে আছে কণ্টক অশেষ ;
অতৃপ্তির দেশ

ফিরে-আসা বসন্তের অলক্ষ্য হাওয়ায়
করে হায় হায়।

বারে বারে নুয়ে নুয়ে পড়ে যবে মন,
ফাল্গুনের বন
পর্যাপ্ত-মুকুল ভারে বিদ্রূপের প্রায়
চক্ষে যবে ভায়,
আশাহীন অতি দীর্ঘ বিরহের মত
প্রান্তর সতত
নীরস কারুণ্যে ভরি দেয় বক্ষ মোর,
কাঁপে চক্ষে লোর।

বন-শূন্য দিগন্তের পরপার পথে
পীতালোক স্রোতে
ডুবে যায় কোকিলের নয়নের ছবি
ধূলি-পান্থ রবি।
একটি তারকা কোলে পা টিপিয়া ধীরে
বনান্তের শিরে
শুভ্র-ঝিনুকের মত উঠে আসে চাঁদ—
তারা-ধরা ফাঁদ।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি বনান্তের কোলে
ক্ষণকাল দোলে,
তার পরে কখন যে দিগন্তের গায়
মিশে মুছে যায়,
গগনের রক্ত-পটে তাল তরু রেখা
যায় ক্ষীণ দেখা ;
দেখা-না-দেখার মাঝে কাঁপিতে কাঁপিতে
মিলায় চকিতে।

গেরুয়া মাটির ঢেউ বৈরাগ্যের প্রায়
উঠিয়া হেথায়
তরঙ্গিয়া চলে গেছে দূর হ'তে দূরে
আবর্ত্তিয়া ঘুরে,
ধূসর বালুতে আর নীরস নুড়িতে
ঘুরিতে ঘুরিতে
কাছ হ'তে বাহিরিয়া গেছে কোন দূর,
উপল-বন্ধুর।

লক্ষ্য-হারা মাঠে এই শ্রান্ত মোর হিয়া
দিব বিছাইয়া।
আকারবিহীন এই প্রান্তরের প্রায়
চিত্ত মোর হায়
আপনি বুঝিতে নারে, আপনি যা বলে;
নিজ অশ্রুজলে
নিজেই ডুবিয়া মরে তল নাহি পাই।
অতল খোয়াই!

কোপাই

আমি তোমায় ভুলতে পারি,
অয়ি কোপাই নদী,
এমন কথা ভাবতে তুমি পারো!
তাই কি জাগে কলধ্বনি
তোমার দুটি কূলে
এমনতরো অশ্রুমৃদু গাঢ়?

আর জনমে হবই আমি
তোমার বালুতীরে
জামের তরু, ব্যাকুল ছায়া মেলি
প্রাচীন কথা স্মরণ করে
তোমার জলে আমি
কয়েকটি ফল দেবই দেব ফেলি।

আমি তোমায় ভুলতে পারি,
অয়ি কোপাই নদী,
এমন কথা ভাবলে তুমি মনে!
তাই কি হেরি পল্লবিত
কিশলয়ের ব্যথা
সবুজ-কথা তোমার বনে বনে
আর জনমে হবই আমি
কোলের কাছে তব
মৃৎ-গীতিকা তট-বীণার তার,
তুলবে তুমি, অয়ি কোপাই,
তরঙ্গ-অঙ্গুলে
আমার বুকে তরল ঝঙ্কার।

আমি তোমায় ভুলতে পারি,
অয়ি কোপাই নদী,
এমন কথা ভেবোনা কখ্‌খনো—
তোমার তীরে আসবো ফিরে
বন-ভোজনে আমি,
বিশ্বাসেতে আমার কথা শোনো

ইস্কুলেরি বালক হয়ে
পুলকভরা দেহে
তোমার জলে করব নাচানাচি,
সকল দ্বিধা ঘুচ্‌বে যবে
অসহ্য উৎপাতে
বুঝবে তখন আছিই আমি আছি।

ঊষা

স্বপন-হারিণী দ্যুলোক-দুহিতা
উষসী ছুটিছে ওই!
স্তুতিচঞ্চল চরণে চমকি
ঝরে শিশিরের খই,
দস্যু আঁধার ভয়েতে পালায়
পূষণ সূর্য কই?

প্রণয়-পাগল তরুণ তপন
পতঙ্গ-লঘু পায়
বাসনা-বিপুল পৌরুষ করে
ধরিতে তাহারে চায়,
কপোত-ধূসর আকাশ ব্যর্থ
বেদনায় রাঙা হায়!

উদয়-গিরির শিখরের ছায়ে
করুণ চন্দ্র বাঁকা—
(পিছে-পড়া যেন রাতের স্বপন
দিনের আলোকে ঢাকা,
মন্দাকিনীর তীরে খসা যেন
স্বচ্ছ হাঁসের পাখা।)

বিশাল-ললাট দিবসদেবের
রথ-চক্রের রবে
কোথা উড়ে গেছে আঁধার কাননে
তারা পাখীদল সবে,
শুকতারা বুঝি কেঁদে গলে যায়
শিশিরের গৌরবে!

কমল-মালিকা ঊষারে হেরিয়া
হোমানল মেলে আঁখি,
নীরব গোষ্ঠ প্রাণময় করি
ধেনুদল ওঠে ডাকি,
বনছায়ে ওঠে সামগীতি রব,
অলস কুলায়ে পাখী।

বিশ্ব-তরুর শাখায় তপন
বুনিছে ঊর্ণাজাল,
বজ্র-রাখাল গগন-আঙনে
হাঁকায় মেঘের পাল,
রক্ত-অধীর নাড়ীর মতন
কাঁপিতেছে মহাকাল।

ঊষা-পূষণের কাহিনী আকাশে
সোনার বরণে আঁকা,
শ্যামল ধরাতে পীত রবিকর
আধেক হয়েছে মাখা,
মনে হয় যেন আকাশোন্মুখ
শুকপক্ষীর পাখা।

চিরকাল ধ'রে ছুটিছে উষসী
প্রণয়-পরখ-ভীতা,
চিরকাল তারে মাগিছে তপন
বক্ষে বাসনা-চিতা,
ভালবাসা চির দূরের দুলাল
মানস-নির্বাসিতা।

হাতে পাবে যবে দেখিবে, তপন,
ধূলি সে কেবল ধূলি,
দূর থেকে তারে করেছে মধুর
সুদূরের সুধা-তুলি,
চোখেতে যাহারে দেখনি তাহাতে
পরাণ রয়েছে ভুলি।

চিরকাল তুমি রহিবে ছুটিতে,
হে দেব সূর্য পূষা!
চিরকাল ধরি পরিবে জগৎ
পূর্বরাগের ভূষা।
তুমি চির চারু তরুণ তপন,
স্থির-যৌবনা উষা।

বিশ্বকর্মা

গ্রহ-সূর্যের লক্ষ চাকায় ওই কে হাঁকায় রথ!
কালে কালে আর ভুবনে ভুবনে পড়েছে কাহার পথ!
অতীত যাহার সম্মুখে চলে পিছনে ভবিষ্যৎ!
বিশ্বকর্মা-রাজ
জগতে বাহিরে আজ!

কালের হাতুড়ে পিটিছে কে ওই আকাশের ইস্পাত!
লক্ষ তারকা ফুল্‌কি সমান চৌদিকে উৎখাত,
মহাকাল কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে শুনি সে শব্দপাত!
বিশ্বকর্মা-রাজ!

অস্ত্র যাহার শানাবার তরে মেঘের পাথর ওই,
গগন-ধনুতে বিদ্যুৎ-ছিলা কর্ম-কাতর ওই—
ধূমকেতু যার নীল অম্বরে লম্বিত মহা মই!
বিশ্বকর্মা-রাজ!

তপ্ত রক্ত লক্ষ চক্র আকাশে ঘুরিছে যার,
কূট-নিঃশ্বাস জটিল মেঘেতে উঠিছে কারখানার,
পাথর-গলানো লৌহ-টলানো ভীষণ বহ্নি-ধার!
বিশ্বকর্মা-রাজ!

সপ্ত-সাগরে লক্ষ ঢেউয়ের অসংখ্য মজুরেরা
বহ্নি-বিলাসে ছুটিয়া চলেছে লঙ্ঘি তটের বেড়া—
হাতুড়ির ঘায়ে পাথর ভাঙা যে সকল কাজের সেরা!
বিশ্বকর্মা-রাজ!

লক্ষ লোকের বাসনারে লয়ে পোড়ায়ে করিছ খাঁটি,
অশ্রু-সলিলে ভিজায়ে ভিজায়ে মরুরে শ্যামল মাটি,
মনের কোণেতে ছোট নীড়খানি গড়িতেছ পরিপাটি!
বিশ্বকর্মা-রাজ!

পাহাড়-ধসানো হাতে গাঁথা তব ঝুমকো ফুলের মালা,
লক্ষ ভুবন গড়িয়া তোমার মেটেনি বুকের জ্বালা,
তাই নিরজনে সাজাও বসিয়া ফাগুনের ফুলডালা।
বিশ্বকর্মা-রাজ!

একি অদ্ভুত—কঠিন পাথর ভাঙিছ বজ্র-বলে !
মনের সহিত মনটি মিশায়ে দিতেছ কি কৌশলে !
এক হাতে তব প্রলয়-হাতুড়ি অন্য হাতের তলে
শিরিষ ফুলের সাজ।
বিশ্বকর্মা-রাজ !

বৈশ্বানর

কিংশুক-কোমল-শিখা ওগো বৈশ্বানর,
লহ নমস্কার।
একাগ্র অঙ্গুলি তুলি তুমি নিরন্তর
কোথায় ইঙ্গিত কর ভাবে চরাচর ;
যেথায় বহিছ হব্য সেথা, বহ্নি, মোর
বহ নমস্কার—
অনির্বাণ জাতবেদা হে চিরভাস্বর,
লহ নমস্কার।

তোমার বিমল দীপ্তি, ওগো সর্বভুক্,
লাগুক কপালে ;
তব দৃপ্ত তুলি হ'তে বাক্যহারা মূক
সুধাসঞ্জীবন রস গত-দুঃখ-সুখ
মোর সর্ব দেহে মনে ঝরিয়া পড়ুক
সকালে বিকালে—
তব শুভ্র জ্যোতিঃস্নানে মোর চক্ষু মুখ
নিত্যই রসালে।

মর্ত্য হ'তে স্বর্গপানে কর খেয়া পার
বিবিধ বর্গের ;
অশান্ত ধরণীতল চঞ্চল সংসার,
প্রশান্ত অম্বরে তবু রাজ্য তারকার—
এই নিত্য বাণী তুমি করিছ প্রচার,
হে দূত স্বর্গের !
তিমিরবিদারী তীক্ষ্ণ অঙ্গে তব ধার
শাণিত খড়্গের।

আঁধারের যবনিকা কৌতুকী অঙ্গুলে
করি দিয়া ফাঁক
ইন্ধন-আসনাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদীমূলে
ক্লান্তি-ঘন নিশীথের স্বপ্ন-সুখ ভুলে,
হে প্রাতঃ-প্রবুদ্ধ, তব রক্ত আঁখি তুলে
যেই দাও ডাক,
অমনি জাগিয়া উঠি কণ্ঠ দিয়া খুলে
বিশ্ব শতবাক্।

এত তাপ অন্তরেতে পীড়িত যে হিয়া
সবি কি নিষ্ফল ?
বেদনার অগ্নিগিরি মুহূর্তে টুটিয়া
ইন্দ্রধনু সম ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বাসে উঠিয়া
দেবে না কি এই ব্যর্থ শূন্যে রাঙাইয়া
কল্পনার দল ?
মুক্তা ভ্রমে লইবে না কেহ কি তুলিয়া
মোর অশ্রুজল ?

হে পাবক, রাখিলাম এ দেহ আমার
যজ্ঞবেদী করি ;
তোমার অমর্ত্য শিখা পোড়াইয়া তার
অস্থি মাংস শোণিতের ইন্ধনের ভার
রাখুক স্বর্গের পানে শাশ্বত আকার
দীপশিখা ধরি—
সত্য যাহা উর্ধ্বে যাক্, ক্ষুধিত সংসার
নিম্নে থাক্ পড়ি।

অরণ্যানী

আপনার ঘরে হারায়েছ পথ,
ওগো পথহারা
অরণ্যানী !
আপনার সনে কর লুকোচুরি,
এ কেমন ধারা,
অরণ্যানী !
ফোটে শাখে ফুল—দেখোনাকো চেয়ে,
বসন আকুল বাতাসেরে বেয়ে,
লও নাকো নিজে দাও ফুলে কত
বরণ আনি,
অরণ্যানী !

আপনার পানে নাহিকো নজর,
ওগো নিরলসা
অরণ্যানী !

যতনে পালিছ হিংস্র পশুরে
এ কেমন দশা
অরণ্যানী !
লালন করিয়া আপনার হাতে
দিতেছ ভরিয়া সুখে ও শোভাতে,
তারেই আবার হরিতেছ হাসি
মরণ আনি,
অরণ্যানী !

আপনার মনে কি যে কথা কও,
ওগো খেয়ালিনী
অরণ্যানী !
বুঝিতে পারি না তবুও কেমনে
মন লও জিনি,
অরণ্যানী !
বিজনে বসিয়া কত না প্রহর
খেলায় রসিয়া গড়িতেছ ঘর,
হঠাৎ আবার দিতেছ ভাঙিয়া
চরণ হানি,
অরণ্যানী !

তোমার শিশুরা হ'ল কত বড়,
গেল কোল ছাড়ি,
অরণ্যানী !
দুঃখ তাহাতে আছে কি তোমার,
নিত্য-কুমারী
অরণ্যানী !
তুমি আছ তব আঁচল পাতিয়া
ফিরিবে মানব যখন সাধিয়া—

তখনি হাসিয়া তুমি দেবে তারে
শরণ আনি,
অরণ্যানী!

কুণাল

বৃদ্ধ ঘাতক দাঁড়ায়ে সমুখে
কম্পিত-কায় স্তম্ভিত-মুখে,
লুণ্ঠিত অসি ভুঁয়ে,
বলি-চিহ্নিত ললাটে তাহার
ক্ষুব্ধতা ভরে দোলে স্বেদহার
নিঃশ্বাসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

দীর্ঘ জীবন যাপিল যে-জন
মৃত্যু-আদেশ করিয়া সেবন,
আজি সে মৌন কেন?
কোন্ দ্বিধা আজ জাগে তার মনে?—
ওই বুঝি তার পাংশু নয়নে
দুলিছে অশ্রু যেন!

রাজার কুমার কিশোর কুণাল
—বিশ ফাগুনের অর্ঘ্যের থাল—
কহিল ডাকিয়া তারে,
"এস গো নলক, দিন হল শেষ,
পালন করহ তোমার আদেশ,
বলিতেছি বারে বারে।"

পরুষ হস্তে মলিন বসনে
মুছিয়া অশ্রু শুষ্ক নয়নে
বৃদ্ধ কহিল—"হায়—
শেষকালে মোর এই ছিল লিখা,
তোমার তনুর রক্তের শিখা
দহিল আমার কায়!

"রক্ত সন্ধ্যা দিবসের শেষে
মিলায় যেমন আঁধারের দেশে,
আঁখির আড়াল হ'তে
ছেড়ে দাও মোরে কুমার কিশোর,
চলে যাই আমি অরণ্যে ঘোর
ত্যজি রক্তিম পথে।"

"যেয়োনা যেয়োনা, শোন গো নলক,
শোন মোর কথা—মোছ দুই চোখ,
তাকাও আমার পানে।
শৈশব হ'তে দেখিয়াছ মোরে,
পালন করেছ বুকে কাঁধে ক্রোড়ে
কত না গল্পে গানে!

"তোমার হাতের এ দণ্ডটুক
সহিতে আমার কাঁপিবে না বুক
যত না কঠিন হোক—
শৈশবস্মৃতি বিজড়িত করে
ভয় কি বন্ধু সাহসের ভরে
ফেলো তুলে মোর চোখ!

"মৃত্তিকা-মদ ঢালিয়া তূর্ণ
আমার জীবন হ'য়েছে পূর্ণ
বর্ষে বর্ষে ভাই—
বিশ ফাগুনের বিশখানি মালা,
আজো জাগে তারা চিরসুধা ঢালা
কোথাও ম্লানিমা নাই।

"কত লোক যারা আছে চোখ মেলি
ধরণীর শোভা যায় পায়ে ঠেলি
দেখে নাকো চোখ চেয়ে—
আঁখি মেলি আমি এই বসুধার
লভিয়াছি স্বাদ সকল সুধার
উঠিয়াছি গান গেয়ে।

"চোখ যদি যায় এমন কি ক্ষতি!
মানস-প্রদীপে করিব আরতি
মানসী দেবীরে মোর—
আঁখি যদি যায় যাবে মোর আলো,
উজল ভুবন লাগিবে ঘোলালো—
যাবে নাকো আঁখি-লোর।

"বনের বিজনে ফুটিবে করবী,
ফাগুন প্রান্তের হৃদয়ের ছবি
শিশিরেতে সমাকুল—
শিরীষ শাখায় ফুলের জোয়ার
ভরিয়া ভরিয়া উঠিবে আবার
ডুবায়ে শাখার কূল।

"আর না এ সব হেরিব রে চোখে,
কত ছবি হায় দ্যুলোকে ভূলোকে,
কত বরণের ধারা—
বিদায় লভিলে নয়নের আলো,
ভেদিয়া সন্ধ্যা-আঁধারের কালো
জাগিবে না কি গো তারা" !

ভুট্টাক্ষেতে

মাগো আমার মন মানে না,
মন না মানে আজ,
আমায় তুমি মিথ্যা বকো,
মিথ্যা দেওয়া লাজ !
শুধু কি তায় জল দিয়েছি,
দিয়েছি তায় মন !
বুকের মাঝে কেমন করে
আজকে সারা ক্ষণ।
সেদিন কাঁচা ভুট্টাক্ষেতে
সবুজ টিয়াপাখী—
সাঁঝের আগে সাথীর খোঁজে
উঠতেছিল ডাকি।
পথিক এসে দাঁড়ালো মোর
ঝর্ণা-তলাটিতে,
হিয়া আমার করলো চুরি
তৃষার বারি দিতে।
ওগো পথিক, দূর বিদেশী,
কোন্ পথে যে গেলে—
আমার ভরা কলস খানি
হঠাৎ ভেঙে ফেলে !

শিরীষ শাখে শুক্‌নো পাতা
বাজছে রিণি রিণি,
তোমায় বুঝি পড়ছে মনে
বলছে চিনি চিনি।
সেদিন কাঁচা ভুট্টাক্ষেতে
অনেক ছিল আশা—
সবুজ শীষে লুকিয়ে ছিল
কত সুখের বাসা!
আজকে পাকা ভুট্টাক্ষেতে
কেউ না আসে হায়!
আধেক কাটা ফসল রাশি
লুটিয়ে ভুঁয়ে যায়।
মলিন কেশে দাঁড়িয়ে আছি,
আঁধার নামে ওই,
একটু থামো জননী মোর,
একটু হেথা রই।
ফিরবে না সে পথিক জানি,
ফিরবে না সে দিন,
একটি বারই বাজেরে হায়
দুখীর হৃদি-বীণ।
ফসল আঁটি মাথায় বহি
ফিরবো আমি ঘর,
এমনি করে জীবন যাবে
কতই না বছর।
আবার ক্ষেতে ফসল হবে,
পাকবে পুনরায়,
আবার তারে মাথায় নিয়ে
ফিরবো ঘরে হায়।

বুকের বোঝা হাল্কা আমার
হবে না কখ্‌খনো,
আজকে থামো একটু মা-গো
আমার কথা শোনো।

মেরুর ডাক

আবার মোরে ডাক দিয়েছে তুষার মেরু উত্তরে,
সে রব শুনে বিপদ গুণে কেমন ক'রে রই ঘরে!
ছাদের বাধা আলগা হ'ল ডাকছে তাঁবু ইঙ্গিতে
মেরুর পানে মরার টানে—রইব পড়ে কোন্ ডরে!

হিমের বায়ে মরণ-শাদা দিচ্ছি আমার পাল তুলে,
জাহাজগুলো ডাকছে আমায় রিক্তশাখার মাস্তুলে,
জলের ঝাপট লাগছে আমার নিদাঘ-দাগা পঞ্জরে,
তাইতো কাঁদে পরাণ আমার, ঘাটের বাঁধন দেয় খুলে।

তীক্ষ্ণ হ্রেষায় মৃত্যু-নেশায় পবন হাঁকে ভীমরবে,
উড়ছে কানাৎ টুটছে তাঁবু ঝঞ্ঝা বিপুল বয় যবে—
ফুরিয়ে এলো খাবার পুঁজি ছিন্ন আমার বস্ত্র গো,
মৃত্যু বুঝি মুচকে হাসে—না হয় মরণ তাই হবে।

তাই বলে কি রইব পড়ে বিষুব রেখার অন্তরে,
রুদ্র নিদাঘ জ্বালায় যেথা তপের আগুন মন্তরে?
ব্যর্থ হবে মেরুর সে গান ব্যর্থ হবে জয় গাথা,
মৃত্যু যেথা হাজার রূপে জমাট জলে সন্তরে!

সবুজ আভা বরফ রাশি রয় গো সেথা দিক্ জুড়ে,
সিন্ধুঘোটক বিশাল দাঁতে তুষার মাটি খায় খুঁড়ে,
পেঙ্গুইনের পঙ্গু দলে বিজ্ঞ ভাবে রয় চেয়ে,
ঝাপ্‌টে ফেলে ডানার বরফ ক্বচিৎ পাখী যায় উড়ে!

দিগন্তেরি ধারটুকুতে নিতেজ রবি যায় দেখা,
হাজার তারার দ্বিগুণ আলো তুষার মেঝেয় হয় লেখা,
স্থিরচপলা মেরুপ্রভা জ্বালায় রঙের ফুলঝুরী—
কার যেন এ শবসাধনা চলছে দিবা রাত একা!

আবার ডাকে শোন্ গো তোরা, শোন্ গো তোরা কান পেতে,
আমায় ঘিরে রাখিস্ মিছে মেরুর মুখে দিস্ যেতে!
তরীর কাছি তীরের কাছে চাচ্ছে এবার মুক্তি গো,
প্রলয় শ্বাসে পাল ফোলেরে উঠছে তরীর হাল মেতে!

এবার আমায় ডাক দিয়েছে তুষার মেরু উত্তরে
চক্ষে যে দেশ হয়নি দেখা কাঁদছে পরাণ তার তরে—
শ্যামল ধরার কোমল বাহু লাগছে না আর মোর ভালো,
মেরুর পানে ভাসবো এবার মরণ-শাদা পালভরে।

অশ্বারোহীর গান

আজমীর হ'তে মাড়োয়ার যেতে এই কি রাস্তা এই?
প্রাচীন পথের আজিকে হায়রে কোনই চিহ্ন নেই,—
গিরিবন্ধুর তট-দুর্গমে বারে বারে ভুলি খেই!
সন্ধ্যা নামিছে ওই,
স্বাধীন জাতের আর কি সাহস অস্ত্র আপন বই!

শুষ্ক উষর গেরুয়া-ধূসর তৃণ-তরু-জন-হীন,
দুর্গ-কিরীট গিরি উঁকি দেয়, গণি এক দুই তিন—
আছে যাহাদের কঙ্কাল শুধু গেছে গৌরব দিন।
সন্ধ্যা নামিছে ওই,
স্বাধীন জাতের আর কি সাহস অস্ত্র আপন বই।

বিরাট প্রাণের নিরাশার মত বালু প্রান্তরময়,
মূর্চ্ছাবিকল তন্বী নদীটি নদী সে তো আর নয়—
তীরে তীরে ওঠে শর বনে ধ্বনি—জয় পিপাসার জয় !
সন্ধ্যা নামিছে ওই,
স্বাধীন জাতের আর কি সাহস অস্ত্র আপন বই !

শত যুদ্ধের সঙ্গী আমার ঘোড়াটি ছুটেছে জোর,
পথের পাথর পড়ে ছিটকিয়ে দ্রুত পায়ে লাগি ওর !
মাড়োয়ারে মোরে পৌঁছিতে হবে রাত্রি না হ'তে ভোর।
সন্ধ্যা নামিছে ওই,
স্বাধীন জাতের আর কি সাহস অস্ত্র আপন বই !

দুর্গ-প্রাকারে হাঁকিছে কাহারা—বেশ বেশ ভাই বেশ !
সুখের বুকেতে মানুষ হওয়াতে নাহিকো কীর্তি লেশ—
ফিরে যদি তুমি নাও আস তবু স্মরিবে তোমার দেশ
সন্ধ্যা নামিছে ওই,
স্বাধীন জাতের আর কি সাহস অস্ত্র আপন বই !

দূর পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন অন্ধকার,
ভয় নাই তবু জ্বালিছে প্রদীপ গ্রহ চন্দ্রের সার,
আপনার পায়ে দাঁড়াতে যে পারে সবাই সহায় তার।
সন্ধ্যা নামিছে ওই,
স্বাধীন জাতের আর কি সাহস অস্ত্র আপন বই !

বিদ্যাসুন্দর

“ফিরে এস, ফিরে এস, ক্ষান্ত দাও রাত্রি আজিকার,
আজিকে জাগ্রত পুরী, পুণ্যভুক্ যাত্রিদল সবে
করিতেছে প্রদক্ষিণ দেউল যে রাজ-দেবতার ;
ব্রতমৌন নিশীথের তন্দ্রা ভাঙি মেতেছে উৎসবে
প্রাগ্ জ্যোতিষের লোক ; কিন্নরীলাঞ্ছন কণ্ঠরবে
ভেদ করে মর্মস্থল রঙ্গশালিকার ; জালায়ন-
পথে কম্পমান আলো ; হর্ম্যতলে নর্তকীরা যবে
সমে আসি উন্মাদিনী—ঝলমলে কর্ণের ভূষণ,
এক সাথে ক্রন্দি ওঠে নূপুর হইতে সিঁথি কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥ ১

“বিদ্যার পাবে না দেখা, ঘিরিয়াছে জাগ্রত প্রহরী
রাজকুমারীর গৃহ ; হয় তো বা সখীদলবলে
চলিবে অক্ষের ক্রীড়া কক্ষে তার সারা রাত্রি ধরি
নিশি-জাগরণ-ব্রতে ; আজি সেথা যাবে কোন্ ছলে,
হে বিদেশী ?” এত বলি আগুসরি ছায়া-কুঞ্জতলে
থামিল মালিনী মাসী ; ততক্ষণে কিশোর সুন্দর
ছাড়ায়ে সীমানাখানি মালঞ্চের গেছে দূরে চলে
কোন্ ঘন অন্ধকারে ; নিষ্কম্প বাতাসে করি ভর
আসিতে লাগিল গন্ধ চম্পকের, বসন্তের প্রিয়-সহচর॥ ২

মালিনী থামিল ধীরে, কিছুক্ষণ রহিল থমকি ;
সূচীভেদ্য তমিস্রায় প্রাণপণে ক্ষীণ দৃষ্টি তার
খুঁজিতে লাগিল কারে ; অবশেষে উঠিল চমকি
আপনার দীর্ঘশ্বাসে ; অকস্মাৎ বুঝি একবার

নাচিল দক্ষিণ আঁখি ! ফিরি আসি পুষ্পবাটিকার
বসিল একটি পাশে—করতলে চিন্তানত মুখ।
বিদেশী রাজার পুত্র, রূপে মুগ্ধ কুমারী বিদ্যার,
অতিথি তাহার গৃহে ; চলে নিত্য প্রণয়ের সুখ
গোপনে সুড়ঙ্গ-পথে, কি ঘটিবে রাজা যদি জানে এতটুক ॥ ৩

ততক্ষণে রাজপুত্র ছাড়াইয়া কুটীরের সীমা
উত্তরিল গোহালের কাছে ; সুপ্তিমগ্ন ধেনুদল ;
কেবল ধবলী জাগি, যেন সে যে স্নেহের প্রতিমা ;
সুধীরে সে বাড়াইল আপনার তপ্ত সুকোমল
লোল গ্রীবা-ভঙ্গিখানি ডিঙাইয়া বেড়া ; জ্বল জ্বল
দুটি নেত্র স্নেহ-কৌতূহল-রসে ; না লভিয়া তার
নির্দিষ্ট পল্লব-মুষ্টি, টানি নিল উষ্ণীষে চঞ্চল
সন্ধ্যা-মালতীর গুচ্ছ ; অন্যমনে শুধু একবার
বুলাইল করপদ্ম তপ্ত গলদেশে তার সুন্দর কুমার ॥ ৪

ছাড়ায়ে গোহাল-সীমা অবশেষে পঁহুছিল এসে
মধুপস্বপনমুগ্ধ মালঞ্চের নির্জন সভায় ;
সফেন মালতী পুষ্প সমর্পিল তার শিরদেশে
রাশি রাশি শুভ্র দল ; ভৃঙ্গহারা চম্পা আজি হায়,
স্তাবকবিহীন ক্ষুব্ধ একাকিনী বিরহিণী প্রায়
নীরব গৌরবে, মরি, রহি রহি তীব্র সৌরভের
হানিতেছে কটাক্ষ নিপুণ—মধুমন্থর কষায়,
প্রথম যেন সে প্রেম। বিস্তারিয়া শুভ্র লাবণ্যের
স্নিগ্ধ আমন্ত্রণখানি নিশিগন্ধা প্রতীক্ষায় কোন্ পথিকের ॥ ৫

আজি না পাইল চম্পা প্রেমিকের সাদর চুম্বন,
আদরে চয়নভাগ্য সঙ্গোপনে প্রেমিকার নিশি-
মাল্য লাগি ; মুখর দাড়িম্বগুচ্ছ উচ্ছলিয়া রস

মদিরচ্ছটায় ; বার্ষিক বিদায়লগ্নে কুন্দ দিশি
দিশি কাঁদাইছে কটাক্ষে করুণ ; মাধবিকা মিশি
পল্লবে বিলীন। অন্যমনে অতিক্রমি কাননের
সীমা চলিল সুন্দর ; অকস্মাৎ মনে কিবা বাসি
ফিরিয়া ছিঁড়িল ধীরে নেশারক্ত করবী পুষ্পের
একটি জ্বলন্ত গুচ্ছ ; চমকিল নৈশপাখী স্তব্ধ কুলায়ের ॥ ৬

পার হ'য়ে পল্লীসীমা, পার হ'য়ে মহুয়ার বন,
পৌঁছিল সুন্দর আসি উপলিত তীরে ধানশ্রীর ;
ভাঙালো চমক তার শীততীব্র সিক্ত সমীরণ ;
ছুটেছে ধানশ্রী ক্ষিপ্র, স্বচ্ছ লঘু ডুরে শাড়িটির
ভঙ্গে ভঙ্গে প্রকাশিয়া আপনার চঞ্চল অধীর
অপ্সরী-ঈপ্সিত ক্ষীণ ললিত সে সদ্য তনুখানি,
অতিদূর ব্রহ্মপুত্র লাগি। নেহারিয়া নদী-নীর
নিশ্বসিল দীর্ঘশ্বাস ; ভাবিল সে—কত রাত জানি !
সেও কি জাগিয়া আহা ! এতক্ষণে নিভিয়াছে ধূপ দীপদানি ॥
৭

মিনার কমল-আঁকা অতি লঘু চন্দনের দ্বার
উদ্‌ঘাটি পশিল বিদ্যা কক্ষে আপনার ; ন্যস্ত ডান
করতলে মর্মর থালিকা ভরা কুল-দেবতার
প্রসাদের অবশেষ ভাগ ; নামাইল থালাখান
আধেক আনত হ'য়ে জানু পাতি মাণিক্য-বসান
স্ফটিকের ভিত্তিতলে ; রুদ্ধ করি দ্বারখানি ধীরে
দাঁড়াইল সুঠাম ভঙ্গিতে ; দুটি দুলে দুটি কান
দুলালো ঈষৎ শুধু ; কারে হেরি চমকিয়া ফিরে
দেখিল নিজেরি ছায়া পড়িয়াছে কাকচক্ষু দর্পণের নীরে ॥ ৮

একটি সরসী মাঝে একটি কমল ; ফুটিল যে
পদ্মগুলি ভোরবেলা মানসের কিনারে কিনারে,
লুটে পুটে তুলে নিল অপ্সরীরা স্নানরসে ম'জে ;
সপ্তর্ষি নামিয়া ধীরে উষামৌন মানসের ধারে
সযত্নে তুলিল আর ; সকলের নাগালের পারে
একটি অস্ফুট পুষ্প যেন আছে বাকি ! তাকাইয়া
দর্পণের পানে কাঁপিল অধর—মধুকর ভারে
ফুল্ল গোলাপের দল ; মৃদু হাসি গেল চমকিয়া ;
"সে যদি আসিত আজি প্রিয়তম কি ভাবিত আমারে হেরিয়া ॥" ৯

স্বচ্ছ মুকুতার মাঝে লাবণ্যের মত ঢল ঢল
ছায়া দর্পণেতে ; ক্ষীণচন্দ্রোপম ভালে খয়েরের
টিপ ; ভুরু কালো, তারা কালো, মরি কালো সে কাজল—
চোখের চাহনিখানি, যেন কোন্ দূর বনান্তের
তমালের আভাময়ী ! দ্যুতিখানি দুটি কপোলের
মুহূর্তে প্রকাশ করে হৃদয়ের গোপন বাসনা,
প্রেমিকের পরিতৃপ্তি ; কণ্ঠে কান্তি সদ্য মৃণালের ;
ধানী কাঁচুলির তলে আভাসে যায় রে গণা
বন্ধুর বক্ষের তাল ; ইন্দ্রগোপ-রক্তরুচি বসন বিমনা ১০

ভাঁজে ভাঁজে নামিয়াছে থরে থরে লুকাইয়া, মরি,
দুর্লভ রহস্যরাজি পদোপান্তে, যেথা লাক্ষা-রাগ
পথপ্রান্তে আরক্ত মিনতি ; অঞ্চল ঝুলিয়া পড়ি
মুছে দেয় পদ্মলঘু চরণের চিরবাঞ্ছা দাগ ;
কটিতে কনককাঞ্চী স্বর্ণউষা কণ্ঠ কলবাক্ ;
লাবণ্যমসৃণ দুটি বল্লরিত ব্যগ্র বাহুলতা
অঙ্গুলির সঞ্চালনে যেন আহা খেলিতেছে ফাগ
অদৃশ্য দয়িত সনে ; মুক্ত কুন্তলের অজস্রতা
নির্ঝরিছে নীড়গামী বলাকার পক্ষচ্যুত অন্ধকার যথা ॥ ১১

নগরীর সিংহদ্বারে বাজে মধ্যরাত ; সান্ত্রিগণ
হেঁকে যায় ; অমনি পড়িল মনে কার লাগি হায়
আজি মিছা জাগরণ ! সহসা লাগিল শিহরণ
সারা অঙ্গে। যদি আসে নিত্যমত অবোধের প্রায় !
সশস্ত্র সমস্ত পুরী ! যুক্তকরে কুল-দেবতায়
করিল প্রণাম। খুলিল কাঁচুলিখানি, প্রকাশিল
তপ্ত তনু ; দর্পণে ঘুরায়ে পিঠ, চক্ষু রাখি তায়
উতারিল স্তনচ্ছদ বস্ত্র মণিপুরী ; উদ্ভাসিল
স্বর্ণপয়োধর ছুটি, স্তনাগ্র পাটল তীক্ষ্ণ কমল-উন্মীল ॥ ১২

শিথিলিল নীবীবন্ধ, রমণীয় নাভি সুগভীর ;
ত্রিবলী সোপান বেয়ে ধাপে ধাপে পথ গেছে চলি,
অজ্ঞাত-রহস্য এই তাপদগ্ধ ক্ষুধার্ত পৃথ্বীর
কামনার পূর্ণ রসাতলে ; সুরভি তৈলেতে জ্বলি
বিচ্ছুরিতেছিল আলো স্ফটিকের দীপে প্রতিফলি
লক্ষ বর্তি তেজে, নিভাইল তারে ; বিরাজে অদূরে
রজতের শয্যাধার ; সুশোভিত ছুটি শঙ্খ-কলি
শিথানের সুবর্ণ ফলকে ; পদপ্রান্তে আছে জুড়ে
মৃগয়ার মর্মরকল্পনা ; চার হস্তী বহে পালঙ্কটি শুঁড়ে ॥ ১৩

বসনবিমুক্ত দেহ ; গ্রহণের ছায়া যেন ধীরে
সঙ্কোচে খসিয়া গিয়া প্রকাশিল পূর্ণ শশীখানি।
পরাগপাটল স্তন মৃণালের ক্ষীণ সূত্রটিরে
না দেয় প্রবেশপথ ; কি কৌশলে কে রাখিল আনি
আগ্নেয় গিরির শিরে হিমাদ্রির হিমমৌন বাণী !
রভসরাত্রির কত পত্রলেখা জ্বলন্ত চুমার
সে কোন্ অধরশিল্পী দিল মরি সন্তর্পণে টানি !
যৌবনসাগর মন্থে সুবিপুল যুগল মন্দার ;
বাসনাবুদ্বুদ ছুটি খরস্রোতে আন্দোলিত অলকানন্দার ॥ ১৪

বসনবিমুক্ত দেহ ; সারা অঙ্গে আলোক পিছলে ;
স্তম্ভিত মানসহ্রদে অপ্সরীরা কান্তি বিবসন
বিথারি দিয়াছে যেন ; মেঘোদয় মেচুর কুন্তলে ;
মর্মর-মসৃণ স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ নিটোল জঘন
অনন্ত পূর্ণিমারসে উন্মদির পরশ-চিক্কণ
নয়নের চির ইন্দ্রজাল ; বাঁকাইয়া গ্রীবাখানি
হেরিয়া আপন রূপ, অঙ্গে অঙ্গে মুখর যৌবন,
ফুটিল গোলাপ গালে ; আজিকে সে আসিবে না জানি
বল্লভচুম্বন স্মরি পয়োধরে দিল তপ্ত অধরাঙ্ক হানি ॥ ১৫

পালঙ্কে বসিল বিদ্যা, অতীতের মর্মতল ভেদি
এক রাত্রে এলো মনে সহস্র রাত্রির স্মৃতি-কথা !
এই যে শয়ন শুভ্র, এ যে আহা প্রণয়ের বেদী
গুপ্ত যুগলের ; ব্যগ্র ওষ্ঠে পরশিল যথা তথা
সুন্দরের স্পর্শ খুঁজি, বিস্তারিয়া আতপ্ত মত্ততা
বসন্তরভসময় রতিমুগ্ধ নর্ম শয্যাখানি
বারম্বার কঠিন নিষ্পেষে, উলটিল বাণাহতা
মৃগী সম ; রাঙিল কপোল গ্রীবা, তপ্ত রক্ত হানি
কাঁপিল কপালে শিরা ; করতল বদ্ধমুষ্টি, মুখে নাহি বাণী ॥ ১৬

ভাবিতেছিল সে মনে সেই এক অতি প্রিয় মুখ,
আঁকিতেছিল সে মনে তারি আহা প্রত্যেকটি রেখা,
স্মরিতেছিল সে মনে কথাগুলি দিয়াছে যা সুখ।
সেই কবে সে দিবস প্রথম যেদিন হ'ল দেখা
মালিনীর কৌশলেতে ; তারপরে প্রতি রাত্রে একা
এই গৃহে সম্মিলন ; মুহূর্তে হয় রে পুরাতন
সদ্যজাত প্রেমখানি, ভালে তার অমরতা লেখা।
অবশেষে এল নিদ্রা, বিরহীর একান্ত শরণ !
প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে নেশারক্ত নিশীথিনী বিহ্বল তখন ॥ ১৭

খুলিয়া সুড়ঙ্গ পথ প্রবেশিল একাগ্র সুন্দর।
সহসা মেলিয়া চক্ষু না পাইল হেরিতে বিস্তারে;
বুঝিল ঝাড়ের আলো অকস্মাৎ দীপ্ত খরতর
নেত্র তার ধাঁধিয়াছে, মির্মিরিয়া আঁখি বারে বারে
দেখিল যা দেখিবার, দাঁড়াইল পালঙ্কের ধারে;
দেখিল দুলিছে বক্ষ একচ্ছন্দে গণি মৃদু তাল,
নভে দীপ্ত শশী যবে, আর স্বপ্নালস পারাবারে
অনাবৃত উদ্বেলতা; দেখিল দেখিল ক্ষণকাল
অনন্য চাহনি ভরে; সুরভি নিশ্বাসে কক্ষ সুগন্ধি রসাল॥ ১৮

ত্যজি পালঙ্কের সীমা তাকাইল গৃহের চৌদিকে—
অতি পরিচিত সব। পুরুষেরা আপন সংহত,
রমণী অস্তিত্ব নিজ চতুর্দিকে যায় লিখে লিখে
বসন্তের ব্যস্ততায়, দীপাধারে, ধূপাধারে, কত
তুচ্ছ সামগ্রীর বুকে; জীবনেরে জড়ায়ে নিয়ত
অবিরত গড়িতেছে মধুচক্রী নর-মনোরমা
চিরদিন ধরি তারা; তিল তিল খুঁটি ইতস্তত
গড়িছে পুরুষ তাহে বাসনার নারী তিলোত্তমা
হৃদয়ের পাদপীঠে, স্বপ্নসার-বিনির্মিত লাঞ্ছিত-উপমা॥ ১৯

সমুদ্র-মন্থন-দৃশ্য-আঁকা ছাদ হ'তে ঝুলিতেছে
স্বর্ণদণ্ডে স্ফটিকের ঝাড়; বহু শিখা জ্বল জ্বল
ঝলমল কাচের দোলকগুলি মৃদু দুলিতেছে,
চিত্রবর্ণ চূর্ণ ইন্দ্রচাপ; গৃহভিত্তি দীপ্তোজ্জ্বল;
সুবর্ণের ধূপদানি হ'তে উঠিতেছে অনর্গল
ক্ষীণ বাষ্প, তন্বী লঘু লীলাময়ী অপ্সরীর মত;
দর্পণে কাঁপিছে ছায়া তার; হোথা প্রভাতী কমল
কত অঙ্কিত দক্ষিণে, ডাকিতেছে সেথা হংস শত
ডানার শিশির ঝাড়ি; উচ্চ-নাল ফুলগুলি ঈষৎ আনত॥ ২০

বামে কথা শকুন্তলা-দুষ্মন্তের ; তরুতলে মুগ্ধ
রাজা ; আগে চলে সখীদ্বয় ; পশ্চাতে কিশোরী ফিরি
কণ্টক-আহতা, দুই চক্ষু ব্যস্ত দুই দিকে, দুগ্ধ-
শুভ্র কর্ণোৎপল ম্লান। ছাদ-নিম্নে চারি ভিত্তি ঘিরি
মেঘদূত লীলাচ্ছবি ; তরুশ্যাম দূরে রামগিরি
জনক-তনয়া-স্নানে পবিত্র-উদক ; কুণ্ডলিয়া
ওঠে মেঘ উপত্যকা হ'তে ; ধায় শিপ্রা ঝিরি-ঝিরি,
জল-কেলি-ক্লান্ত যত কর্ণের ভূষণ ভাসাইয়া ;
মহাকাল মন্দিরের চূড়া জ্বলে সূচীভেদ্য তমিস্রা ভেদিয়া॥ ২১

চলিছে মন্থর মেঘ জল-বিন্দু-ভারে, ইন্দ্রকান্ত
মণি নীল আভা ; পাশে পাশে চলে দল চাতকের ;
নন্দনস্যন্দনচারী কিন্নরেরা দেখে নিম্নে শান্ত
রেখামাত্র চর্মবতী, স্বচ্ছ ক্ষীণ মাণিক্যহারের
মত—দোলে মেঘ-মধ্য-মণি ! দিগন্তরে দশার্ণের
শ্যাম জম্বুবনপ্রান্ত ; শরমুখ ব্যূহ রচি ধায়
দলে দলে গগনে বলাকামালা স্তব্ধ মানসের
দিকে বিসকিশলয়বান্ ; সুদূর কৈলাস ভায়
অস্পষ্ট সত্যের মত,—ফেনরঙ্গে গঙ্গা যেথা গৌরীরে শাসায়॥ ২২

কোণে কোণে ঘুরিল সুন্দর ; হস্তিদন্ত বিরচিত
শুভ্র বস্ত্রাধারে হেরিল কাঁচুলিখানি, তুলি নিল
অতি যত্নে, তখনো লাগিয়া তাহে অতি পরিচিত
গন্ধ, ছানিল অঙ্গুলে তারে, কিছুক্ষণ রেখে দিল
মস্তকে কপোলে মুখে ; স্তনবন্ধ বস্ত্র পড়ি ছিল ;
যুগ্মস্বর্গচ্যুত সেই বাসনার বসনের পরে
সদ্যস্ফুট বন্ধুরতা বক্ষকুসুমের ; বিকশিল
সম্পূর্ণ চুম্বন এক মর্ম ভেদি ক্ষিপ্ত ওষ্ঠাধরে
মানসের গর্ভ হ'তে সনাল কমল যথা ফোটে স্তরে স্তরে॥ ২৩

অর্ধমুক্ত মঞ্জুষায় ছিল শাড়ি কান্তি মরকত ;
নিল তাহা সন্তর্পণে ; পাড় আঁকা পাকা ফসলের
বর্ণে ; খুলিতে একটি ভাঁজ গন্ধ কুঙ্কুমের ; যত
ভাঁজ খোলে তত বিচিত্র সৌরভ, শ্বেত-চন্দনের,
কস্তুরীর, অগুরুর, দারুচিনি, রক্ত গোলাপের
নির্যাস প্রখর, উশীর, কর্পূর মৃদু, দ্রাবক সে
মৃগনাভিকার ;   অলক্ষ্য গন্ধের মেঘ সে কক্ষের
জমিল বাতাসে—শরতে পশ্চিমে যথা রশ্মিরসে
স্তরে স্তরে জ্বলে মেঘলক্ষ লাক্ষা-দ্রাবী দীপ্ত গলন্ত প্রদোষে ॥ ২৪

মেঝেতে মর্মর থালে দেবতাপ্রসাদ ; নানা জাতি
ফলমূল ; ব্রহ্মপুত্র বালুচরে জাত দ্বিখণ্ডিত
তরমুজ, মধ্যভাগ রক্ত কালো, উঠিয়াছে মাতি
গৃহবাষ্প সুস্নিগ্ধ নির্গত রসে ; দক্ষিণে সজ্জিত
দ্বিধাভক্ত কমলাটি—আসামের হৃদয়-নিঃসৃত
সুরমার উপত্যকাচারী ; ডালিমটি রসভারে
বিদীর্ণ আপনি ; না সহে পরশ কোন ভূলুণ্ঠিত
দ্রাক্ষাগুচ্ছ অধর ব্যতীত ; পানপাত্রে একধারে
বেদানার সুধাদ্রব মাতালের মত টলে বুদ্বুদের ভারে ॥ ২৫

বসিল সুন্দর শেষে শ্বাস রুধি পালঙ্কের ধারে ;
পাশে বিদ্যা একখানি মূর্তিমতী রাগিণীর মত।
চন্দনের পত্রলেখা ক্ষীণচন্দ্র ললাটের পারে ;
বিস্রস্ত অলক হ'তে ঝলমল মুক্তাগুলি শ্লথ,
তারি সাথে ঝিকিমিকি স্বেদলব-জাল ; অসংযত
দুটি দুলে দুটি রক্ত ছায়া ; কভু ওঠে চমকিয়া
ওষ্ঠপুটে হাসিখানি বিতরিয়া চির সুধাব্রত ;
ডান কর শয্যালগ্ন ; বামহস্ত নীবী সামালিয়া ;
দেহবীণা তারে সুর অহল্যা সমান যেন আছে পাষাণিয়া ॥ ২৬

উদ্বেলিত পয়োধর অনাবৃত ইন্দ্রজাল হানি
নেত্রে দেয় সুধারস অঞ্জন মাখায়ে ; মুক্তা-ডোর
বেষ্টি দোঁহে ঝুলিছে ডাহিনে ; এবে স্তব্ধ-কানাকানি
মণিহার হৃদয়ের উপত্যকা মাঝে ; কৃষ্ণ ঘোর
তিল এক বাম স্তন পার্শ্বদেশে, অযোগ্য যে চোর
সে যেন পশিল স্বর্গে ! ধীরে ধীরে নোয়াইল শির
সুন্দর বিত্থার মুখে—যেমন নোয়ায়ে চন্দ্র ভোর
বেলা আপনার ক্লান্ত মুখখানি গণে জলধির
বুকের স্পন্দন মৃদু, হেরে বক্ষে ছায়াখানি নিজ বিম্বটির ॥ ২৭

কাঁপিল বিত্থার ওষ্ঠ—তাকায়ে সুন্দর ; অতি ক্ষীণ
ধ্বনিটুকু—'সুন্দর, সুন্দর !' স্বপ্নে বুঝি হেরে তারে !
ভাবিতে বীরের লাল হ'ল কর্ণমূল, রিণঝিণ
রক্তধারা—হৃৎপিণ্ড দ্রুততর ; ধ্বনি এইবারে
স্পষ্টতর—'ফিরে এস, ফিরে এস, সুন্দর, আমারে
যেয়ো না ফেলিয়া একা।' 'কোথা যাব, কোথা যাব, কোথা
শান্তি তোমারে ত্যজিয়া—চেয়ে দেখ, এসেছি বিত্থা রে,
তোরি তরে উপেক্ষিয়া স্নেহময়ী মালিনীর কথা,
অমাবস্যা রাত্রি ভেদি, অবজ্ঞিয়া তীক্ষ্ণ-অসি জাগ্রত জনতা ॥' ২৮

'একি স্বপ্ন একি সত্য—এত সুখ জাগরণে কভু
হবে কি সম্ভব !' চমকিলা বালা। 'স্বপ্ন যদি হয়,
হোক তাই—থাক তাহা কিছুক্ষণ আরো—ওগো প্রভু,
ইষ্টদেব !' হাসিয়া সুন্দর কহে—'নাহি পাবো লয়
কিছুক্ষণ শেষে সখি—হের আমি তোমারি অক্ষয়
সুন্দর বরেন্দ্রপুত্র।' চকিতে উঠিতে তার বক্ষ
অনাবৃত লাগিল বৈদেশি বুকে ; সলজ্জ বিস্ময়
ভরে দিল তুলি বস্ত্রাঞ্চল ; সামালিল চ্যুত-কক্ষ
নীবীবন্ধ গ্রন্থিখানি। বাহিরে তখন সবে নেশায় অশক্য ॥ ২৯

দুঃসহ রভসবেগে সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন
কণ্টকিয়া উঠিতেই টুটি লুটি পড়ে—অকস্মাৎ
দর্শনের অকুণ্ঠিত সুখ তেমনি বিদ্যার মন
দিলে ভয়ে ভরি। 'এলে তুমি প্রিয়তম, আজি রাত
ভয়ঙ্কর! আসন্ন ঝড়ের মেঘে না করি দৃক্‌পাত,
দুরন্ত নাবিক তুমি! নামিত এ ঝড় যদি!' 'সেই
জানে কি আনন্দ তীরবন্ধ করিয়া পশ্চাৎ
একে একে পালগুলি ব্যগ্রভাবে খুলি মুহূর্তেই
মাস্তুলের চূড়াগ্র অবধি, ভাসাতে তরণী! ডুবি যদি এই ৩০

অলঙ্ঘ্য সাগরতলে, মণিমুক্তা দুর্লভ প্রবাল
রচি দিবে অন্তিম-বাসর। আর যদি উত্তীরিয়া
পঁহুছাই কাম্য দ্বীপে মোর, তবে সুপ্রসন্ন ভাল,
ভাগ্যে আছে এই।'—এত বলি দুই বাহু প্রসারিয়া
ধরিল বিদ্যারে। 'থামো, থামো, আজ নয়, মন দিয়া
শোনো!'—'বৃথা উত্তরিনু সিন্ধু, বৃথাই কি সন্ন্যাসীর
বেশে গোঁয়ালেম বর্ষ মাস হায়!'—উঠিল শ্বসিয়া
সুন্দরের মর্মান্ত অবধি! নহে কভু চিত্ত-স্থির
প্রেমিক, পাগল, শিশু—কাঁটা যেন অতি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডটির ॥৩১

দেখা দিল দুটি অশ্রু দুটি চক্ষু কোণে, তবু তাহা
রাখিল চাপিয়া বিদ্যা রুদ্ধ অভিমানে, যথা
সতর্ক কমলদল সন্তর্পণে ধরি রাখে, আহা,
একটি শিশিরবিন্দু প্রাতঃসূর্য পানে। আছে কথা
ওরি মাঝে দীর্ঘ রজনীর। ঘুচাইয়া নিস্তব্ধতা
কহিতে লাগিল বিদ্যা—'পুরুষের ভালবাসাখানি
উদ্দাম উদ্বেল মত্ত অকস্মাৎ-বর্ষণে আগতা
তটপ্লাবী বন্যাসম—ভাসাইয়া পশুপক্ষী প্রাণী
নিয়ত লেলিহমান, যেন এই চিরন্তন, শেষ নাহি জানি॥ ৩২

'সকালের বন্যা, হায়, বৈকালে কোথায় চিহ্ন তার !
ধ্বস্তগ্রাম, ভগ্নতরু, মগ্নজীব, ভেসে-আসা খড়—
নির্দেশিছে পথখানি সর্বগ্রাসী সেই নগ্নতার !
রমণীর প্রেম, সখা, শান্ত স্তব্ধ যেন সরোবর,
চারিকূলে আবেষ্টিত ! একমাত্র তাহার নির্ভর
গোপন মনের সুধা। হ্রাসবৃদ্ধি সে ত নাহি জানে,
না শোনে বন্যার ডাক। একবার হলে ভর-ভর,
চিরপূর্ণ ! মৃদুমন্দ আনন্দ-হিল্লোল বহে প্রাণে,
সুন্দর কমল ফোটে না জানে কখন সেই সলিল-উদ্যানে ॥' ৩৩

যেন রে কমল দল আপনার শিশিরাশ্রু ভারে
নত হ'ল ! স্তব্ধ-কথা নেত্র হ'তে নীরব বিদ্যার
ঝরে ঝর অশ্রুধারা, সিক্ত করি অঙ্গদখানারে
বামমণিবন্ধশায়ী। তুলি ধরি মুখখানা তার
মুছাল সুন্দর ধীরে ; রাখিল সে অতি লঘুভার
গ্রীবাখানি স্কন্ধে নিজ—বুকে তার বক্ষ সমর্পিয়া
লাগিল কহিতে—'সেই পুরাতন ছন্দে রক্তধার
বহিতেছে করি অনুভব—তবে কেন, তবে কেন প্রিয়া,
সরাইলে ওষ্ঠপুট, এ নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান বিঁধিলে হানিয়া ॥' ৩৪

কহিতে লাগিল বিদ্যা উর্বশীর বীণাখানি সম—
'শিবরাত্র-ব্রত করি পতি-ভিক্ষা মাগে যে রমণী,
পায় সে অভীষ্ট বর ! আজি আমি মোর প্রিয়তম
লাগি পালিয়াছি ব্রত, সঁপিয়াছি মস্তকের মণি
পুরোহিতে, রহিয়াছি উপবাসী অতি পুণ্য গণি !
তাই তো এ অবাধ্যতা ! সখা, তাই আজি আসিবারে
করিনু বারণ।' 'দেবতা প্রসন্ন তাই বুঝি, ধনি,
দেখা হ'ল।' সবল দুবাহু পাশে চাপিয়া তাহারে
বাজাইল দেহ-তন্ত্রী—অজস্র মূর্ছনাময় উন্মাদ ঝঙ্কারে ॥ ৩৫

'স্বপনে দেখিতেছিনু, যেন তুমি শিবিকা সহিত
আসিয়াছ নিতে মোরে না হইতে ব্রত উদ্‌যাপন!
আমি না চাহিনু যেতে—তুমি রাগে অমনি ত্বরিত
ফিরাইলে মুখ। ভয়ে লাজে ডাকিলাম ঘন ঘন—
সুন্দর, সুন্দর; স্বপ্নে তুমি নাহি দিলে মোরে কোনো
সাড়া', 'স্বপ্নের সে অপরাধে, সত্যতর রূপে দ্বারে
তব উপস্থিত, দিয়েছি উত্তর, মর্ম জানে।' 'শোনো
কথা, স্বপন কি সত্য হয়!' 'অদৃষ্ট প্রসন্ন যারে,
স্বপ্ন সত্য শুধু নামান্তর তার! ওঠ সখি, রাত্রি শুধু বাড়ে।॥ ৩৬

'বিদেশী রাজার সৈন্য ঘিরিয়াছে আমার নগর,
দূতমুখে পেয়েছি সংবাদ কাল। এ বিপদে আর
কে কোথা নিশ্চিন্ত থাকে? হের অসি মোর পার্শ্বচর
গঞ্জিতেছে পলে পলে! চল শীঘ্র থাকিতে আঁধার।'
'আজ থাক, আজ থাক, ব্রত মোর হইবে উদ্ধার
কাল প্রাতে, সে তোমারি মঙ্গল লাগিয়া—তারপরে—'
'তবে তাই হোক'—নিমেষে উঠিলা বীর শয্যাধার
পরিত্যজি! 'তন্বী তুমি সম্পদের সৌভাগ্য-শিখরে
অস্তহীন শুক্রতারা! মোর আশা নিম্নশায়ী উপত্যকা 'পরে ৩৭

'বিচ্ছিন্ন কুয়াশা সম যাক মিলাইয়া অন্ধকার
অবসানে! প্রত্যাশার মরুস্থানে বসিয়া বসিয়া
গণিয়াছি দণ্ড পল কালসূচী বালুঘটিকার
ক্রমস্ফীত ধূলিস্তূপে, ছিল আশা উদিবে হাসিয়া
আমার সৌভাগ্য-তারা সূর্যাস্তের সীমান্তে আসিয়া
গোধূলির সীমন্তিনী, কিন্তু হায়, এ কি বেশে এলে!
মরুর পথিক সম বক্ষপুটে আনিলে বহিয়া
দুঃখের বারতা শুধু! তাই হোক, দাও দূরে ঠেলে!
এ পৃথ্বী এতই বড়, ছাড়াছাড়ি হ'য়ে দোঁহে দূরে চলি গেলে ৩৮

'কদাচিৎ দেখা আর! নিভে যায় আঁখির সে জ্যোতি,
যাহে দোঁহে চিনেছিল দু'জনারে। তবু, তবু প্রিয়া,
চলে যদি যাই আমি পৃথিবীর সীমান্ত অবধি—
চুম্বক-শলাকা যথা একদৃষ্টে থাকে রে চাহিয়া
সুদূর উত্তরে কোন্—সেই মত অবল্লভ হিয়া
নিয়ত স্মরিবে তোমা!' ধীরপদে গেল বীর মুখে
সুড়ঙ্গের। সে আবেগে কক্ষখানি রণিয়া কাঁপিয়া
পীড়িয়া উঠিতেছিল মুহুর্মুহু মর্মাহত দুখে
ঝঙ্কৃত তন্ত্রীর মত! হঠাৎ দর্পণপটে হেরিয়া সম্মুখে ৩৯

'করবীর বিম্বগুচ্ছ দাঁড়ালো থমকি; স্মিত হেসে
খুলি পুষ্প গেল ফিরি যেথা বিষ্ণা ম্রিয়মাণ হায়
নিমেষে গণিতেছিল একলক্ষ যুগ; পরাইল কেশে
প্রতি রজনীর মত শেষবার ফুল। অমনি যে তায়
কে ধরিল সর্বাঙ্গে জড়ায়ে। কে কহিল বেদনায়
মর্মান্ত উদ্বেলি তার—'হে বিদেশি, সঙ্গী হব তব
সুমেরুর সীমান্ত অবধি! যাব—যাব যেথা চায়,
যবে চায় চিত্ত তব। জীবনের বাঁকে বাঁকে নব
নব অদৃষ্টের সাথে, নির্ভয়ে চলিব ধেয়ে—তুমি মোর সব॥ ৪০

'যাব যেথা হিমাদ্রির কুণ্ডলিত কুহেলি-নিঃশ্বাসে
দিগন্তের নীল নেত্রে মুহুর্মুহু ছায়াছানি পড়ে!
যাব যেথা উচ্চকিত পাগলিয়া পুঞ্জিত হুতাশে
স্রস্তকেশ তিস্তা হ'তে রাশি রাশি ফেনপুষ্প ঝরে!
আপন ছায়ায় ভীত মৃগদল ধায় যেথা ডরে,
দিবসে জোনাক-জ্বালা, শ্বাপদের আঁখি-দীপ্ত পথে
নিঃশঙ্কে চলিব দোঁহে শব্দবেদী তটরেখা ধ'রে
ব্রহ্মপুত্র স্রোতস্বীর! অতিক্রমি এ মর্ত্য জগতে
যাব অলকার পানে উত্তীরিয়া ক্রৌঞ্চদ্বারে দৃপ্ত মনোরথে॥ ৪১

'লহ রাজ্য, লহ ধন, লহ লহ এ রূপ যৌবন,
লহ কান্তি, লহ শোভা, লহ লহ পরম হুঃসহা
চিত্তের চরম তৃষা ; তুরুদ্দেশ্য এ তুচ্ছ জীবন,
মৃত্যুর দিগন্তব্যাপী জগদ্দল একান্ত তুর্বহা
লহ লহ অস্তিত্ব আমার! অনন্তকাল প্রবহা
এ ক্ষুদ্র রহস্য-কণা বাছি লয়ে অন্য সব হ'তে
করো তব সামগ্রী খেলার! সখা, নাহি যায় কহা
জনমের সমগ্র সাধনা, যবে তুর্নিবার স্রোতে
বাহিরায় পুঞ্জ পুঞ্জ, তবু ভাবি কতটুকু আসিল আলোতে ॥' ৪২

চঞ্চলা চাঁপার ছায়া পরিত্যজি বৃক্ষের আশ্রয়
ঝড়ের উত্তরী ধরি চাহে যথা উধাও হইতে—
তেমনি উঠিল বিদ্যা, অঙ্গে দিল রক্তচ্ছটাময়
কাঁচুলিটি উলটিয়া ; ব্যস্ত করে কেশ জড়াইতে
খুলিল ডাহিন তুল ; মুখর নূপুর উতারিতে
বাধিল বিষম গ্রন্থি। নত হ'য়ে মারি এক টান
সুন্দর ছিঁড়িল তারে—ছড়াইয়া লাগিল ঝলিতে
অশ্রুর মতন মুক্তা ; আড় চোখে নিজমূর্তি খান
দর্পণে দেখিল বিদ্যা—সিন্দূর-কুঙ্কুম-বিন্দু ললাটে অম্লান ॥ ৪৩

প্রণয়-গুঞ্জন সম উস্খুস্থ মৃদুমন্দ রবে
খুলিল তুয়ারখানি স্পর্শখুসী বিদ্যার মায়ায়।
পলকে ঝলক মারি রশ্মিরাশি পশিল গৌরবে,
দাগিল ভিত্তির গাত্র তু'জনার একটি ছায়ায়।
তু'জনে বেষ্টিয়া দোঁহে ছায়ালগ্ন পাদপের প্রায়
ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পায়ে পায়ে নামিল সোপানে ;
প্রদীপের যাতায়াতে বিচলিত তুটি ছায়া, হায়,
পড়িল ডাহিনে বামে, আগে পিছে এখানে ওখানে,
শরীর-রক্ষীর মত আবর্তিল ; তুইজনা চলে সাবধানে ॥ ৪৪

মদিরাপিচ্ছিল মত্ত প্রাসাদের বলভি-সভায়
নয়নে লেগেছে নেশা, সঙ্গীতের ভাঁজে ভাঁজে ঘোর ;
নূপুর-স্খলিতা সবে নিদে মদে উন্মাদিনী প্রায় !
কাহারো শিথিল হ'ল কটিলগ্ন নীবীবন্ধ ডোর,
নির্দয় কটাক্ষ হানে চতুর্দিকে কোনো চিত্ত-চোর।
স্বেদোজ্জ্বল স্তনে কারো পীতরশ্মি পিছলিয়া পড়ে,
ছিন্ন মণিহার কারো উল্কাসম ছুটিয়াছে জোর,
চাপা-হাসি কোনো নটী বন্দী হ'য়ে রাজপুত্র করে
ভান করা লজ্জাবেশে সম্বরিতে বস্ত্রখানা শ্লথতর করে ॥ ৪৫

প্রাসাদ রাখিয়া বামে তুই জনা চলিল সত্বর—
সঙ্কীর্ণ গলির পথ ; তুই পাশে স্তম্ভ সারি সারি
ভূতলে ফেলিয়া ছায়া মিশিয়াছে ক্রমে শীর্ণতর
সুদীর্ঘ বীথির প্রান্তে ; তীর্থোদকে ভরি স্বর্ণঝারি
মন্দার-মালিকাময়ী পূজারিণী যত যক্ষ নারী
মস্তকে বহিছে ছাদ ; চাতালের আঁকা ধারে ধারে
বধূ-বিয়াকুল দ্রুত কিম্পুরুষ নভাঙ্গনচারী।
স্তম্ভ শ্রেণী অবকাশে বিজড়িত আলো অন্ধকারে
সচল তুইটি ছায়া, আলোকের মাঝে কভু, কখনো আঁধারে ॥ ৪৬

প্রাসাদ-কাননে বামে নীলকান্ত দীপের মায়ায়
উর্ধ্ব অধঃ চতুর্দিকে রচিয়াছে ইন্দ্রজালখানি।
গোলাপ করবী কুন্দ দাড়িম্বের আরক্ত নেশায়
নীলাভ আভাস দিল দিগন্তের নীলাঞ্জন ছানি।
উচ্ছ্বসিত জলযন্ত্র রিঝি রিঝি আত্মগত বাণী
বকিছে আপন মনে ; পরাগের শয্যাতলে বসি
কোকিল কুহরে মৃত্ব ; একপায়ে দীর্ঘছায়া হানি
সারস স্বপনে মগ্ন ; রহি রহি বায়ু ওঠে শ্বসি,
অলিন্দ-আলিসা হ'তে কেলিত্রস্ত পারাবত-পক্ষ পড়ে খসি ॥ ৪৭

নেশাসুপ্ত সিংহদ্বারে প্রেমিযুগ্ম অতিক্রম করি
দাঁড়ালো দীঘির তটে ; অন্ধকারে শুনিল নিয়ড়ে
অশ্বের নিশ্বাস-শব্দ ; সুন্দরের শিষ অনুসরি,
সচকিয়া নির্জনতা শুষ্করাশি পত্রের মর্মরে,
আনন্দিত হ্রেষা তুলি, চারি খুরে অধীরতা ভরে
বেগের ব্যঞ্জনা বহি দাঁড়াইল আনমিয়া শির
সুশিক্ষিত অশ্ববর ; স্পর্শ লভি পরিচিত করে
কালো চোখে আলো জ্বালি ভেদ করি অখণ্ড তিমির
বিদ্যার দর্শন লভি প্রভুরে সার্থক দেখি পুলকে অস্থির ॥ ৪৮

সোনার রেকাব পরে পা রাখিয়া অশ্বে আরোহিয়া,
বিদ্যারে বসায়ে যত্নে সন্তর্পণে সম্মুখে তাহার
মৃণাল-কোমল তনু বামহস্তে ধরিল বেষ্টিয়া,
দক্ষিণে বল্‌গা ধরি মৃদু চাপ দিল অশ্বে তার।
মুহূর্তে কেশর নাড়ি, ধনু সম বাঁকাইয়া ঘাড়,
জাগায়ে যুগল কর্ণ—একবার করি হ্রেষারব
ছুটিল সুন্দর অশ্ব। অকস্মাৎ পড়িল বিদ্যার
অসতর্ক দীর্ঘশ্বাস—আঁখিপ্রান্তে দুটি মুক্তা-দ্রব।
রহিল রহিল পড়ি পিতামাতা, আজন্মের গৃহ দ্বার সব ॥ ৪৯

রহিল রহিল পড়ি পুরাতন প্রাগ্‌জ্যোতিষ ধাম,
রহিল রহিল পড়ি পরিচিত সুখের বন্ধনী,
রহিল সখীর দল, রহিল রে আরাম-বিরাম !
এখন সম্মুখে শুধু প্রসারিয়া বিপুল তর্জনী
অজ্ঞাত অগাধ রাত্রি ; সঙ্গে চলে অশ্বখুরধ্বনি।
তারা-জ্বলা দিঘীজল একবার ঝকিল দক্ষিণে,
বামেতে হাঁকিল সান্ত্রী রজনীর প্রহরান্ত গণি।
জটিল পুরীর পথে ধায় দোঁহে দীপদীপ্তি বিনে,
বাতায়ন-বিচ্ছুরিত রশ্মিভয়ে নতশির পাছে ফেলে চিনে ॥ ৫০

অতীত-অঙ্কিত জীর্ণ নগরের সিংহদ্বার ছাড়ি
সম্মুখে অনন্ত মাঠ, দিগ্বলয়ে অন্ধকারে লীন
গারো পাহাড়ের লেখা ; উল্কাবেগে দেয় অশ্ব পাড়ি।
ফলন্ত ভুট্টার ক্ষেত আবক্ষ-উন্নত ; জ্বলে জিন
সপ্তর্ষির আলোপাতে ; তালে তালে বাজে রিন্‌ঝিন্
সাজের কনক-ঘণ্টা ; দুই পাশে আফিঙের বনে
দিবসের মউমাছি মধুমদে পক্ষগতিহীন
চমকে দুলন্ত ফুলে ; সে সুগন্ধি সুতীক্ষ্ণ পবনে
বিঁধিল বিদ্যার অঙ্গে, সুন্দরের শিরে শিরে—কাঁপিলা দু'জনে॥৫১

ফাল্গুন বাতাসে ভাসে খেজুরের মদির নিশ্বাস
কান্তারের কোণে কোণে ; কখনো বা গন্ধ-অনুমান
বন-চামেলির স্তূপ ; সৌরভের তীব্র নাগপাশ
কোথাও হানিছে চম্পা ; কোনোখানে মাধবিকা ম্লান
বসন্তের একান্ত দুলাল ; কভু ধানশ্রীর গান,
অবিরল কলধ্বনি সঁপিয়াছে একখানি পাড়
মৌনতার উত্তরীয় প্রান্ত ঘিরি করি দীপ্তি দান।
শুষ্ক-ঘাস বাঁশবনে দগ্ধ করি দূর গিরিসার
কিংশুক-কোমল শিখা স্তরে স্তরে বহ্নিলীলা করিছে বিস্তার॥৫২

অকস্মাৎ নিশীথের মর্ম হ'তে দিগন্ত অবধি
নীলাভ উল্কার রেখা আকাশেরে ফেলিল ছিঁড়িয়া,
ইস্পাত-মলিন নীল উদ্ভাসিল ধানশ্রীর নদী,
উদ্ভাসিল একবার স্বেদলবমুক্তাজাল দিয়া
পীতাভ-পাণ্ডুর মুখ বিদ্যার—সে তমিস্রা ভেদিয়া।
ক্ষণিক-আলোক লুপ্ত গাঢ়তর সুপ্ত-অন্ধকারে
নভশ্চ্যুত স্বপ্ন সম দুই জনা চলিল ছুটিয়া,
ভেদকরি গিরিদরী বন গ্রাম নগর কান্তারে
ভেদকরি তারকিত নির্জনতা নবতন দিগন্তের পারে॥ ৫৩

১৯২৯

প্রাচীন গীতিকা হইতে

মহুয়া

রজনীগন্ধার বনে পূর্ণিমার পুঞ্জিত শুভ্রতা,
নিরূর্মি নিষুপ্ত হ্রদে ছায়াপথ ভাস্বর যেমন,
বসন্ত অরণ্যে যথা ক্ষণতরে স্তব্ধ ব্যাকুলতা,
তেমনি ঘুমায় বালা, মহুয়া সে ; এবে তার মন
নীড়ে-ফেরা পাখিসম বিস্মরিয়া সুদূর কানন,
বিস্মরিয়া দিবসের সঙ্গিহীন বিশাল আকাশ
স্মরিছে একটি মুখ, নেহারিছে একটি স্বপন।
একটি প্রেমের স্মৃতি নাশ করে সকল আভাস,
বিরাট গগনপটে লক্ষতারালুপ্তকারী যথা পৌর্ণমাস ॥ ১

স্বর্ণসৌরকরসম মিলনের স্মৃতির মৃণাল
অগ্নিবর্ণে নেমে গেছে তলহীন হৃদয়ে তাহার ;
কি বা সে নাগিনীদল ভেদ করি বাসনাপাতাল
ললিততরলনৃত্যে খুঁজিতেছে আলোকের পার !
কৌতূহলী চন্দ্রকরে উদ্‌ঘাটিত যেমন অপার
লীলামীনআন্দোলিত জলতলে উপল চিক্কণ,
স্বপনসাগর মন্থি অধরের হাসি-রেখা তার
স্মৃতিসুধাসঞ্জীবিত প্রকাশিছে ব্যর্থ সে জীবন,
অগাধ সাগরতলে শূন্য যথা কমলার রত্ন সিংহাসন ॥ ২

স্বপনসোপানস্বর্ণে অবতরি হৃদয়ে তাহার
দেখিলাম ভূলুণ্ঠিত একখানি পদ্ম শতদল ;
স্মৃতির পাপড়িগুলি সন্তর্পণে উতারিয়া তার
জীবনের মধুকোষ হেরিলাম ব্যথায় বিকল।

মহুয়া বেদের মেয়ে, দেখাইয়া ব্যায়াম কোশল
ভ্রমে দলবলসহ ; এই মতে কাটিত জীবন।
হেন কালে চাঁদ সনে অকস্মাৎ দেখা তার হল !
বুঝিল মহুয়া নারী, সবিস্ময়ে হেরি নিজ মন,
কৈশোর-শিথান-প্রান্তে নিশান্তে লভিল যেন অপূর্ব রতন ॥৩

সেই হতে দিনে রাতে কভু একা সজনে বিজনে
বিথারি আপন মন চাহিয়াছে বুঝিতে তাহারে ;
অলক্ষ্য আলোকলুপ্ত আকাশের উচ্চতম কোণে
তৃষার্ত চাতক সে যে ; সে কি আসে নয়নের পারে ?
মাঝে মাঝে সচকিয়া বুকফাটা তপ্ত হাহাকারে
আপন নিশানা দেয় ; ওরে মুগ্ধা, সেই মন, হায়,
ধরা কি কখনো দেয় জগতের কঠিন বিচারে !
সে মানসী পা ফেলিয়া চলে রক্ত ব্যথায় ব্যথায়,
জরির জড়োয়া হানি ধায় সে ছলনাময়ী হাসির আভায় ॥ ৪

কি ছিল চাঁদের চোখে না বুঝিল অবোধ বালিকা !
পুরুষের আঁখি হায়, সে যে হেন পরশরতন,
কে জানিত আগে তাহা ! ভালে তার কি রহস্যলিখা !
যৌবনের অশ্বমেধে ছুটিয়াছে তুরিত-চরণ
জীবনের তুরঙ্গম। মুগ্ধ বালা করিল অর্পণ
কোকিলব্যাকুল এক বসন্তের নীরব নিশীথে
প্রেমের বেদিকাতলে আপনার দেহ প্রাণ মন।
শৈশবের খেলাঘরে বেহাগের ব্যথার ইঙ্গিতে
যে জাগিল প্রেম সে কি ? নাহি ভেদ তবে কিগো
গরল-অমৃতে ॥ ৫

কে মিশালো সমভাগে প্রেমপাত্রে গরলে সুধায়,
নন্দনের হেমপাত্রে অকস্মাৎ-বেদনার খাদ !
ছিঁড়িয়া মোতির মালা তারে দিয়া কে অশ্রু বানায়,

কোন্ দুষ্ট রাহু হায় গ্রাস করে চুম্বনের চাঁদ !
দুরন্ত সমুদ্রতটে কেবা রচে বালুকার বাঁধ
নিতান্ত কৌতুকভরে ! হায় বালা, চেয়ো না বুঝিতে
প্রণয়ের পরিণাম জীবনের রহস্যে অগাধ ;
সহজে ভাসিয়া যাও পাবে কূল সোনার তরীতে,
অতলে তলাও যদি নাহি তল, নাহি তীর মৃত্যুর নিভৃতে ॥ ৬

হুমরা বাদিয়া ছিল মহুয়ার পিতা ; ভাসমান
মেঘসম গুটায়ে কানাৎ তাঁবু দলবলসহ
অশ্ব, ছাগ, অশ্বতর আর লয়ে ইজ্জত সম্মান
চলিল সুদূর দেশে ; "মাণিক রে, এ ব্যথা দুঃসহ !
থাক পড়ে জমি জমা, হেথাকার আবাস ত্যজহ ;
আমার কুলের মেয়ে, পাহাড়ের বনেদি বাদিয়া,
সে হবে রাজার বউ ! দূর বনে এখনি চলহ।"
ছাড়িয়া বামুনকাঁদি নিশীথের আড়াল লভিয়া
চলিল বেদের দল, চলিল মহুয়া সাথে দীর্ঘ নিশ্বসিয়া ॥ ৭

যে-দুঃখে রাজার ছেলে নিক্ষেপিয়া রাজত্ব সম্বল
পথিকের দীক্ষা লয় ; নিরাশার নিকষশিলায়
আপন হৃদয়ক্ষত, একমাত্র উষার উজ্জ্বল
বাসনার রক্তরাগ, তারি লুব্ধ হাতছানি, হায়,
(ব্যাকুল কমল যথা মানসোৎকা হাঁসের পাখায়)
চাঁদেরে উদাসি দিল। ছাড়িল সে গৃহ ধন জন।
বহুদেশ ভ্রমি একা, বহুকাল সহি নির্বাসন,
সোমেশ্বরী নদীতীরে, আজিকে সন্ধ্যায় দোঁহে হয়েছে দর্শন ॥ ৮

ঘুমায় মহুয়া সুখে ; জীবনের জটিল বনের
শাখা প্রশাখার ফাঁকে চিরকাল যে-শশী ভাস্বর,
তাহারি একটি রেখা আজি তার বিরহী মনের
ব্যথার ব্যর্থতা পরে, বাসনার সোনায় সুন্দর

গড়িছে বাসরকক্ষ। ভেঙে ভেঙে পড়ে নিরন্তর
জগতের তরঙ্গিণী জীবনের এক উপকূলে,
জাগে স্বপনের তীরে নব দেশ শ্যামল উর্বর।
যে-মেঘ কাঁদিয়া গেল পূর্ববায়ে মন্দ পাল তুলে
সে পুনঃ ছুটিয়া নামে ব্রহ্মপুত্র স্রোতস্বীর গিরিদ্বার খুলে॥ ৯

উর্বশীর বীণাচ্যুত মন্দারের দেবমাল্যসম
লুটায় মহুয়া ঘুমে—অরণ্যের পল্লবশয্যায়
নয়ন নিমীল সুখে; চন্দ্রকর মৃদু নেত্ররম
সর্বাঙ্গে দিয়েছে তার স্বপ্নের প্রলেপ; এবে হায়
চরণের চঞ্চলতা, কাঁপিত যা ঝঙ্কৃত বীণায়
আলোর ঝলক সম, শ্রোত্রপেয় সে সঙ্গীত ধার
আপনারে অনুবাদি ভাস্করের স্ফটিক ভাষায়
নীরব গরবে মরি; এলায়িত কৃষ্ণ কেশভার
বিস্মৃতির বৈতরণী, মৃত্যুর রহস্য বহি অতল অপার॥ ১০

বিদেশী বঁধুর মুখ আজি তার জাগিছে স্মরণে!
নদীর কল্লোলে আর বসন্তের চাঁদের ইঙ্গিতে,
স্মৃতির তুফান-তোলা সোমগন্ধী মল্লিকার বনে,
যামিনীর মৌনভেদী অকারণ করুণ সঙ্গীতে,
অকস্মাৎ সেতু গাঁথে জনমের ভবিষ্যে অতীতে।
ক্ষণিক আকার পায় জীবনের ক্ষীণবৃন্ত সাধ,
সুমেরুসুবর্ণপদ্মে ফোটে তাহা চিত্তের নিভৃতে।
একখানি কাম্য মুখ, চারিদিকে সমুদ্র অগাধ,
তন্দ্রিত ধরার যথা স্বপ্নের তৃতীয় নেত্রে দশমীর চাঁদ॥ ১১

সহসা জাগিল বালা, নেহারিল আঁখি কচালিয়া,
ও কি ও খদ্যোৎ জ্বলে, অসময়ে মেঘ-আড়ম্বর?
না, না, ও জোনাকি নয়, আঁখিদ্যুতি বন উজলিয়া;

অন্তর্গূঢ় ঈর্ষারূঢ় হুমরার বজ্রগর্জস্বর।
“আর কত ঘুমাও রে। চোখ মেলে জাগো মা সত্বর ;
আমার কুলের সর্প এতদূর এলো মাটি খুঁড়ি !
চিরদিন গৃহবাসী, সেই হবে বাদিয়ার বর !
পথিকের কণ্ঠহার অবশেষে করিবে সে চুরি ?
যাও মা মহুয়া তারে স্বহস্তে বধিয়া এসো, এই লহ ছুরি ॥” ১২

উঠিল মহুয়া ধীরে ; পূর্ণ শশী মেঘে দিল ঢাকি।
দেখিল ক্ষণেক কাল, বুঝিল সে এ নহে স্বপন ;
উত্তরপ্রত্যাশাব্যগ্র হুমরার নিশাচর আঁখি
ছোটে বা কোটর ত্যজি ! শ্বাস রুধি করিল গ্রহণ
শীতান্তে জাগ্রত তপ্ত তক্ষকের জিহ্বার মতন
খরশাণ ছুরিকারে ; তারপরে গেল পায়ে পায়ে,
নদীর উজান-ঠেলা মন্দগতি তরণী যেমন,
শ্যামশষ্পশয্যা পরে ডোরা-টানা শালবনচ্ছায়ে
শিথানে রতন-পাওয়া নির্ভর নিষুপ্ত চাঁদ যেখানে ঘুমায়ে ॥ ১৩

রাতের স্বপনে যে বা ভোর বেলা দেখে মূর্তিমতী,
তাহারি আগ্রহভরে, অকস্মাৎ উঠে বসে চাঁদ ;
“মহুয়া মহুয়া, সখী, ভাগ্য মোর সুপ্রসন্ন অতি।
উদ্বেল বাসনাবারি লঙ্ঘিল কি নিষেধের বাঁধ,
অয়ি মোর কামনার কমনীয় কনক নি-খাদ !”
নীরব মহুয়া শুধু বিকম্পিত বেতসীর মত
কাঁপিল সকল অঙ্গে ; চারিদিকে স্তব্ধতা অগাধ ;
প্রাণপণে দীর্ঘশ্বাস-চেপে-রাখা মহুয়ার, হায়,
অঞ্চল আড়াল হ’তে খসে পড়ে ছুরিখান প্রদীপ্ত জ্যোৎস্নায়॥ ১৪

কাঁদিয়া মহুয়া বলে—"মোরে তুমি ছেড়ে দাও প্রিয়,
ওই তো গহীন্ নদী, জলে তার আমি ডুবে মরি।"
"তার চেয়ে প্রিয়তমা সে তটিনী তুমিই হইও,
অনন্ত যৌবনে তব আপনারে সমর্পণ করি
অতলে ডুবিয়া যাব দাবদগ্ধ জীবন বিস্মরি।
মৃত্যু কি ভীষণ এত! জীবন কি এতই আশ্রয়!
জীবনমরণাতীত প্রণয়ের গর্ব বক্ষে ধরি।
এ জীবন-উত্তরীয় বহুবার হয়েছে নিশ্চয়
অনেকের প্রেমে রাঙা; তোমার চরম প্রেমে হোক তা অক্ষয়॥ ১৫

"জীবন-উত্তরী মোর কত পূর্ব জনমের প্রেমে
নাহি জানি অপ্রমেয়, কত নববনচ্ছায়াতলে
প্রণয়কুসুমস্পর্শে বারম্বার গিয়েছিনু থেমে,
এক কাননের ফুল অন্য বনে ফেলি খেলাচ্ছলে
জীবনের ছায়াপথে উত্তরিয়া আসিয়াছি চ'লে।
তবু তার গন্ধটুকু! অলক্ষ্য সে গন্ধের মালিকা
চকিতে চমকি দেয়, নবতন প্রেমের কল্লোলে।
হৃদয়দেহলিতলে আজি লক্ষ প্রেমদীপালিকা,
একটি জীবনে হেরি শতপূর্ব প্রণয়ীর অঙ্গুরীয় লিখা॥ ১৬

"মৃত্যুরে না করি ভয়, যদি পাই প্রেমের আশ্বাস।"
মহুয়া কহিল ধীরে—"নাহি ব'লো মরণের কথা,
কেবল প্রভাত এবে, জীবনের মিটে নাই আশ,
এখনো রয়েছে বাকি সায়াহ্নের নীরব নম্রতা,
তারপরে অবশেষে নিশীথের স্তম্ভিত স্তব্ধতা।
তার চেয়ে চল যাই, রজনীর থাকিতে থাকিতে
অন্ধকার অবশেষ, অন্য দেশে, সুখ আছে যথা!
আছে দুটি তাজি ঘোড়া, মোর জানা, বনের নিভৃতে
ঘুমায় বেদের দল শিকারের পরিশ্রমে বিশ্বসিত চিতে॥" ১৭

চামেলি-চমক-লাগা শশী-রাকা নীরব শর্বরী ;
পাখি-জাগা আলো-আঁকা ছায়া-ছাঁকা পথে
যুগল ঘোড়ার ক্ষুর রহি রহি উঠিল শিহরি ;
এ শাখে কোকিল ডাকে, কুহুস্বর অন্য শাখা হ'তে,
সুরের বসনখানি বুনে দেয় স্তব্ধ বায়ুস্রোতে।
ধরণীর রসোচ্ছ্বাস কুসুমের অজস্র বুদ্বুদে
অসহ্য প্রাণের ভরে বৃন্ত পরে কাঁপে শতে শতে,
মৃত্যুর ললাটে দেয় জীবনের পত্রলেখা খুদে,
সৌরভের স্বয়ম্বরে প্রাণস্বপ্নে মরণের নেত্র আসে মুদে ॥ ১৮

চাঁদ মহুয়ার অশ্ব বাহিরিল বনভূমি হ'তে ;
সম্মুখে বিস্তার মাঠে পূর্ণিমার পূরন্ত জোয়ার,
ডুবেছে পৃথিবী যেন ধবলিত জাহ্নবীর স্রোতে ;
খুদিয়াছে বিশ্বছবি যেন কোন্ কারু-কর্মকার
শুভ্র হস্তিদন্তপটে ; দাক্ষিণ্য কি দিগ্বধূবালার
রাশি রাশি কুন্দ বেলা নিশিগন্ধা মল্লিকামালায়
বর্ষিল অজস্রধারে ; পানপাত্র আজি দেবতার
উচ্ছ্বসিত সোমরসে উদ্বেলিত কানায় কানায়,
উৎসারিত সে মদিরা স্বর্গমর্তরসাতলদ্যুলোক ডুবায় ॥ ১৯

না, না, না, ভেঙেছে আজি চন্দ্রমার মধুচক্রখানি।
পরাগপাটলপাখা তারকার মধুমক্ষী যত
কনকচাঁপার মধু সযতনে রেখেছিল আনি
দ্যুলোকের দিব্যচক্রে ; দুর্বিষহ রসভারে নত
সে মধুমাধুরীমদ লক্ষস্রোতে ক্ষরিছে নিয়ত
স্বর্ণায়িত ত্রিভুবনে ; হায় সৌম্য, হে ওষধিপতি,
বুকে চাপি কাঁদে বিশ্ব চিরন্তন বেদনার ক্ষত।
বিরহখাণ্ডবদাহে ধরাতল বেয়াকুল অতি
আছে কি সে সোমলতা ভুলায় যা জীবনের সর্ব লাভক্ষতি ॥ ২০

চাঁদ ছুটে আগে আগে, পিছে ছুটে মহুয়া সুন্দরী ;
মদনের ধনুশ্চ্যুত দুইখানি শরের মতন
ছুটিছে দুইটি অশ্ব ; কাননান্ত উঠিল শিহরি
নিশান্তের শীত বায়ে ; সোমেশ্বরী ভাঙিয়া স্বপন
আবর্তিল তরঙ্গের জপমাল্য নিয়ত যেমন।
ক্বচিৎ পাখার রব, ভীত শিবা ছুটে চলে যায় ;
দূরে অশ্বক্ষুর দোঁহে সচকিতে করিল শ্রবণ,
ক্ষণেক থমকি থামে, থামে ধ্বনি, বোঝে শেষে হায়,
নিজেরি ঘোড়ার ক্ষুর প্রতিধ্বনিরূপে যেন তাদের ভয়ায় ॥ ২১

সহসা দেখিল দোঁহে পশ্চিমের দিগন্তরেখায়
পদ্মবনমধুরক্ত প্রৌঢ়হংসচন্দ্রমা সুধীরে
নামিছে স্থগিত পক্ষে, মন্দাকিনীতীর ত্যজি হায়
জাহ্নবীপুলিনপটে ; অতিদূর পূর্ব গিরিশিরে
উষসীর পূর্বরাগ ; বীণ্‌কার ভৈরবীর মীড়ে
তুলিছে মূর্ছনা যেন ; সুখসুপ্ত দিগ্বধূবালার
ঘুমে জাগরণে দ্বন্দ্ব, কভু আলো কখনো তিমিরে।
পূর্বাশাপালঙ্কপরে লীলাময়ী দিক্‌-অঙ্গনার
নয়নে অধরে আলো, অসম্বৃত কেশপাশে নিশার আঁধার ॥ ২২

নীরব বজ্রের গর্জে অকস্মাৎ উদিল সবিতা,
বেদনার বেদমন্ত্র, অন্ধকার তমসার তীরে
উদাত্ত-উদ্বেগময়ী যেন আদি কবির কবিতা।
থামিল মহুয়া চাঁদ, দোঁহে তারা তাকাইল ফিরে
সূর্যচন্দ্র-উদ্ভাসিত উদয়াস্ত দুই গিরি-শিরে।
যুগল কনককর দুইদিকে পড়িয়াছে লুটি,
দোঁহার ধরিয়া কর দুইজন সম্ভাষিছে ধীরে।
স্বপ্নে আর জাগরণে ক্ষণতরে ভেদ গেছে টুটি,
নিসর্গের মানদণ্ডে সুধাস্যন্দী সৌন্দর্যের তুলাপাত্র দুটি ॥ ২৩

বসন্তের সুপ্রভাত ! গ্রামপ্রান্তে কোকিলের স্বর ;
শিশিরে শ্যামল মাঠ ; মাঠে মাঠে ক্ষেত গোধূমের ;
শ্যামল আঁধার আর পদ্মমৃদু স্বর্ণরবিকর ;
নদীমুখী কিশোরীর পায়ে লাগি ঝরে শিশিরের
লঘু স্বচ্ছ মুক্তাদল ; জড়াইয়া যুগল অশ্বের
ক্ষুরে ক্ষুরে ফল্গুরস ফাল্গুনের কুসুমের রাশি
দলিল যা সারা রাত্রি ; দুইজনা দেখে দুজনের
কপোলের স্বেদলেখা, ওষ্ঠাধরে ক্ষীণবৃন্ত হাসি,
অধরে মিলনতৃষা, নয়নে নয়নে জাগে উদাসিয়া বাঁশী॥ ২৪

ফাল্গুনের বেলা বাড়ে ; দুই অশ্ব তীরের মতন
প্রান্তরের বক্ষভেদী লক্ষ্যমুখী ছুটে চলে যায় ;
কুণ্ডলিত চক্রবাল ধীরে ধীরে করে আবর্তন,
দু পাশের তরুশ্রেণী হুস্ করি ছুটিয়া পালায়।
ক্লান্ত অশ্বমুখ হতে রাশি রাশি ফেনমল্লিকায়
আঁকিছে পথের চিহ্ন ; বিলম্বিত বাতাসের স্রোতে
মহুয়ার চুল হতে সুরাগন্ধী সুরভি কষায়
হানিছে চাঁদেরে কশা ; সংসারের পাঠশালা হ'তে
পলাতক দুইজনা, প্রলয়ের উল্কাসম আপন আলোতে॥ ২৫

আজ বহুদিন পরে জীবনের আবর্জনা হ'তে
মুক্তির দিগন্ত পরে দেখা দিল প্রণয়ী দুজন।
জানি জানি ভেসে যায় নিম্নমুখী কালিন্দীর স্রোতে
সকল সান্ত্বনা আর ধন জন সৌন্দর্য যৌবন।
তবু যা ফেরে না আর, জপমাল্যে নাহি আবর্তন,
তারি লাগি কবিচিত্ত নিশিদিন কাঁদিয়া উন্মনা।
কোটালের বন্যা এ যে, এ যে হায় নিশান্তস্বপন,
গরলমাণিক্যময় এ যে হায় জীবনের ফণা,
যে স্পর্শমণির স্পর্শে জীবনের সর্বগ্লানি হ'য়ে যায় সোনা॥ ২৬

রমণীর রূপ আর পুরুষের সবল যৌবন—
হে বিধাতঃ শক্তিহীন! তুমি শুধু পার একবার
মানবে এ বর দিতে। তারপরে সুদীর্ঘ জীবন
স্কন্ধে করি বহে চলি দুর্বিষহ সুখস্মৃতিভার।
এই তো সংসারলীলা! তার চেয়ে চাঁদ মহুয়ার
ক্ষণিকের অবকাশ শতগুণে লক্ষগুণে শ্রেয়।
অশ্ব এক, নারী এক, সম্মুখেতে দিগন্ত অপার,
কালসঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবিশ্রাম ছুটে চলে যেও,
অবজ্ঞারকশাহানি; এই তোজীবন, আরবাকি তো দুর্জ্ঞেয়॥২৭

বয়স বাইশ যবে, আর যবে নারী সপ্তদশী,
ধরাতে বসন্ত যবে, বনতল উঠেছে ফাল্গুনি,
মণি-গলা নভতলে জাগে যবে স্বপ্নহানা-শশী,
বাসকশয়নমুখী নূপুরের মৃদু রুণুরুণি
সঙ্কোচে সাধ্বসে যবে সন্তর্পণে ধীরে দেয় বুনি
বাসনায় বেদনায় ব্যাকুলতা-আশা-আকাঙ্ক্ষায়,
সেই তো জীবন মূঢ়! যবে শুধু দূর থেকে শুনি,
মনে শুনি, কানে শুনি, ধরিবারে দেহ ধেয়ে যায়,
অতৃপ্ত তৃষার রথে জীবনের পথে পথে চিরমৃগয়ায়॥ ২৮

চাঁদ মহুয়ার অশ্ব অবশেষে প্রবেশিল বনে;
পথহীন অরণ্যের অবিরাম আদিম মর্মর
উর্বশীর হাহাকার বিস্তারিয়া ব্যাকুল পবনে
কাঁদিতেছে নিরন্তর; বিকশিত শ্যামতৃণস্তর;
প্রভাতী শিশিরকণা নাহি শোষে খররবিকর,
হেন সে গহন বন; জোনাকির সনে জ্বলে যথা
শ্বাপদের দীপ্ত আঁখি; তোলে যেথা সর্বাঙ্গে শিহর
সরীসৃপশীতলতা; কানপাতা সতর্ক স্তব্ধতা
অধরে তর্জনী রাখি শুনিবারে চাহে যেন অন্তরের কথা॥ ২৯

কিংশুকের কশাঘাতে আরক্তিম বনবীথি দিয়া
যুগল প্রণয়ী ধায় ; বসন্তের আতপ্ত বাতাস
মহুয়ার খোঁপা হ'তে একটানে লয়েছে খুলিয়া
রবিরে আড়াল-করা ঘুমে-ভরা দীর্ঘ কেশপাশ,
জীবনের ব্রণ পরে মরণের স্নিগ্ধ পূর্বাভাস।
"হে সুন্দরী মুখে তব জনপূর্ণ জীবনের জ্যোতি,
নিবিড় কুন্তলে তব তলহীন মৃত্যুর আশ্বাস,
অধরে গরল তব, দুটি নেত্রে অমৃতমিনতি,
মর্মরনির্মল দেহে জীবনে মরণে তুমি সেতু মূর্তিমতী ॥ ৩০

তুমি সখী রন্ধ্রহীন জীবনের কঠিন পাষাণে
সুদূরে নিকটে-আনা স্বপ্ন-হানা মুগ্ধ বাতায়ন।
ভাঙিলে প্রাকার ক্ষুদ্র, প্রকাশিলে বিস্মিত নয়ানে
মেঘের কাজল-পরা অতিদূর শিখর কানন।
নিমেষের দ্রাক্ষা-পেষা সুদূরের মদিরা উন্মন,
কবির বীণায় তুমি ছায়াময়ী বেহাগের মীড়,
যে-কথা পড়ে না মনে, করে শুধু হৃদি উচাটন,
তাহারি সঙ্কেত তুমি ; শুধু যবে রজনী গভীর,
রজনীগন্ধার গন্ধে স্বপ্নেরে করিয়া দাও চঞ্চল অধীর ॥" ৩১

থামিল যখন চাঁদ, মহুয়ার ফুটিল অধরে
অর্থহীন ভাবে-ভরা হাসি ; যবে নিশীথশেষের
শরৎ-পূর্ণিমাচন্দ্র ধরণীর কুয়াশার পরে
বুলায় পরশখানি, জাগাইয়া রেশমী-রেশের
ঊর্ণাতন্তু ইন্দ্রজাল, তুলনা কি সে স্মিতহাস্যের ?
সে হাসি বোঝে না সবে, বোঝে যার আছে শুধু মন।
ব্যর্থ ভাষা নাহি পারে প্রকাশিতে মনোজগতের
সকল সঙ্কেত সূক্ষ্ম ; তাই সৃষ্টি হাসি ও ক্রন্দন,
তাই সৃষ্টি বাসনাবাসর লাগি বাসন্তিক আশ্লেষ-চুম্বন ॥ ৩২

কতক্ষণে বন ত্যজি দুই জনা আসিলা প্রান্তরে।
সম্মুখে তটিনী ধনু ; অশ্ব হ'তে উতারিল ধীরে
দুইজনে ; ক্লান্ত অশ্বমুখ হ'তে ফেনপুষ্প ঝরে ;
হঠাৎ আলোক যবে ঝলকায় কালো দীঘি-নীরে
—উজ্জ্বল ঘোড়ার চোখ ; জিন-গ্রন্থি গেছে সব ছিঁড়ে
বিস্ফারিত বক্ষ হ'তে নিশ্বাসের চাপে ; মহুয়ার
চেনা স্বরে দুটি ঘোড়া বারম্বার চাহে ফিরে ফিরে।
মহুয়া উঠিয়া ধীরে কাছে টানি দুটি অশ্ব তার,
আদর করিল বহু, তৃণদল শেষ দান দিল বন্ধুতার ॥ ৩৩

তারপরে দুইজনে অবতরি তটিনীর নীরে,
দুরন্ত ধনুর পুঞ্জ কেশর আঁকড়ি অবিরাম
চলিল ভাসিয়া শুধু ; শালবন দুই তীরে তীরে,
শ্যামল ছায়ায় তার দুই কূলে নেত্র-অভিরাম
তরঙ্গিত ছায়াপথ ; চোখে পড়ে কত ছোট গ্রাম !
কেবল দুজনে তারা পাশাপাশি চলিল ভাসিয়া,
—অকারণ স্বপ্নসম নাহি যার অর্থ, পরিমাণ,—
জীবনপ্রবাহবেগে কত স্বপ্ন নোঙর ছিঁড়িয়া
প্রলয়পয়োধিতলে এই মত ভেসে যায়, বারেক সাধিয়া ॥ ৩৪

সলিলে মলিন হ'ল মহুয়ার চোখের কাজল,
অধর পাণ্ডুর হ'ল, দুই গালে শুক্তির শুভ্রতা ;
অপাঙ্গ আরক্ত আর মধুগন্ধী আলোলকুন্তল
লিপ্ত হ'ল গ্রীবাতটে ; বাহু দুটি কল্‌মীর লতা
এলায়িত জলতলে ; ভেদ করি শাড়ির স্বচ্ছতা
তরঙ্গের তালে তালে ওঠা-পড়া বক্ষে নিরবধি
নি-খাদ সোনায় গড়া বুদ্‌বুদের ; মুখে নাহি কথা।
—ভাসিয়া চলিল দোঁহে পাশাপাশি, বাহি ধনু নদী
ধরণীর কোন প্রান্তে জীবনের উপান্তেও স্বর্গ থাকে যদি ॥ ৩৫

বাঁচিবার কি আনন্দ! কিছু নহে শুধু বেঁচে থাকা!
অতি উচ্চ তট হতে ঝাঁপ দিয়া পড়ি সরোবরে
তড়িৎ-তরল জলে মুহুর্মুহু ইন্দ্রধনু আঁকা।
বাঁচিবার কি আনন্দ! শরতের সান্ধ্যমেঘস্তরে
নিঃশব্দে সোপান গাঁথা এত স্বর্ণে, এত ধৈর্যভরে,
প্রবালমাণিক্যহীরা, এত যত্নে এত যে রচনা—
কে বলিল সে সোপান যায় নাই দূর স্বর্গ পরে!
কে বলিল প্রত্যহের প্রতি তুচ্ছ ব্যর্থ বিড়ম্বনা
যে-আশায় উল্লসিত সে আনন্দ স্বর্গ নহে! স্বর্গই সান্ত্বনা॥ ৩৬

হে ধরণি, হাতে তব অক্ষয় তূণীর, অবহেলে
লক্ষ্যহীন নিক্ষেপিছ লক্ষ আম্রমুকুল-সায়ক।
হে জীবন, পাত্রে তব অক্ষয় মদিরা, দাও ঢেলে
উচ্ছ্বসিত সোমসুধা প্রয়োজন হোক নাই হোক।
অশ্রুসরসীতে দৃশ্য সন্ধানিয়া দূর মৎস্যচোখ
আমি ছুঁড়িব না অস্ত্র, মোর হাতে শুধু একখানি
জীবন একঘ্নীবাণ; মোর কাছে এই মর্ত্যলোক
সবার চরম সত্য; তোরে সখী সর্বশ্রেষ্ঠ মানি
জীবন একঘ্নীশর সন্তর্পণে দিব তব পদপ্রান্তে আনি॥ ৩৭

সোমেশ্বরী নদীতীরে দুইজনে বাঁধিয়াছে ঘর
সুন্দরী মহুয়া, চাঁদ; দুইজনা ভ্রমে অবিরত
বসন্তের বনপথে মনোরথে নির্ভয়নির্ভর,
শ্যামশষ্পে ঢাকা যেথা শ্বাপদের দুষ্টনখক্ষত
কোমল মৃত্তিকাতলে। কভু শাখা করিয়া আনত
ফাটন্ত দাড়িম্ব পাড়ি, ভাঙি তারে, লয়ে দানাগুলি
মহুয়া আপনি খায়; "খাও খাও, আরো আছে কত";
এত বলি একমুষ্টি দেয় নিজে চাঁদহস্তে তুলি;
তারে দিতে, আপন অধরে হাত মাঝে মাঝে যায় পথ ভুলি॥৩৮

কিংশুকের বনে বনে নন্দনের লক্ষ সাহসিকা
সহসা প্রবেশ করি সমর্পিল রূপদাবানল ;
প্রবালপল্লবজালে লেলিহান চারু বহ্নিশিখা,
অশোক-করবীকুঞ্জে লীলায়িত খাণ্ডব অনল ;
মৃগীর চঞ্চল চোখে অকস্মাৎ চাহে মৃগদল,
বনপথে মনোরথে উত্তরিল যবে মধুমাস।
যযাতি-অতৃপ্তি বহি পঁহুছিল অধীর বিহ্বল
বিরহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দক্ষিণের তুরন্ত বাতাস ;
প্রকৃতি মানবে সাধে চিরন্তন ঐক্যতান সঙ্গীত আভাস ॥ ৩৯

দোঁহে বসি দেখে তীরে ওপারের পূর্ণিমার শশী
দীঘির কিনারে আঁকে একখানি সুবর্ণের পাড় ;
কেমনে শুকনো পাতা অন্য মনে উড়ে যায় খসি
খেলার তরণী যেন স্রোতমুখে বন-বালিকার।
কেমনে কোকিল ডাকে বারে বারে নোয়াইয়া ঘাড় ;
তুদিকে হেলায়ে গ্রীবা ডাকে কোথা সচকিত কাক ;
ময়ূরের চিত্রকণ্ঠে বিচ্ছুরিত বরণচ্ছটার
ক্ষণিক বিজলী খেলা ; আলোভীরু হরিণের ঝাঁক ;
দেখে আর শোনে দোঁহে নিভৃতের বাণীরূপ স্তব্ধ ঘুঘুডাক ॥ ৪০

কখনো মহুয়া নাচে ; কলাপের চন্দ্রক মেলিয়া
শত চক্ষে দেখে তারে শিখিদল আশে পাশে আসি ;
লাবণ্যকুসুমদাম দেহ হতে পড়ে উছলিয়া,
দক্ষিণ সমীরবেগে মাধবীর পুষ্প রাশি রাশি।
ললিত বাহুর ছন্দ দেবকাম্য মাল্যসম ভাসি
উদ্দেশ্যে উড়িয়া চলে অতি দূর নন্দনসভায়
মহেন্দ্রের কণ্ঠপানে। যেন ওরে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
অলকানন্দার জল, ইন্দ্রাণীর রাজহংসী প্রায়
আপনার দেহ পরে আপনি মহুয়া এবে নেচে ভেসে যায় ॥ ৪১

নাচের সে তালে তালে খুলে যায় গলিত কবরী,
কবরী খুলিয়া গিয়া আলুলিত কালো কেশপাশ ;
গিরিতটে নামিল রে অকস্মাৎ স্তব্ধ বিভাবরী,
তপনে গোপন করি আচ্ছাদিয়া সমগ্র আকাশ।
ভালে জাগে স্বেদলব অভিনব মুকুতার রাশ ;
কানের কমল খসে, আর খসে পায়ের নূপুর ;
দেহের ব্যঞ্জনাসম খসে ওড়ে নভনীল বাস।
স্তনস্তবকের পরে বৃন্ত দুটি ভ্রমর বিধুর ;
বীণা ত্যজি মূর্তিল কি অপ্সরীর অঙ্গুলিতে এ তান তনুর ॥ ৪২

নাচের সে তালে তালে স্বেদজালে করে ঝিকমিক
হীরককঠিনস্তনে সূচীমুখ যুগল চুচুক ;
কুহেলিকা-খসা যেন গৌরীশৃঙ্গ গিরি আকস্মিক,
মেঘসরা, সুধাঝরা, পূর্ণিমার শশাঙ্ক লাজুক ;
দুঃসহ মধুর ভারে ভগ্নপ্রায় উদ্বেলিতবুক
নন্দনের মধুচক্র ; দোলে তার বেণী ঘন ঘন
মনোরথ চালনায় মদনের চকিত চাবুক।
কখনো প্রকাশে উরু, কভু শ্রোণী, কখনো জঘন,
সুধাবিষ যুগপৎ ; দেহে তার চলে যেন সমুদ্রমন্থন ॥ ৪৩

শতপান্নাতরলিত তলহীন স্বচ্ছ সরসীর
কল্লোলবলয়ী জলে যায় বালা সুখে সাঁতারিয়া ;
কুচাগ্রবন্ধুরকান্ত বিবসন নির্মল শরীর
মণিগলা বারিরাশি সযতনে রাখে আবরিয়া
অকূল দুকূলে তার ; কভু বালা রাখে জাগাইয়া
রজনীগন্ধার গ্রীবা, আঁকে যেথা শুভ্র আলিপন
ছাতিমের স্বচ্ছছায়া ; নির্নিমেষে সম্মুখে ধরিয়া
সূর্যাস্তের সোনাঢালা সরসীর নিষ্কল দর্পণ,
কি দেখে মহুয়া সেথা ? সন্ধ্যাতারা লজ্জাহানা যুগলনয়ন ॥ ৪৪

প্রদোষের প্রসাধনে বিবসনা দাঁড়ায়ে সুন্দরী,
চোখের কাজল গত, আর গত সুকণ্ঠের হার।
অদৃশ্য বৃন্তের পরে সদ্যস্ফুট অস্পৃষ্ট মঞ্জরী
রজনীগন্ধার কোন্ ; কেলিক্লান্ত কাঁপে স্তন-ভার,
সৃষ্টির চরম ধন, শেষকীর্তি এ বিশ্বকর্মার।
কমল পরশে যথা অতিতুচ্ছ শিশিরের জল
জাদুমায়ামন্ত্রবলে জন্ম লভে দুর্লভ মুক্তার,
পূর্ণ পয়োধরযুগে জলকণা করে ঝলমল,
যেন সে লক্ষ্মীর হার সৌন্দর্যের স্বয়ম্বরে মৌক্তিকতরল। ৪৫

বিস্রস্তদুকূলগঙ্গা কৈলাসের নির্মল দর্পণে
স্বয়ং স্বয়ম্ভু যথা অবিরাম করে বসি ধ্যান,
মহাকাল সেই মত ওই দুটি শিশিরিত স্তনে
আপন মহিমা হেরে ; জীবনের যৌবনের জ্ঞান
ও দুটি শিখর পরে চিরকাল চলিছে সন্ধান।
মুষ্টিমেয় কটি কাঁপে, কাঁপে নাভি, সূক্ষ্ম রোমাবলী ;
বাসনাবিদ্যুৎবজ্র বিরচিত ক্ষীণ মধ্যখান
ছড়ায় লাবণ্যদ্যুতি ; ঝরে জল বহিয়া ত্রিবলী
সনাথা রতির যেথা বাসন্তিক বিহারের উপবনস্থলী ॥ ৪৬

সযতনে সাজে বালা পুরাইয়া নিজ মনোরথে ;
ঘুমের ঝরণাসম কালো কেশে বাঁধিল কবরী ;
প্রণয়ের স্বর্গগামী সীমন্তের দীর্ঘায়িত পথে
মাখে রাঙা ফুলরেণু ; দীঘি হ'তে কমল আহরি
কোমল মৃণাল-ভাঙা তন্তুজাল সন্তর্পণে ভরি
দেয় স্তনযুগ মাঝে ; ধীরে আঁকে খয়েরের টিপ
চন্দনলাঞ্ছিত ভালে, মনে মনে কার কথা স্মরি।
সমাধিয়া প্রসাধন, গৃহমুখী জ্বালিবারে দীপ,
রজনীর নর্মসুখে রোমাঞ্চরভসে বালা উৎকেশর নীপ ॥ ৪৭

কোকিল-জাগানো রাতে বাসরের ফুলশয্যাপরে
কখন যে প্রিয়হস্তে নীবীবন্ধ শ্লথতর হায় !
বিলাসের বিলম্বনে রাত্রি বাড়ে প্রহরে প্রহরে
আপনি অজ্ঞাতে শেষে লজ্জা আর সজ্জা সরি যায়।
চন্দ্রোদয়ে ছায়া যেন সঙ্কুচিত করি আপনায়
উদ্‌ঘাটয়ে পুষ্পবন ; হিমানীর অঙ্গুলিসঙ্কেতে
তরঙ্গিণী স্তব্ধ যেন নিষ্কলঙ্ক তুষার-মূর্ছায়।
নভচারী হিমজাল শুভ্রশয্যা রাখিয়াছে পেতে
অতিদূর কাশ্মীরের উপত্যকাজাত কোন জাফরান ক্ষেতে ॥৪৮

তারপরে একদিন মাঠে মাঠে বিস্তারিয়া পাখা
স্বর্ণ-ঈগলের মত উত্তরিল আশ্বিনের আলো ;
শেফালির স্বপ্নে যবে দিনান্তের ক্লান্ততন্দ্রা মাখা,
শ্যামায়িত বনাঞ্জনে দিগন্তের আঁখি হ'ল কালো।
পূরন্ত নোনার দল অলক্ষিতে হতেছে শাঁসালো,
ফাটন্ত আতার ফলে লক্ষধারে বিগলিত ক্ষীর।
দিগ্‌বিজয়ী সম্রাটের অসিপ্রায় চমকে ধারালো
বর্ষার বিগতক্লেদ নদীস্রোত ব্যাপি দুই তীর।
হেমন্তের ধান্যশীর্ষে গোপনে শস্যের রস হতেছে নিবিড় ॥ ৪৯

"চল সখী যাই দোঁহে কমলার মধু অন্বেষণে ;
রাখাল বালক যেথা আপনার ছায়ামাত্র সাথী
অকাতর দুঃসাহসে পশে গিয়ে ঘনতর বনে,
যাবো সেথা ; যাবো সেথা দুই জনে যেথা নামে রাতি
প্রচুর পল্লবতলে কুসুমের তারাপুঞ্জে মাতি।
যৌবনমাধুর্যরসে সুদুঃসহ পয়োধর প্রায়
বিপুল মধুর চাকে শত লক্ষ মধুমক্ষী পাঁতি
ঝিল্লী-ঝনকিত-সুর বনদেবী বন্দনসভায়
বিনোদ বেহাগে যেথা অকারণ গুঞ্জনের খঞ্জনী বাজায় ॥" ৫০

চাক ভাঙি দুইজনা মধু আনে অতি সযতনে,
নবপত্রপুট রচি স্বর্ণমধু করে দোঁহে পান।
মধুর লালিমা লাগে মহুয়ার নয়নের কোণে
মধুবিহ্বলতা ভরে মূর্ছনায় ভরা তার প্রাণ।
মধুর আবেশরসে অকলঙ্ক চাঁদের বয়ান,
মধুর ধরণীতল, মধু ক্ষরে দিগ্‌বলয় হ'তে,
মধুমক্ষী তারাদল মধুব্রত করিতেছে গান।
দুইজনে ভেসে যায় মধুস্রাবী জীবনের স্রোতে
সর্বমধু সিন্ধুমুখে মধুগন্ধী মধুচ্ছন্দী কাননের পথে ॥ ৫১

পরীর দীপালিলগ্নে প্রজ্বলিত নীল নভস্তরে
কাননে কাননে পাকা কমলার আরক্ত গোলক ;
নীবীচ্ছেদী ব্যগ্রতায় কে লিখিল বনে বনান্তরে
কিংশুকের নখক্ষতে বাসনার বহ্নিময় শ্লোক !
তুঙ্গ চূতমঞ্জরীতে প্রণয়ের প্রদীপ্ত পুলক ;
শাল্মলী রঙ্গনে রাঙা দিগ্বধূর নয়নের কোণ ;
অধর-আসবগন্ধ-উন্মাদনে প্রমত্ত দ্যুলোক !
অসহ্য প্রণয়োচ্ছ্বাসে দাড়িম্বের হিয়াবিদারণ,
ঝরে ঝুরু ঝুরু দানা, কানে কানে প্রেমাবিষ্ট ভাষার মতন ॥ ৫২

আদিম দম্পতীসম ভ্রমে তারা কাননকান্তার,
বসন্তের ফুলে ঢাকা গুপ্তরেখা পদচিহ্ন ভুলি ;
নন্দন কাননে শোনা কুহুধ্বনি আনে বারম্বার
যুগান্তের লুপ্তপথে চিত্ততলে স্মৃতির গোধূলি ;
যে সঙ্গীতে রাজকন্যামানসের বাতায়ন খুলি
অলক্ষ্য পুলকে জাগে ; যে সঙ্গীতে মৌন ছায়াপথ
শেষ রহস্যের পানে বিস্তারিয়া বিরাট অঙ্গুলি ;
যে সঙ্গীতে রূঢ় মর্ত দেখা দেয় যেন সত্যবৎ—
উর্বশীরা ছিল যেথা, রবে যেথা, যতদিন থাকিবে জগৎ ॥ ৫৩

ত্রিপুররুধিররক্ত মাহেশ্বর ক্লান্ত শিঙাসম
কলাশেষ কান্ত চন্দ্র অনাদৃত দিগন্তে লুটায় ;
মন্দাকিনীতটতলে কেলিশ্রান্ত হংসপক্ষোপম,
উত্তরসমুদ্রকূলে চিত্রবর্ণ স্বচ্ছশুক্তিপ্রায়,
নিঃশব্দ নীরব শশী পরিত্যক্ত নভপ্রান্তে হায় !
শচীর দর্পণসম পৌর্ণমাসী, সেও একদিন
ক্ষয়ক্ষীণ, আমলিন, আন্দোলিত জোয়ার-ভাটায়।
সুধার আধার চন্দ্র শুধিবারে অদৃষ্টের ঋণ
অমাবস্যা অন্ধকারে নিঃশেষিয়া আপনারে করি ফেলে লীন ॥৫৪

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না চন্দ্র অভিশপ্ত ধূলি ধরণীর,
এ মাটির পানপাত্রে আছে শুধু অস্তিত্ব অগাধ,
অশ্রু-ইতিহাস বহে হেথাকার প্রতিটি শিশির,
হেথা অশ্রুপারাবারে স্মিতহাস্য বালুকার বাঁধ,
তোমার অমর স্বর্ণে মিশাইবে অতৃপ্তির খাদ।
উদ্যত চুম্বন হেথা কেড়ে লয় শোকের শকুন,
চিররুদ্ধসিংহদ্বার হেথাকার স্মৃতির প্রাসাদ,
হাসিমিশ্র অশ্রু-গড়া ইন্দ্রচাপে পরাইতে গুণ
মরীচি মিলায় হাতে ধিক্কারিয়া হতভাগ্যে ! কি ব্যঙ্গ নিপুণ॥ ৫৫

প্রেম কাঁদে একাকিনী বাসরের ফুলশয্যালীনা ;
রূপ সে বিদায়লগ্নী, অবিরাম অধরে অঙ্গুলি ;
জীবনের দণ্ডপল ঝরে যেন মাল্যসূত্র বিনা ;
আশার দিগন্ত হতে অকস্মাৎ যবনিকা তুলি
ধেয়ে আসে আপিঙ্গল শ্মশানের ভস্মশেষ ধূলি।
যেথায় কলহ চির অন্তরের ভাবে ও ভাষায়,
একের ইঙ্গিত কভু আর জন নাহি দেখে খুলি।
যেথা সুখ লভ্য শুধু একমাত্র সুখের আশায়,
সেথা ফিরাবো না আর কোনদিন স্বপ্নপ্রাণ চাঁদ-মহুয়ায় ॥ ৫৬

তার চেয়ে থাক তারা বাস্তবের দিগন্তের পারে,
বসন্ত জানে না যেথা বৈশাখের আতপ্ত অনল,
নিত্যপুষ্প বৃক্ষ যেথা অবনত মঞ্জরীর ভারে,
চন্দ্র যেথা রাহুহীন, বিষহীন মধুমক্ষীদল,
উৎসারিত কণ্ঠে যেথা বিহঙ্গের সঙ্গীত তরল।
প্রেম আর রূপ যেথা চিরকাল চলে হাতে হাতে,
আপন স্বভাব ভুলি হেসে ওঠে নয়নের জল,
বিচ্ছেদ না ঘটে যেথা কোন দিন বাঞ্ছিত বাঞ্ছাতে,
সেথা তারা থাক দোঁহে পুরূরবা উর্বশীর থাক সাথে সাথে ॥ ৫৭

১৯৩৪

দস্যু কেনারামের মুক্তি

জালিয়া হাওরে যেথা দস্যু কেনারাম
অবিরাম হানা দেয়, শুনে যার নাম
শিহরে গাঁয়ের লোক ; সন্ধ্যাবেলা ছেলে
কেনার কাহিনী শুনে মাতৃস্তন ফেলে
অচিরে ঘুমায়ে পড়ে ; রাখাল বালক
মাঠ হতে ফিরে আসে দিনের আলোক
না নিভিতে থামাইয়া চকিত বাঁশরী ;
সারা রাত্রি শূন্য মাঠ রিক্ত থাকে পড়ি।
যদি কোন হতভাগ্য বিদেশী পথিক
এ ধারে একাকী আসে ভুলে গিয়ে দিক্,
তাহার করুণ স্বর কেনার গর্জনে
মিশে গিয়ে ভেসে আসে প্রতিধ্বনি স্বনে ;
জাগ্রতেরা শোনে ভয়ে, নিদ্রিতেরা জাগে,
গোয়ালে যে অতিথি সে ভয়ে ভয়ে মাগে
ঘরের আশ্রয়।

মাঠের পশ্চিম ধারে
ক্রোশদীর্ঘ শরবনে সোমেশ্বরীপারে
কেনার বসতি হোথা। লয়ে দলবল
জাগে কেনা অবিরাম শিকারচঞ্চল ;
না মানে আইন কোন, না মানে বিচার,
জালিয়া হাওর এই রাজত্ব কেনার।
কালবৈশাখীর মেঘ যথা আচম্বিতে
দিগন্তের ধার হ'তে আসে ছিঁড়ে নিতে
ধরণীর স্নেহ-অন্ন, তেমনি কেনার
দলবল ছুটে আসে তুলে হাহাকার
নিরীহ পথিক পরে ; একটি লাঠিতে
সুদীর্ঘ সরল দেহ শায়িত মাটিতে
অন্তিম নিশ্বাস ত্যজি। লয়ে টাকা কড়ি
শরবনে পুঁতে রাখে ঘড়া ভরি ভরি।
বিগলিত মাংস ভেদি (গেলে কিছুকাল)
বাহিরায় হাস্যপাণ্ডু বিশীর্ণ কঙ্কাল।
জীর্ণ সে কঙ্কাল ঢাকি (কিছুকাল পরে)
আগাছায় ফুলদল জাগে থরে থরে।

কেনারে দেখেছে কেহ! কে হেন সাহসী
যে দেখেছে ফেরেনি সে। ঘনকৃষ্ণ মসী
গড়াইছে সর্ব অঙ্গে ; দুই সারি দাঁত
নরকের বাতায়নে যেন রে গরাদ ;
মাঝখানে কাটা ভুরু, যেন আছে পড়ি
ভগ্ন হরধনুখানা ; গোঁফ এক তাড়া ;
রোমশ নাসাগ্র, যেন কল-পড়া খাঁড়া।
সব শুদ্ধ মিলি যেন মূর্তিমান্ রাহু
সাবল-সবল দুই লক্ষঘাতী বাহু।

একদিন সেথা সেই জালিয়া হাওরে
জগন্নাথ গায়েনের দল গান ক'রে
গ্রামান্তরে যায়। হেনকালে অকস্মাৎ
নির্মেঘ আকাশ হ'তে যেন বজ্রপাত,
শরবন হতে আসে দস্যু কেনারাম,
দেখিয়া গায়কদের ছোটে কালঘাম!
শুধু জগন্নাথ স্থির, আর মেয়ে তার;
অন্যেরা কম্পিত সবে হেরিয়া কেনার
গল্পে-শোনা আকৃতি সে। কহে জগন্নাথ—
"নিরীহে মারিয়া কেন মিছে তুই হাত
কর পাপে কলঙ্কিত! মোর নাহি ধন,
পতঙ্গ বধিয়া কেন পাপ অকারণ
করিতেছ হে অজ্ঞান!" এ বাক্য শুনিয়া
কেনার সকল দেহ উঠিল কম্পিয়া
সুবিপুল অট্টহাস্যে; হা হা হো হো রব—
অফুরন্ত উৎস হ'তে শব্দের তাণ্ডব—
যেন তার শেষ নাই। হিমানীস্খলনে
বিশাল তুষারস্তূপ ভীষণ গর্জনে
সবেগে নামিল যেন শৈল-শিখরের
ক্রমনিম্ন ধাপে ধাপে। চূর্ণ বরফের
অতিসূক্ষ্ম উত্তরীয় সে হাস্যছটায়
মুহুর্মুহু উদ্ভাসিত। উন্মাদের প্রায়
হাসে কেনা, সঙ্গীদের ডাক দিয়ে বলে—
"ওরে মধু, ওরে রামা, না জানি কি ছলে
কে আজি ছলিতে এল! শোন্ উপদেশ!
কারে বলে পাপ, পুণ্য, হিংসা, ক্রোধ, দ্বেষ,
জানিস এসব কথা, শুনেছিস্ কভু—
আরো যদি থাকে কিছু খুলে বল প্রভু!"

এত বলি কেনারাম পুনরায় হাসে,
সঙ্গীদল যোগ দেয় অত্যুচ্চ আভাসে।
কর জুড়ি কহে কেনা—"গোসাঁই ঠাকুর,
অধমের মায়া মোহ কর আজি দূর
পেয়েছি সাক্ষাৎ যবে!" বলে কত শত
এমন বিদ্রূপ-বাক্য; বৃদ্ধ থতমত
নাহি বোঝে ভাব তার। গর্জিল সহসা
অতি ক্রোধে কেনারাম, মেঘ হতে খসা
বজ্র যেন উঘারিল, বলে—"আন খাঁড়া,
এতই সাহস যদি বুক বেঁধে দাঁড়া
কেমন সাহস দেখি"—খড়গহস্ত কেনা
একাই একশ' যেন নারায়ণী সেনা।
বলে স্তব্ধ জগন্নাথ—"যদি বধিবেই,
একটু সময় দাও, শেষ বার সেই
ইষ্টে স্মরি"; এত কহি খুলে দিয়ে প্রাণ
জগন্নাথ বেহুলার গাহিল ভাসান।
সঙ্গে তার গাহে গান অঞ্জনা নন্দিনী,
মেনকার নৃত্যলঘু কনক-কিঙ্কিণী
বাজে যেন কণ্ঠে তার; বৃদ্ধের উদার
উদ্বেলিত সুর-স্রোতে ভাসিছে কন্যার
সুরের ময়ূরপঙ্খী; খাদে ও নিখাদে
মিলায়ে কাতর কণ্ঠে যেন আজি কাঁদে
অনাথা বেহুলা হায়!—বেহুলা কাঁদিছে,
ঘাটে এসে সাতভাই ফিরিতে সাধিছে—
ফিরে যাও, ওরে ভাই, ছাড়ো আশা মম,
সোনার যৌবন মোর স্বর্ণচুড়ি সম
খসিয়া পড়েছে! কাঁদে বেহুলা রূপসী,
আলুলিত সুরজালে পড়িতেছে খসি

সদ্য-বিধবার কেশ! পিতা-পুত্রী গাহে—
অভিশপ্ত বেহুলার অশ্রু অবগাহে
করুণ প্রকৃতি যেন; আকাশের পাখি
সুদূর কুলায় হ'তে সাথীদের ডাকি
বসিল নিকটে এসে; কীট ধরণীর
হিংসা ভয় ভুলে গিয়ে করে সেথা ভীড়;
কাঁদে জগন্নাথ, আর কাঁদিছে অঞ্জনা,
ভয় ভুলি কাঁদিতেছে সঙ্গী কয় জনা।
কেনার মিলালো হাসি; বিদ্রূপতরল
শুষ্ক চোখে দেখা দিল বিন্দু বিন্দু জল।
চোখে হাত দিয়া কেনা চমকিয়া ওঠে
জল এল কোথা হ'তে! শতধারে ছোটে
যত সে চাপিতে চায়! নিজ অশ্রু-নদে
অতর্কিত কেনা আজি পড়িল বিপদে;
হাঁসফাঁস করে যত ততই ডুবিছে,
আপনার সনে হায় যুদ্ধ করা মিছে।
ফেলিল হাতের খাঁড়া, নোয়াইল মাথা,
বৃদ্ধের ধরিয়া পদ বলে—"জন্মদাতা
তুমি মোর দীক্ষাগুরু—বাঁচাও আমারে,"
এত বলি কেনারাম হানি অঞ্জনারে
বারেক বিরক্ত চোখে—পিপাসার্ত প্রাণে
ছুটে চলে গেল দ্রুত দিগন্তের পানে।

তার পরে বহুদিন, গত বহু কাল;
দেশে দেশে ফেরে কেনা হৃদয়ে কাঙাল,
ভিক্ষাভাণ্ড সম্বলিত, নানা তীর্থে ভ্রমে;
কেনার সিদ্ধির খ্যাতি প্রচারিত ক্রমে

জালিয়া হাওরে এসে ; যে গাছের তলে
মানুষ মারিত কেনা, পূজাপুষ্প ছলে
নির্মাল্য জমিল সেথা ; বানাইল বেদী ;
একদা উঠিত যেথা আর্ত মর্মভেদী
করুণ কাতর স্বর, সেথা সন্ধ্যাকালে
জমিত গাঁয়ের লোক খোল করতালে
দিগন্ত মুখর করি ; পুণ্যভিক্ষু এসে
সে স্থানের ধূলা লয়ে মুখে বেশে কেশে
মাখিত মিটায়ে সাধ।

জগন্নাথ গত।

অঞ্জনা নন্দিনী তার জীবনের ব্রত
মানিল সে বেদীতলে ; সেথা একমনে
করে পূজা, করে ধ্যান, করে কৃচ্ছ্র তপ,
না মানে মাঘের শৈত্য, চৈত্রের আতপ,
আলস্য, বুভুক্ষা, নিদ্রা ; গাঁয়ের লোকের
হ'ল সে মায়ের মত ; অসহ্য শোকের
সান্ত্বনার শেষ স্থল ; একান্ত সুখের
নিঃস্বার্থ পরম অংশী ; শেলার্ত বুকের
বিশল্যকরণী সমা ; হইল অঞ্জনা
সুখেদুঃখে সবাকার আপনার জনা ;
ইষ্টদেব হ'ল তার সিদ্ধ কেনারাম,
জপের আনন্দ আর চিত্তের আরাম।

এদিকে ফিরিছে কেনা তীর্থে পীঠে পীঠে,
মনের অজ্ঞাত ক্ষুধা যদি হায় মিটে
দেবতার অনুগ্রহে। ক্রমে শিরে তার
বয়সের চিহ্ন বহি জমিল তুষার,

বলিত সকল চর্ম্ম, চিত্ততলে তবু
অনির্বাণ অগ্নিস্রোত নিভে নাই কভু।
তুষাররাশির নিম্নে আগ্নেয়-পর্বত
বহু যুগ নিশ্চপল থাকে স্থাণুবৎ,
সবাই ভুলিয়া যায় তাহার বিক্রম,—
অকস্মাৎ একদিন ভেঙে যায় ভ্রম,
আগ্নেয় সে অজগর শত জিহ্বা মেলি
তুষার-অসাড় কন্থা তুচ্ছ করে ফেলি
বাহিরায় লক্ষ স্রোতে ; পশু পক্ষী প্রাণী
নির্ভর-নির্ভয় যেথা ছিল শান্তি মানি,
প্রলয়পুচ্ছের তেজে হয় আত্মহারা,
হিমগিরি দেয় যবে অগ্নিমন্ত্রে সাড়া।
সেই মত হ'ল তার সমস্ত প্রকৃতি,
উঠিল বিদ্রোহ করে, যা কিছু সুকৃতি
জমেছিল এতদিনে গেল সব বহে
নিম্নমুখা আকর্ষণে প্রলয়-আগ্রহে।
কাঁদিল একাকী কেনা ; চিত্ততলে তার
অবিরাম দ্বন্দ্ব যেন দৈত্য-দেবতার,
সে শুধু নির্বাক্ দ্রষ্টা ; সে নির্বাক্ শ্রোতা,
হৃদয়বহ্নিতে তার দুইজন হোতা
দেব দৈত্য ; নাহি বোঝে কিবা তার ক্ষুধা
সে কি জানে এ সংসার দেয় স্বর্গসুধা
নিতান্ত মাটির পাত্রে! গেল বৃন্দাবনে,
কৃষ্ণ-পদাবলী-মাখা বনে উপবনে
মাঠে মাঠে কুঞ্জে কুঞ্জে মন্দিরে মন্দিরে
দিন নাই রাত্রি নাই একা একা ফিরে
ভক্ত গেল পিছে জুটে চায় পদধূলি।
বুঝিতে পারে না কেনা তাহাদের বুলি,

ভক্তদের ভক্তি দেখে হাসে উচ্চস্বরে,
ততই সবাই তার পা চাপিয়া ধরে।

একদিন রাত্রি যবে ঝিল্লিত গভীর
একাকী চলিল কেনা কৃষ্ণের মন্দির ;
নিঃশব্দে খুলিল দ্বার, আধো আলো-আঁধা
দেখিল শ্রীকৃষ্ণ আছে, পাশে নাই রাধা ;
সেথায় দাঁড়ায়ে আছে রাধাখ্যাতি জিনি
জালিয়া হাওরে-দেখা অঞ্জনা নন্দিনী।
প্রলয় বিদ্যুতাভাসে শেষবার তরে
সমগ্র পৃথিবী যথা চক্ষে ধরা পড়ে,
তেমনি বুঝিল কেনা ; ঈর্ষায় জর্জর
কৃষ্ণের গালেতে এক মারিয়া চাপড়
উর্ধ্বশ্বাসে কেনারাম ত্যজি বৃন্দাবন
জালিয়া হাওর পানে করে পলায়ন।

শরাহত মৃগ যথা আপন শোণিতে
মৃত্যুর পদাঙ্ক আঁকি ছুটিতে ছুটিতে
যায় সরোবর পানে, সেইমত কেনা
অবিশ্রাম ছুটে চলে, মুখে ঝরে ফেনা,
রক্তচক্ষু, স্রস্তকেশ, গাত্রে বহে ঘাম,
ছিন্নবাস, অঙ্গ ক্ষত, অঞ্জনার নাম
বারম্বার আবর্তিয়া—সজনে নির্জনে।
পশ্চিমেতে নীড়মুখী হাঁসের তোরণে
সন্ধ্যা আসে ; যমুনার বালুশয্যা পরে
শ্যামায়িত তরমুজ বাড়ে থরে থরে ;
চাষী করে চাষ, সেথা হলদীর্ণ মাঠে
কচি তৃণাঙ্কুর যেন নব কাব্য পাঠে

ধরার রোমাঞ্চ ; প্রাতে শিশিরের লিখা—
উর্বশীর পত্রী যেন অশ্রু-অক্ষরিকা।
সূর্য ডোবে অস্তগিরি নিকষের পরে
স্বর্ণের পরখ-রেখা টানি স্তরে স্তরে
শচীর ভূষণ লাগি ; ওঠে সন্ধ্যাতারা
চাঁদের উত্তরী ধরি ; যমুনার ধারা
ভূপতিত নভখণ্ড, দেখে তার মাঝে
স্বর্গের সকল স্বপ্ন সত্য হ'য়ে রাজে।
ধায় কেনা, লোকে ভাবে এ কোন্ পাগল,
কেহ দেয় ধূলা-বালি, কেহ খাদ্য, জল ;
শুধালে দেয় না সাড়া, নাহি বলে নাম,
নিজেরে করিয়া তাড়া ছোটে কেনারাম।

পাতা-ঝরা শীত গেল। উঠিল নিশ্বসি
অগাধ অরণ্যতলে আদিম উর্বশী
পল্লবের মর্মরণে ; ফুলের চিকণ
চারুচ্ছবি যেন স্বরলিপির লিখন,
যে-সঙ্গীত ধরণীর চিত্তে আছে, হায়,
কণ্ঠে যা কুণ্ঠিত হয়ে নাহি মূর্তি পায় !
ভাবে কেনা একদিন ছাড়িয়াছি যারে
সে-ও কি তেমনি আছে ! হৃদয়কিনারে
অবিকল জাগে তার পদাবলী স্তর !
হায় কেনা, সে মৃত্তিকা হয়েছে পাথর।
যে-পদাঙ্ক একদিন প্রণয়কোমল
কালক্রমে রচে তাহা পাষাণ-শৃঙ্খল ;
হৃদয়ের ভেলা লয়ে তরিতে সাগর
অশ্রুর গোষ্পদ মাঝে ডুবে মরে নর।

ভাবে কেনা মনে মনে সেও আছে স্থির ;
পড়ে নাই বলিচিহ্ন মুগ্ধ প্রকৃতির
কপালে কপোলে অঙ্গে ! তারি কেন তবে
নি-খাদ মুকুরপট কলঙ্কিত হবে !
হায় কেনা, প্রকৃতি যে পার্থ সব্যসাচী,
অক্ষয় তূণীর তার, তাই আছে বাঁচি,
লক্ষবার ফেরে তার অনন্ত যৌবন ;
তোমার একঘ্নীশর, একটি জীবন।
ছুটে চলে যায় কেনা—ইক্ষুক্ষেত হ'তে
ঝাঁক বেঁধে চক্রাকারে ওড়ে বায়ুপথে
চড়ুয়ের দল যত পদশব্দে তার ;
ঊর্ধ্বনভে শঙ্খ-চিল শ্বেত বিন্দুসার।
শীতের প্রভাতে ওঠে সরোবর বুকে
কুয়াশার মলমল মায়াবীর মুখে
মুগ্ধ জাদুমন্ত্র সম ; শরৎসন্ধ্যায়
শিশিরিত চষা মাঠে বাষ্প ভেসে যায়
নিঃশব্দ শ্বসিত স্তব ; বহে কল কল
শীতে গ্রীষ্মে পুণ্য গঙ্গা মৌক্তিক-ধবল।
কখনো বা ভেদ করি রজনীর তম
দিগন্তরে দিগ্‌গজের বক্র দন্তোপম
শশাঙ্ক উদয় ; দূর কৃত্তিকা মণ্ডল
পরাগপাটল-পক্ষ ভ্রমরের দল।
ক্রমে পঁহুছিল কেনা ব্রহ্মপুত্রপারে।
বন্ধুর দুর্গম পথ পাহাড়ে পাহাড়ে,
শ্বাপদে সঙ্কুল, আর অরণ্যে ভীষণ,
একমাত্র শব্দ যেথা পশুর গর্জন
শ্রবণ বধির-করা ; নিম্নে জলা দেশ—
কেনার তীর্থের পথ হয়ে এল শেষ।

অঞ্জনারে বলে কেনা—"অনেক ঘুরিয়া
তীর্থে তীর্থে দেশে দেশে বুঝিয়াছি প্রিয়া,
সব চেয়ে প্রেম বড়, সর্বশ্রেষ্ঠ ডোর।"
সুধীরে অঞ্জনা বলে—"প্রভু, তুমি মোর
ইষ্টদেব, বহু পুণ্যে পেয়েছি সাক্ষাৎ,
সর্বদা বাঞ্ছন মোর লহ প্রণিপাত।"
"দূর হোক প্রণিপাত, বক্ষে চাই তোমা,
সকল তীর্থের সার পুণ্য-তিলোত্তমা,
জুড়াক এ বক্ষপট।"

"সেঁচি অশ্রুজল
করিব তোমার দুটি চরণ নির্মল
পঙ্কিল কর্দম ধুয়ে।"

"চিত্তে মোর হায়
যযাতি-অতৃপ্তি বহি প্রেম যে শাসায়
তৃষ্ণার আসব লাগি।"

"দুঃস্বপ্ন সমান
এ কি অমঙ্গল কথা!" ঢাকে দুই কান
অঞ্জনা দুইটি হাতে।

"দুঃস্বপ্নই বটে,
তা না হলে সর্বনাশী তোরে সর্বঘটে,
জলে স্থলে, চিত্ততলে, সর্ব দুঃখসুখে,
নভ-প্রান্তে কি দিগন্তে, রাধিকার মুখে,
কেন বা দেখিতে পাব!"

"ছি ছি এ কি ভাষা!"
"মুক্তির প্রার্থনা নাহি—চাহি ভালবাসা।"
একজন বলে প্রিয়া, আর জন প্রভু,
কেহ কারো মনোভাব নাহি বোঝে কভু।

ভাবে কেনা—এরই লাগি বিদ্ধমৃগ প্রায়
ফিরিয়াছি দিবা নিশি তীর্থে তীর্থে, হায়,
স্বপ্নের সাধনা করি! শব্দভেদী বাণ
নির্নিমেষে যে-লক্ষ্যেতে করেছি সন্ধান
এই কি স্বরূপ তার! মিথ্যা মিথ্যা সব!
জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রেতের উৎসব।
ভাবিছে অঞ্জনা—হায়, সমগ্র জীবন
যাহার চরণ লাগি করেছিনু পণ,
এই কি পাষণ্ড সেই! পাষণ্ড নাস্তিক,
সকলি বৃথায় গেল ধিক্ শত ধিক্!
হায় কেনা, জান না কি জীবনের গতি
নিক্ষিপ্ত শরের মত, অবাধ্য সে অতি,
ছুঁড়িলে না ফেরে আর, নাহি ছাড়ে পথ,
তূণীরে ফেরে না কভু ক্ষিপ্ত মনোরথ।
কোমল মৃত্তিকা দিয়ে গড়া মূর্তিখান
অদৃষ্টের পরিহাসে হয় সে পাষাণ!
মানবী অঞ্জনা ক্রমে হয়েছে মর্মর,
প্রণয়ের কোন চিহ্ন নাহি মর্মে ওর,
আছে শুধু শুভ্র দীপ্তি, আছে কঠোরতা,
পাষাণে কে দেখিয়াছে রক্তের মত্ততা!

হাত ধরিবারে কেনা ছুটে যায় বেগে—
"পাষণ্ড নিলর্জ তুমি"—বলে নারী রেগে!
পাষণ্ড, পাষণ্ড—যেন গুপ্ত শিলা পরে
সবেগে লাগিল তরী; কাঁপে ক্রোধভরে
কেনার সকল দেহ; ওই শব্দে যেন
অতীতের গুহা হতে শত সর্প হেন

চাপা-পড়া কেনারাম আসিয়া বাহিরে
পুনরায় দাঁড়াইল সোমেশ্বরীতীরে।
কেনা ভাবে জীবনের এ কি বিপর্যয়!
যখন আছিনু দস্যু নাহি ছিল ভয়
পাপ পুণ্য শাসনের; দিন হ'তে দিনে
চলেছে অস্তিত্ব মোর ধর্মাধর্ম বিনে;
কর্দমে আছিনু লিপ্ত তবু জানি নাই
কাদা ব'লে। ভ্রূক্ষেপেও ভুলে মানি নাই
ইহকাল ছাড়া কিছু। কোন্ দৈত্য হায়
টানিয়া আনিল মোরে স্বর্গের সীমায়!
স্বর্গ তবু বহু দূর! দেখিতেছি ওই
অপূর্ব সুমেরুপ্রভা নিত্য জ্যোতির্ময়ী,
তবুও পশিতে নারি! শুনিতেছি কানে
নারদের বীণাধ্বনি চিত্তে বাণ হানে,
তবুও পশিতে নারি! পেতেছি দেখিতে
ইহকাল-তৃপ্ত সবে আছে তুষ্ট চিতে,
তবুও ফিরিতে নারি! এই ত নরক,
একান্তে ধরিত্রী আর দিকে স্বর্গলোক!
একদিকে অনায়ত্ত পরম নির্বাণ,
আর দিকে পরিত্যক্ত ঐশ্বর্য মহান্;
একদিকে অনায়ত্ত সন্তোষ চরম,
আর দিকে পুঞ্জীভূত জীবন-কর্দম,
একদা শান্তির স্থল! এই ত নরক,
স্বর্গমর্ত্যসীমান্ত এ প্রায়শ্চিত্ত-লোক!

ভাবে কেনা, কাঁপে নারী। সহসা কেনার
পড়িল সকল ক্রোধ স্তব্ধ অঞ্জনার

পরে ; "ওরে মূর্খ নারী, নিশ্চেষ্ট পাষাণ,
তোমারি নিকষ-পটে দিয়েছিনু শাণ
আমার একঘ্নী অস্ত্রে—দেখ সেই শর
সুদীর্ঘ পিপাসা সহি কেমন প্রখর।"
এত বলি দস্যু কেনা ধরি অঞ্জনারে
দৃঢ় বলে কণ্ঠ চাপি শ্বাস রুধি মারে
চক্ষের পলকপাতে! তারপরে ধীরে
ঝাঁপায়ে পড়িল গিয়ে সোমেশ্বরীনীরে॥

১৯৩৬

মলুয়া

সাত ভাই দাঁড় টানে,
বোন ধরে হাল,
উড়ে চলে ছিপখান ;
ফুলের জাঙাল,
ফুলের জাঙাল ভাঙে,
খাগড়ার বন,
সাত ভাই দাঁড়ে ব'সে,
হালে ব'সে বোন।
হালে বসে ফিরে চায়,
'কেন ফিরে চাও ?'
সভয়ে মলুয়া বলে—
'কাজিটার নাও'।
'টান্ জোরে হাঁইয়োরে,
জোরে ফেল্ দাঁড়,
আরো জোরে হাঁইয়োরে!'
বিলের বাহার,

বিলের বাহার যত
কুমুদের কুঁড়ি
চাপা দিয়ে চলে নাও ;
ভয়ে যায় উড়ি,
ডাহুক উড়িয়া যায়,
চাপা-পড়া হাঁস ;
দু'ধারে নুইয়া পড়ে
কমলের রাশ।
কমলের রাশি আর
খাগড়ার বন,
সাত ভাই দাঁড় টানে,
হালে ব'সে বোন।

'এই যদি মনে ছিল,
আরে শয়তানী,
তবে কি শিকারে আসি,
আগে যদি জানি!
আগে যদি জানি তোর
মনে এত রিষ,
তীরের ফলার চেয়ে
মনে বেশি বিষ!
হেসে বলেছিলি তুই,
কাল হবে বিয়ে,
আজ চল, ফিরে আসি
শিকারেতে গিয়ে।

বাহবা নিশানা তোর,
আচ্ছা ডাহুক,
এ ফোঁড় ও ফোঁড় মোর
করেছিস বুক।'
এত বলি টানে কাজি
বুক হ'তে তীর,
ঝলকে ঝলকে পড়ে
বল্‌কা রুধির।
'ডাহুক শিকারে এনে
ধলায়ের বিলে,
লুটে নিয়ে গেল তোরে
সাত ভাই মিলে।
গোপনে খবর দিলি,
আরে শয়তানী,
মনে মুখে এত ভেদ
আগে যদি জানি!
থামা দাঁড়, ছাড় হাল,
পলাতক ওরা,
বুক হ'তে টেনে তোল
তীরখানা তোরা।'

ওপারে ডুবিছে রবি
বিন্দু-বিলীন,
এপারে হাঁসের দল
হ'য়ে আসে ক্ষীণ।
ধাপে ধাপে স্বর তুলে
ডাকে উৎক্রোশ,

পলাতক তরীখান
গেছে বহু ক্রোশ।
হাতে নিয়ে বেঁধা-তীর
তাকায়ে ফলায়—
'নিজেরে দেখিনু আজি
যম-আয়নায়;
জানি জানি পাপ এটা
সকলেই মানে,
নারীর হাসির দাম
কয় জনে জানে!
জীবনের বাটখারা
একদিকে তার—
বেহস্ত্ ধরণী এনে
রাখো আল্লার,
হারুণল রসিদের
রাখো সব ধন,
আর দিকে রাখো শুধু
যুবতীর মন।
ছিঃ ছিঃ পাপ, ডাকে যম,
দোহাই খোদার
পারি না ভুলিতে তবু
হাসিখানি তার।
হাতে ধরে নিয়ো তুমি,
হায় ভগবান!
আহা কি ডালিম-ফাটা
তার হাসিখান
করে দে নমাজ-মুখ ;'
ভাবিল সবাই

সুবুদ্ধি হয়েছে বুঝি,
আল্লা দোহাই।
'ওই পথে গিয়েছিস,
আরে শয়তানী,
সেই পথে যাক প্রাণ,
আগে যদি জানি!'
ঢলিয়া পড়িল কাজি
বুকে গুঁজে তীর,
পাপ ভয়ে হিম হ'ল,
সবার শরীর।

১৯৩৩

অকুন্তলা

বোম্বে মেল ছুটিয়াছে ; দ্বিতীয় শ্রেণীর
গদি পরে বসে আছি ; গাড়ি ধায় তীর-
বেগে ; কর্কশ হুইস্‌ল্ শব্দভেদী বাণে
বর্ণমূক আকাশের মর্মে গিয়ে হানে
মুহুর্মুহু ; সঙ্গীহীন বসে বাতায়নে
বাহিরের পানে চেয়ে আছি অন্যমনে।
হঠাৎ ধরণী যেন হয়েছে তরল !
মৃত্যুমুখী স্রোত তার ছোটে অবিরল
প্রলয়নিশ্বাস লভি—গাছপালা, বাড়ি,
নদীনালা, খালবিল, খেজুরের সারি,
ধানক্ষেত, কচি আখ, কৃষাণ, লাঙল,
বোঝাই গরুর গাড়ি, আপক্ক ফসল,
ধূম্র-অনুমান পল্লী, নভে শঙ্খচিল,
আধডোবা শরবন, কমলিত ঝিল,
সর্পিল দিগন্তরেখা চলে গুটিগুটি,
হুস্ করে ছুটে যায় টেলিগ্রাফ-খুঁটি,
এঞ্জিন-উদ্গত বাষ্প রচে ধূমকেতু,
ঝম্‌ঝম্ ঝঙ্কারেতে সাড়া দেয় সেতু—
কর্কশ হুইস্‌ল্-শব্দে ছুটিয়াছে গাড়ি
সৃষ্টির উজানমুখে, লক্ষ্যহীন পাড়ি।
সন্ধ্যা নামে। পশ্চিমের মেঘ ভাঙা-ভাঙা,
সূর্যের ইটের পাঁজা গন্‌গনে রাঙা
অন্তর্লীন অগ্নিতাপে। ক্রমে দুই দিকে
পৃথিবীর শ্যাম নেশা হয়ে আসে ফিকে ;

শালবন, তালবন, মাঠ রিক্তঘাস,
বাঁধের সঞ্চিত জলে ইস্পাত-আভাস,
শুষ্ক নদী, রুক্ষ গিরি। মন্দীভূত গতি,
লৌহমৃদঙ্গের তাল দীর্ঘতর অতি;
বাহিরে ঝুঁকিয়া দেখি—এলো কতদূর?
স্টেশনে পশিল গাড়ি—সীতারামপুর।

যুগপৎ বহু শব্দ—চা, খাবার, জল,
কুলি, কুলি, মিহিদানা, সের কত বল্—
শব্দের মৌচাক যেন ভেঙেছে হঠাৎ!
আমারি গাড়ির দ্বারে একি উৎপাত!
উঠিয়া দাঁড়ানু বেগে, আশা ছিল মনে
সাহেবী পোষাক মোর পড়িলে নয়নে
কুলিটা সরিতে পারে। সে আশা নিষ্ফল,
বঙ্গদেশে সিংহচর্ম একান্ত অচল!
না মানে সাহেবে তারা, না মানে পোষাক;
চটিলাম বাঙালীর দুঃসাহসে। যাক্,
খুলিল গাড়ীর দ্বার; অন্য দিকে চেয়ে
রহিলাম বসে। ধিক্কারিনু স্ত্রীশিক্ষায়—
একাকিনী এরা সব কেন আসে যায়!
আবার ছাড়িল গাড়ি। কাম্‌রার ওধারে
বসিল রমণী; আমি প্রান্তরের পারে
দুর্নিরীক্ষ্য আকাশের অন্ধকারমাঝে
একাগ্র রহিনু চেয়ে, যেন হোথা রাজে
জীবনরহস্য মোর; যেন তাহা পাঠ
এখনি করিতে হবে। কত মাঠ ঘাট
রহিল ডাহিনে বামে। ফিরাইতে মুখ
হেরিনু মহিলাটিরে। বাঁ হাতে চিবুক

রাখিয়াছে অন্যমনে ; নীলাভ আলোয়
দ্বিতীয় শ্রেণীর, আর রাতের কালোয়
এ কি অপরূপ মায়া ! যেন চেনা মুখ !
ভদ্রতা করিয়া রক্ষা বারেক উৎসুক
উদ্‌গ্রীব জিজ্ঞাসু নেত্রে লইলাম দেখি।
মায়া কিম্বা মিথ্যা কিম্বা সত্য কিম্বা—একি,
লীলা নাকি ? কোথা হতে আসিল কেমনে ?
আমার বিস্ময় হেরি প্রসন্ননয়নে
(যেন কিছু হয় নাই, বারোটি বছর
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যেন বারোটি প্রহর)
জিজ্ঞাসিল, 'কুশল তো ! আছেন তো ভালো !'
স্মৃতির মন্থনদণ্ডে চৈতন্য ঘোলালো
শুধু ক্ষণেকের তরে। কহিলাম তারে,
'কোথায় চলেছ তুমি ? দেখিনি তোমারে
বহুকাল। ভালো আছ ?'

বারো বছরের
বিস্মৃতির মহারণ্যে অজ্ঞাতবাসের
দীর্ঘ প্রবাসের পরে একি দেখা আজ !
সর্বজয়ী কাল যেন মনে বাসি লাজ
ফণা করিয়াছে নত। সব আছে ঠিক ;
বেদনার শিশিরাশ্রু করে ঝিক্‌মিক্‌,
যায় নি শুকায়ে আজো ; লঘু পদভারে
আনত শ্যামল তৃণ নিজের আকারে
পারে নাই ফিরিবারে। সব স্বপ্নবৎ,
স্মৃতির-পদাঙ্ক-আঁকা পুরানো জগৎ !
সম্বরিনু আপনারে, প্রশংসিনু মনে
স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, নারীজাগরণে।

নহিলে হত কি দেখা! দু-একটি কথা;
ক্বচিৎ হাসির ঘায়ে ক্রমে নীরবতা
দ্বিধা ত্রিধা হতে হতে হইল শতধা!
সে সব ফাটল-পথে (বলি সত্যকথা)
অতি নিম্নে দেখা যায় আগ্নেয় আভাস,
মুহুর্মুহু বাহিরায় বাষ্পীয় নিশ্বাস
এড়ায়ে স্মৃতির মুষ্টি। অধরের হাসি
ইঙ্গিতে জানায়ে দেয় প্রাণে অবিনাশী
রক্ত বহ্নিপুঞ্জ জ্বলে ঝলে পূর্ববৎ।
এই তো জীবন আর এই তো জগৎ।

লীলা কে সে? কে আমার? নাই বলিলাম।
সম্প্রতি সাক্ষাৎ ট্রেনে, যাবে সাসারাম।
যদিও মস্তকে তার রয়েছে গুণ্ঠন,
সীমন্তে সিন্দূর নাই, খুসি হ'ল মন।
তবু নিঃসংশয় নহি, নারী মায়াবিনী,
হয়তো হয়েছে ব্রাহ্ম প্রগতিবাদিনী।
আলাপের ফাঁক দিয়ে মন উড়ে উড়ে
মুক্তপক্ষে চ'লে গেল সেই বহুদূরে—
সব চেয়ে বেশি ক'রে মনে পড়ে তার
অজস্র আলোল পুঞ্জ কুন্তলের ভার।
কভু সে মৌসুমী মেঘ দিগন্ত ব্যাপিয়া
বর্ষণব্যাকুল; কভু বেণীতে বাঁকিয়া
শীর্ণ অসিলতাসম উঠিত কাঁপিয়া
চকিত চিক্কণ; কভু ফুলিয়া ফাঁপিয়া
উথলিয়া উদ্বেলিয়া ডুবাইত কূল,
কালো বৈতরণীবারি; কভু দিত ফুল
খোঁপা ঘিরি, নৈশাকাশে রাশিচক্রসম!

কুন্তলের পটভূমে সে ছিল সতত
মরণের কৃষ্ণপটে জীবনের মত।
বলিতাম, 'লীলা, বাঁধো দেখি খোঁপা আজ
কানাড়ী ধরনে।' বলিত সে, 'আছে কাজ,
পারিব না।' কিন্তু সন্ধ্যাবেলা দেখিতাম
কবরী বৈদেশী ছাঁদে। কভু বা দিতাম
করবীর গুচ্ছ এক, 'পরো লীলা চুলে।'
ভাবিতাম (মিথ্যা কথা), গিয়েছে সে ভুলে !
ভুলিত না। কালো চুলে রক্তকরবিকা,
সায়াহ্নের মেঘে যেন সূর্যাস্তের শিখা
বিচ্ছুরিত। হেন ফুল না ছিল কাননে
আদরে দিই নি তুলে লীলার খোঁপায়।
কী বলিব, ওতেই তো মরেছিনু প্রায়।
সে চুলের ফাঁসে বদ্ধ মূঢ় চিত্ত, হায়,
ঝুলেছে সহস্রবার ! লীলাও জানিত
কী যে দুর্বলতা মোর ; হঠাৎ শাণিত
কাঁচি হাতে বলিত সে, রাগাতে আমারে,
'দেব কেটে পোড়া চুল !' বলিতাম তারে,
'আর যাই পার, লীলা, পারিবে না কভু
কাটিতে ও পোড়া চুল।' শাসাতে সে তবু
ছাড়িত না ; অবশেষে উঠিত হাসিয়া।
অর্থাৎ মনের কথা গিয়েছে ফাঁসিয়া
মোর কাছে।

মনে পড়ে সেদিনের কথা,
ফাল্গুনের তপ্তবায়ে বিমূঢ় মত্ততা
ছায়াদেহী কস্তুরিকামৃগপালসম
উধাও ছুটিতেছিল ; সেই সঙ্গে মম

মুগ্ধ চিত্ত ছুটে গিয়ে করিল প্রবেশ
লীলার কুন্তলারণ্যে ; হারাইনু দেশ,
হারাইনু কাল সেই আদি তমিস্রায় !
যুগপৎ মধু মদ শিশিরের নেশা,
দুঃখের দ্রাক্ষার দ্রব সুরাসার-মেশা
অজস্র সর্পের বেগে স্নায়ুতন্ত্রীপথে
পশিল শরীরে মোর। নিঃশূন্য জগতে
ভ্রমিলাম পথভ্রান্ত পুরূরবাপ্রায়।
বৃথা স্বপ্ন !

অন্যমনা দেখিয়া আমায়
বেঞ্চের নীচেতে নেমে মাথা করি হেঁট
খুলিয়া ফেলিয়া লীলা টিফিন বাস্কেট
সন্দেশ সাজালো প্লেটে দুইচারিখান ;
কহিল সম্মুখে ধরি, 'আগে কিছু খান।'
স্বপ্ন তবে স্বপ্ন নয় ! আবার সংসার
ইন্দ্রধনু দিয়ে বোনা মনে হ'ল, আর
অনুকম্পামিশ্র দয়া ভরিল আমারে ;
ভাবিলাম—ভগবান থাকিতেও পারে !
দেখিলাম, লীলা ধীরে গোছায় জিনিস ;
মন্দীভূতগতি ট্রেন দেয় তীব্র শিস।
'একি, লীলা ?' কহিল সে, 'নামিতে যে হবে।'
আজি কি স্বপ্নের শেষ এইখানে তবে !
কিন্তু তার আগে যদি শুধু একবার
কেবল ক্ষণেক তরে গুণ্ঠনটি তার
খুলে যেত ! অতর্কিতে নামিত সহসা
উপত্যকাপাদদেশে অকস্মাৎ-খসা

প্রচ্ছায় রাত্রির মত নিবিড় কুন্তল!
এত হয়—এইটুকু হবে না কেবল ?—
ব্যস্ততায় মাথা হতে নামিল গুণ্ঠন।
নাই ভগবান আর বলে কোন্ জন!—
কিন্তু একি! চুল এ যে ছোট ক'রে ছাঁটা!
আগ্রীবকুঞ্চিত কেশে ঢেকেছে গ্রীবা-টা!
'একি লীলা, চুল কোথা? কী রকম বেশ!'
কহিল সে, 'ইস্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্
আমি, ছোট ক'রে ছাঁটা সেখানে রেওয়াজ।
ষ্টেশনে থামিল গাড়ি। 'আসি তবে আজ',
কহিল সে নতমুখে। নামাইনু তার
বাক্স শয্যা আদি; গাড়ি ছাড়িল আবার।

৫ অগস্ট, ১৯৩৯

লাল শাড়ি

প্রথমে বুঝি নি আমি, সেও বোঝে নাই;
হৃদয়দোলার পরে অসঙ্কোচে তাই
লালন করেছি তারে; সে শিশুর হাসি,
অসংলগ্ন আধো-ভাষা, অশ্রু রাশি রাশি,
মনে হ'ত নিরর্থক। যবে শুধালাম—
বলিল সে দেবশিশু, প্রেম তার নাম।
চমকি উঠেছি দোঁহে! মানুষের ঘরে
এ কাহার আবির্ভাব? যে লীলার স্রোতে
অবাধে ভাসিল তরী, কোন্ গুপ্তপথে
আনিল সে অন্যমনা; এখানে নিবিড়
হয়েছে জলের বর্ণ; এখানে গভীর

হয়েছে জলের তল ; সমুদ্রের টান
মর্মান্তে যুঝিছে বুঝি প্রতি কাষ্ঠখান
মুমূর্ষু এ তরণীর। যবে শুধালাম—
এ কোন্ অকূল সিন্ধু ? প্রেম তার নাম।
চমকি উঠেছি দোঁহে।

ব্যাপারটা এই—
সংক্ষেপে বলিয়া ফেলি (ধৈর্য বেশি নেই
কর্মরত জগতের), তার সনে প্রেমে
একদা পড়িয়াছিনু। খেলা হতে থেমে
পিছে ফিরে দেখিলাম—খেলা নহে আর,
খেলাঘরে পাতিয়াছি মনের সংসার।
সর্বনামে না কুলাইলে বলিব নিশ্বসি,
নাম তার (বলিব কি ?) শ্রীমতী অতসী।
ছদ্মনাম। মনে পড়ে সেদিনের কথা
অর্থাৎ যেদিন ধরা পড়িল মূঢ়তা
নির্বোধ প্রাণীর ছুটি।

প্রথম শরতে
নির্মোকধবল জ্যোৎস্না ; পরতে পরতে
জড়িত হইয়া গেছে গন্ধ শেফালির;
মেঘচাপা সায়াহ্নের আতপ্ত সমীর
স্নিগ্ধতা পায় নি ফিরে ; ব্যাকুল টিট্টিভ
জ্যোৎস্নার উৎকণ্ঠা যেন ; প্রায় নিভ-নিভ
তারকার দীপাবলী ; দিগন্ত ঘেরিয়া
কী এক সঙ্গীত যেন ওঠে আকুলিয়া
মৌনতার মত। চলিয়াছি দুইজনে
বীথিপথে, নিত্যকার মত অন্যমনে।

সহসা কী হ'ল! তারে কহিনু নিশ্বসি,
'ভালো না লাগিছে, বলো কী করি, অতসী?'
সে উঠিল ঝঙ্কারিয়া কণ্ঠে ও কঙ্কণে,
'আমি তার কিবা জানি! যাহা লয় মনে,
তাই করো।' এত বলি চলি গেল দ্রুত।
দাঁড়ায়ে রহিনু আমি সেই জ্যোৎস্নাপূত
বনচ্ছায়ে।

হেরিলাম চিত্তমাঝে মম
আনন্দের মতো ব্যথা, সুখ ব্যথাসম।
সুধা ব'লে ইচ্ছি যারে তীব্র সে গরল,
কণ্ঠে ঢেলে দিই যবে তপ্ত হলাহল
সে যে সুধাস্রাবী! মরি, শিশিরের ছটা
কাহার ইঙ্গিতে লভে ইন্দ্রধনুঘটা!
হাসি আর হাসি নয়, অশ্রু অশ্রু নয়!
কোথায় ঘটেছে কোন্ গুপ্ত পরিণয়,
তাই সব বিপরীত! বিচিত্রবরণা
সুখদুঃখ-আশাস্বপ্ন-খচিত ওড়না
নৃত্যের আবর্তে কার ঘোরে চিত্তমাঝে—
কী দেখি, কী করি তাও কিছু বুঝি না যে
বিষম সৌভাগ্য লয়ে! উঠিলাম ঘেমে,
মনে হ'ল হয়তো বা পড়িয়াছি প্রেমে!
কার সনে? অতসীর? এল না তো হাসি,
নিজেই নিজের কাছে একি অবিশ্বাসী!

প্রথম কবে যে দেখা অতসীর সনে
ভুলে গেছি, এইটুকু আছে শুধু মনে—

মাঝে মাঝে চিত্ততটে লাগিত জোয়ার।
বুঝিতাম অন্তহীন আকাশে আমার
কোথাও হতেছে কোনো নব গ্রহোদয়।
দিগন্তে ঝকিত কার চকিত বলয়
ক্ষণে ক্ষণে। দেখিতাম নব লাল শাড়ি।
(নীল নহে, কাজেই সে যেত না নিঙাড়ি,
বিশেষ তখনো চিত্ত হয় নাই তার
করায়ত্ত।) দেখিতাম, শাড়িখানি লাল
আমার গৃহের পথে সকাল বিকাল
করে যাতায়াত ; কভু উচ্চহাস্যে তার
উচ্চকিত ত্রস্ত শিখী কলাপ বিস্তার
ক'রে দিত ; হেরি সেই ইন্দ্রধনু লিখা,
চক্ষু তার বরষিত কৌতুককণিকা।

ক্রমে লাল শাড়ি সনে হ'ল পরিচয়।
আলাপের সীমা যেথা হয়েছে প্রণয়,
সেখানে বাধিল গোল। তুচ্ছ কথা যত—
অবাধে যা ভেসে যেত তরণীর মত,
ক্রমে তা সঙ্গমে এসে হ'ত বানচাল।
লাল শাড়ি হ'ল শেষে মোর পক্ষে কাল।
'অতসী অতসী!'—ডাকি, না দেয় উত্তর।
ব্যাপার কি - অবশেষে ভাবিয়া বিস্তর
মনে হ'ল গতকল্য ডেকেছিল মোরে,
ব্যস্ততায় পারি নি উত্তর দিতে। ওরে
সর্বনাশ! লঘুপাপে গুরুদণ্ড শেষে!
ভাবিলাম তুচ্ছ কথা উড়াইব হেসে।
উড়িল না। রাত্রি গেল, দিন এল ফিরে,
এলো না দিনের আলো।

দেখিলাম, ধীরে
আসিছে সে ; ভাবিলাম, এই অবসর,
আমার গাম্ভীর্য দিয়ে তারে নিরুত্তর
ক'রে দেব। কিন্তু একি, সে দিল বিকাশি
শ্রাবণের মেঘ-ফাটা আশ্বিনের হাসি!
কহিল সে, 'আপনি তো জানেন দেখিতে
হাত!' বিনা ভূমিকায় বাড়ালো চকিতে
কঙ্কণের-বেড় দেওয়া নিঃশঙ্ক গৌরবে
গৌর বাহুখানি। বলো, কখন কে কবে
ছেড়েছে সুযোগ হেন ? জানি, নাই জানি,
হাত তার মোর হাতে লইলাম টানি।
এই পাণিগ্রহণের সাক্ষী আমি একা
(হে পাঠক, অনুরোধ শিখো হাত দেখা)।
কী দেখিনু ? পুষ্পমৃদু করপদ্মতল,
টিপিলে রক্তের আভা করে চলাচল
তাও চোখে পড়ে। হৃৎরেখাটি সুগভীর,
সে যেন যমুনা গূঢ়, শঙ্কায় নিবিড়,
কত অভাগ্যের আশা হবে বানচাল
উত্তাল আবর্তে হোথা ; শুক্রগিরিভাল
সমুন্নত, দাঁড়াইলে সে শিখরশিরে
দেখা দেয় রাত্রিশেষ-স্তম্ভিত তিমিরে
পূর্বরাগদ্যুতি। আর কিবা দেখিলাম!
পাঁচ আঙুলের মাঝে সুগোল সুঠাল
অনামিকা ঘিরি এক অঙ্গুরী চুনির।
কনিষ্ঠাতে দেখিলাম একটি গভীর
ক্ষতচিহ্ন, কোনো কালে গিয়েছিল কেটে।
এইমতো পরিশ্রমি, ঘোরতর খেটে,

তার হাতে পড়িলাম মোর ভবিষ্যৎ।
কেমন সে ?   অন্ধকার, গাঢ়মসীবৎ।

এইরূপে পরিচয় হ'ল ক্রমে গাঢ়।
এর পরে হাত তার দেখিয়াছি আরো—
ক্রমেই সময় কিছু লাগিত অধিক।
আরেক দিনের কথা ; তারিখটা ঠিক
মনে নাই ; সন্ধ্যাকাল নব ফাল্গুনের,
হয়তো আকাশে ছিল পূরন্ত চাঁদের
খণ্ডকলা। চলেছে সে সঙ্গিনীর সাথে,
আধো-দিবালোকে আর আধেক জ্যোৎস্নাতে,
কল্পনা ও বাস্তবের সীমান্ত বাহিয়া
অস্ফুট স্বপ্নের মত ; উন্মনা, গাহিয়া
সদ্য-শেখা গানখানি।   'চলেছ কোথায় ?'
কহিল সে অন্যমনে, 'যেথা চক্ষু যায়।
যাবেন কি ?'   যাব কি না ! কী দিব উত্তর ?
পথচারী ছায়া মোর হইয়া তৎপর
মিলিল ছায়ায় তার।   বনপথে ধীরে
চলিলাম কয়জনে, সায়াহ্নসমীরে
করবীতে গোঁজা তার গুচ্ছ লেবুফুল
স্বপ্নের সীমানা খোঁজে সুগন্ধ-আকুল।
স্বপ্নের সীমানা কোথা ?   হয়তো এখানে
নির্জন এ রাঙাপথে, গুঞ্জিত এ গানে,
ছায়া যবে ছায়াটিরে স্পর্শে বারম্বার,
প্রহরে প্রহরে বাড়ে সংখ্যা তারকার—
তার সুরে, মোর রক্তে অপূর্ব সঙ্গৎ—
স্বপ্ন বল, সত্য বল, এই তো জগৎ,
এই জাগ্রত জীবন।

'কী ভাবেন মনে ?'
মূঢ় আমি বাক্যহীন করুন নয়নে
বারেক চাহিনু শুধু সেই লেবুফুলে।
যেন সে বোঝে না কিছু, এই ভাবে খুলে
খোঁপা হতে ফুল দুটি লুকায়ে সঙ্গীরে
সন্তর্পণে মোর হাতে গুঁজে দিল ধীরে।
সারারাত্রি চক্ষে মোর নাহি এল ঘুম,
তুচ্ছ লেবুফুল হ'ল আকাশকুসুম।

এরূপে চলিতেছিল, দুঃখে আর সুখে
জীবনসৌধের ভিতে মাথা ঠুকে ঠুকে
ধীরে ধীরে হাতড়িয়া ঘন অন্ধকারে।
সবচেয়ে ডরিতাম লাল শাড়িটারে—
সেই লাল শাড়িখানা! যেদিন সে ওটা
পারিয়াছে, সেই দিনই হয়েছে একটা
রাগারাগি। রাগরক্ত সে শাড়ির রঙ
(তার চেয়ে কালো শাড়ি বরণ্যে বরং)
ছিল মোর চিত্তাকাশে নব শনিগ্রহ।
বলিতাম, 'অসি, আজ করো অনুগ্রহ,
(অতসীরে সংক্ষেপিয়া করেছিনু অসি,
আদ্যক্ষর ছেড়ে কভু ডাকিতাম তসি)
পরো অন্য শাড়ি এক।' কুঞ্চিয়া সে ভুরু,
'কেন, মানায় না?' বাস্, হয়ে গেল শুরু।—
'ভালো যার নাহি লাগে, সে বুজুক চোখ,
পরিবই শাড়ি এই।' বাপ রে কী রোখ।
পালের নৌকাটি যেন চ'লে গেল বেগে!
হিসাবে বুঝিনু যাবে দশ দিন লেগে

এ রাগ ভাঙাতে। আছে অভিজ্ঞতা কিনা!
(প্রেয়সী ও মেকি টাকা বড় শক্ত চিনা!
কারণ পরের দিন, দশ দিন নয়,
পরিয়া বাসন্তী বাস এল অসময়
আমার ঘরের দ্বারে। মুখে, কেশে, বাসে,
অধরে, নয়নে, চক্ষে, বাহুদ্বয়ে, হাসে,
হেনে চ'লে গেল এক সৌন্দর্যের কশা!
হে পাঠক, বলো দেখি আমার কী দশা!)

আমার ও অতসীর সম্বন্ধটা এবে
বুঝিতে পেরেছ খুবই। এইবার ভেবে
দেখো সে রাত্রির কথা, শারদ প্রদোষে
সৌজন্যের যবনিকা প'ড়ে গেল খ'সে
এক টানে। প্রকাশিল বিস্ময় অগাধ।
'আপনি' হয়েছে 'তুমি' ; ধ্ব'সে গিয়ে বাঁধ
হ্রদে হ্রদে, হৃদে হৃদে একি সমন্বয়!
পরিচয় কখন যে হয়েছে প্রণয়!
অঙ্গার ভাবিয়া যাতে দিই নাই চোখ,
দুঃসহ ভূস্তরভারে কখন হীরক
হয়েছে সে! জ্বলন্ত সে মাণিকের তাতে
হাত পুড়ে যায়, করি এ হাতে ও হাতে
তবুও ফেলিতে নারি।

ফিরে এনু ঘরে।
মনে স্থির করিলাম অতসীর পরে
প্রতিশোধ নিতে হবে। রহিলাম জাগি।
মরেছে সহস্র লোক প্রণয়ের লাগি—

লোকে বলে। একেবারে অতখানি না রে,
হয়তো তাহার মত বদলিতে পারে
ইতিমধ্যে। তখন কী হবে? তাই মনে
ভাবিলাম, যে চুলা-ই এ পোড়া নয়নে
পড়ে সেই দিকে যাব। পেলে এ সংবাদ
বিরহে পাইবে নারী মরণের স্বাদ।
তাহার দুর্দশা স্মরি শান্তি পেল মন।
অসিরে হেরিল মোর মানসনয়ন—
উদ্‌ভ্রান্ত বিভ্রান্ত চিত্তে ঘুরিছে উর্বশী,
বিস্মৃত স্বর্গের লাগি কিঞ্চিত উপোসী।
বিছানা নিলাম সাথে, নিলাম মশারি
(বিরহে মশার জ্বালা, অত বাড়াবাড়ি
সবে না আমার)। যথাশাস্ত্র ট্রেনে উঠে
পৌঁছিলাম মধুপুরে দীর্ঘ এক ছুটে
ভোরবেলা। নামিলাম। কিন্তু ও কে নামে
আরেক কামরা হতে ঠিক মোর বামে?
অতসী যে! ‘তুমি হেথা?’ সে ওঠে চমকি
অপাঙ্গে ঘটিয়া গেল দৃষ্টি চোখোচোখি,
স্ফুরিল মূর্ছিত হাসি। ‘স্বাস্থ্য-অন্বেষণে
আসিয়াছি। তুমিই বা হঠাৎ কেমনে?’
‘একই উদ্দেশ্য মোর, সরল সে অতি।’
একদিনে দুজনের হ’ল স্বাস্থ্যোন্নতি।
সেই রাত্রে দুইজনে ফিরিলাম বাড়ি—
তখনো পরনে ছিল সেই লাল শাড়ি।

১৭ই অগস্ট ১৯৩৯

ক্যালকাটা রোডে

ঘুরিতেছিলাম ম্যালে, দার্‌জিলিঙের
বিখ্যাত সে রঙ্গমঞ্চে যেখানে ভিড়ের
আবিল আনাগোনায় নিরীহ পথিক
না পায় সঙ্কীর্ণ পথ; ভুলে দিগ্বিদিক্
'ফগ'-খোর স্বাস্থ্যলোভী ঘোরে বন্ বন্—
কে কতটা 'ফগ' খেল যেথা সম্ভাষণ
একমাত্র। তিন-কাল-গত সব নারী
চলে যৌবনের চালে। টুপি আর শাড়ি
বাহুতে বাহুতে বদ্ধ ভ্রাম্যমাণ; আর
ঘোড়ায় চড়িয়া নাচে আনাড়ি সোয়ার
তালে ও বেতালে; বাঁকা ঠোঁটে ভাঙা ভাঙা
ফেরঙ্গভাষণ; বলিচিহ্ন গাল রাঙা
লজ্জায় ও রঙে; কেহ ঘোড়া হ'তে নেমে,
পাকচক্রে ক্লান্ত কেহ মাঝখানে থেমে,
পাহাড়ীর কাছে কেনে সিকিমি আপেল;
কেনে খায় আর কেনে, আস্ত যেন বেল
এত বড়—খায় আর বকিছে বর্বর
নিরর্থক; দূরাগত রেডিওর স্বর
অদৃশ্য অঙ্গুলে মলি কান করে লাল।
স্বাস্থ্যের সে রঙ! চলে সকাল বিকাল
এইমত একভাব।
ছড়ায় কুজ্ঝটি
মল্‌মল যবনিকা ধীরে। হে ধূর্জটি,
আছে তব নন্দী ভৃঙ্গী, আর কেন সখ?
এদের বানাও কেন বৃথা বিদূষক!

সঙ্গীরে ফেলিয়া পিছে চলিলাম একা
ক্যাল্‌কাটা রোড ধ'রে ; এই পথরেখা
মোর চিরপরিচিত আর অতি প্রিয়—
নিরীহ পথিক পারে মনে মনে স্বীয়
কল্পনারে অনুসরি যতদূর খুসি
চলে যেতে চক্ষু বুঁজে ; উঠিবে না রুষি
অন্য কোনো পথচারী ; জুড়ালো শ্রবণ,
জুড়াইল সর্বদেহ, জুড়ালো নয়ন।
বাস্তবের বল্‌গা ছাড়ি কল্পনার হাতে,
চলিয়াছি অন্য মনে গিরির ছায়াতে।
অকলঙ্ক আকাশের নীলকান্ত থালে
কাহার নৈবেদ্য লাগি আজি কে সাজালে
সোনার তবকে-মোড়া এই দিনখানি !
ইন্দ্রাণীর হারচ্ছিন্ন (কেমনে না জানি)
পড়ন্ত হীরক এ যে মহাশূন্যপথে !
অঙ্গুলিবিচ্যুত এ যে সেই অঙ্গুরিকা,
মুহূর্তের তরে হানি বিদ্যুতের লিখা
পড়িছে অতল জলে ! এই ডুবে গেল—
মিলালো, নিভিল দ্যুতি। অন্ধকার। এলো
অকস্মাৎ কুজ্ঝটিকা কপোতধূসর।
রাশি রাশি, পুঞ্জ পুঞ্জ, বাষ্পীয় শীকর
পশিল নাসায় কর্ণে ; বেড়িল আমারে
সৃষ্টিপূর্ব সরীসৃপ আদিম আঁধারে।

আর চলা অসম্ভব ; অনুমানভরে
পথপার্শ্বস্থায়ী এক বেঞ্চের উপরে
বসিলাম সন্তর্পণে ; অদৃশ্য জগৎ—
না যায় বেঞ্চিটা দেখা, নাহি দেখি পথ।

দিগ্বিহীন অন্ধকারে মন এল ফিরে
শীর্ণশাখা পঞ্জরের শূন্য এই নীড়ে
পরিশ্রান্ত। বসিলাম আমি আর মন ;
স্মরণের শতরঞ্চক্রীড়া-আয়োজন
আরম্ভিনু। বলিলাম, 'বলো দেখি আজ
(নীরন্ধ্র এ অন্ধকারে নাহি চক্ষুলাজ)
সব চেয়ে বেশি ভালো বেসেছ কাহারে
মন বলে, 'এই দেখো সপ্ত পারাবারে
ঘেরা এই বসুন্ধরা ; তাই বলে তার
জলতলে ভেদ নাই! ডুবে মরিবার
পক্ষে যথেষ্ট সবাই! ভালো মন্দ তব
বুঝিতে পারি না আমি ; বড় অভিনব
মনে হয়।' বলিলাম, 'দেখাও আমারে ;
স্মৃতির শোভাযাত্রায় যাক সারে সারে
জীবন-সূর্যায়ণের নক্ষত্রের রাশি।'

চেতনার রুদ্ধ উৎস হঠাৎ উচ্ছ্বাসি
উৎসরিল শতধারে। কত ভোলা মুখ,
কত ভোলা নাম, আর কত ভোলা সুখ
দুঃখের শুক্তির মাঝে ; কাহারো নয়ন
মিনতিকরুণ, আর কাহারো বসন
সরমে অরুণ, আর কারো বা কাঁকণ
বাজে রুন্ রুন্, আর কাহারো গুণ্ঠন
তমালতরুণ। সব-শেষে এলো সে যে
ভীরু ধীর পদে, অশ্রুর শিশিরে মেজে
মুখখানি। ঊর্ধ্বে নিল আমারে ছিনায়ে
সুদূর মানসে যেথা আদিম কুলায়ে

ব্যাকুল বলাকাদল চাহে বারম্বার,
কৈলাসশিখরে কবে গলিবে নীহার
বসন্তের করাঘাতে ; উষ্ণ স্বুরভিতে
আমারে বেষ্টন করি নিল চারিভিতে
স্থকোমল পক্ষপুটে হংসদূত যেন।
বলিলাম, 'হায়, মন, বৃথা তুমি কেন
থামিলে এমন স্থানে !' হাসিল সে শুধু।
বিস্মৃতির বৈতরণীতীর করে ধূ ধূ
নিস্তব্ধ, নির্জন, রিক্ত ! ভাবিলাম, হায়,
একবার সে যদি রে আসিত হেথায় !

স্বচ্ছ হয়ে এল ক্রমে ঘন কুহেলিকা,
একে একে প্রকাশিল আলোকের লিখা
এধারে ওধারে। আমার বেঞ্চের পরে,
অন্য প্রান্তে, হেরিলাম বিস্ময়ের ভরে
নারীমূর্তি এক—যেন মেঘলোক হতে,
স্বপ্নলোক হতে কিম্বা এল শূন্যপথে
(দোহাই, রবীন্দ্রনাথ, করি নি নকল
গল্পগুচ্ছ হতে তব, প্রায় অবিকল
বলিতেছি সেদিন যা ঘটেছিল সব)।
নহে বদ্রাউন-কন্যা, আরো অসম্ভব—
যাহারে স্মরিতেছিনু অর্থাৎ অতসী
আমারি বেঞ্চের প্রান্তে অন্যমনে বসি।
'এখানে কেমন করে ?' দুজনে চমকি
শুধালাম যুগপৎ। নেত্র চকমকি
বরষিল কৌতুককণিকা ; বলিল সে,
'স্বাস্থ্যের সন্ধানে আসিয়াছি।' 'একা বসে

এ নির্জনে !' 'পথশ্রান্ত, তাই এ বিশ্রাম।'
বলিল সে কত কথা, আমি বলিলাম।

অতসীর সনে মোর ছিল পরিচয়,
বন্ধুরা বিদ্রূপ করি বলিত প্রণয়।
তার পরে একদিন ছ বছর আগে
(কত দীর্ঘ, তবু আজ কত হ্রস্ব লাগে),
দুজনারে দুই দিকে খর কর্মস্রোতে
নিয়ে গেল ছিন্ন করি ; সেই দিন হতে
দুজনের কাছে মোরা হয়েছি অজ্ঞাত,
আর আজ দেখা এই হেন অকস্মাৎ !
সেই হতে খোঁজ কভু পাইনিকো তার,
সংসারসমুদ্র ধীরে দুরন্ত ভাঁটার
দুর্নিবার আকর্ষণে নিয়ে গেছে টেনে ;
শূন্যতটে শুক্তিসারি রৌদ্রশূল হেনে
ভূবিন্যস্ত। কোথা গেল, রয়েছে কেমন,
জানি নাই, শুনি নাই। আজো মোর মন
তুলিল না প্রশ্ন কোনো। আসন্নবিরহী
নিশান্তসমীরস্পর্শে যথা রহি রহি
চমকিয়া ওঠে তবু পারে না চাহিতে
পূর্ববাতায়নে, পাছে রঙের ইঙ্গিতে
ভাঙে স্বপ্ন, ভাঙে নেশা ! তেমনি আমার
দশা ! পাছে রাগচ্ছটা সীমন্তে তাহার
চোখ পড়ে ! ভাবিলাম—আক্ষেপ বৃথাই,
হাতে হাতে মেলে যাহা যথেষ্ট যে তাই !
দুজনে মূঢ়ের মত রহিলাম বসি—
সুগভীর উপত্যকা দিতেছে নিশ্বসি

পুঞ্জ পুঞ্জ রুদ্ধ বাষ্প আকাশের চোখে—
যে কথা যায় না বলা, মেঘায়িত শ্লোকে
কুণ্ডলিয়া উঠিতেছে দূর স্বর্গপানে।
আদিকবি হিমাদ্রির ভাষাহীন গানে
মিলিল মোদের কথা!
দেখিলাম চেয়ে
ক্রমনিম্ন পাহাড়ের গাত্র বেয়ে বেয়ে
সর্পিল পথের রেখাখানি; সুগভীর
উপত্যকা; শুধু শাল-সরলের শির
শ্যামোজ্জ্বল; দিবসে ভালুক হোথা চরে,
বৃক্ষের বল্কল হতে স্নিগ্ধ রস ঝরে
নখর-আঘাতে তার; নির্ঝরঝর্ঝর,
ঝিল্লির ঝঙ্কার আর পত্রের মর্মর।
অতসীরে শুধালাম, 'মনে আছে সেই
তারা দেখা?' হাসিল সে, অর্থাৎ যে, 'নেই
সে কি হতে পারে!'
গানের আসরে মোরা
মিলিতাম। নিম্নে গান, ঊর্ধ্বে বিশ্বজোড়া
তারকিত অন্ধকার। কেবা শোনে গান!
হঠাৎ চাহিয়া দেখি তাহার নয়ান
বদ্ধ মোর আঁখিতারকায়। ধরা প'ড়ে
ফিরাইয়া যুগ্মচক্ষু আকাশের পরে
খুঁজিত দক্ষিণদিকে ধ্রুবতারকায়!
তাহার অমনোযোগে আমি ধ্যানীপ্রায়
হেরিতাম তার দুটি নেত্র জ্বল-জ্বল,
শেফালিসরল সে যে, তমালতরল,
তুফানজাগানো সে যে—পরশমাণিক
সোনা ক'রে দিত মোর যত দশদিক্

হৃদয়ের। অকস্মাৎ নামাত সে চোখ,
দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে ঠেকি বরষিত শ্লোক
কৌতুকস্ফুলিঙ্গকণা। চলিত এমন।
কী গান হইত খোঁজ রাখে কোন্ জন!
আবার ঘিরিয়া এল ঘন কুজ্ঝটিকা—
ভাঙে-ভেজা বস্ত্র দিয়ে বিশ্বচিত্রলিখা
আনন্দে মুছিল নন্দী; নব পট পরে
আঁকিবে নূতন ছবি আগ্রহের ভরে
গিরিকন্যা। মিলাইল উপত্যকা, বন;
শুধু কোন্ অন্ধকারে অমিতবর্ষণ
তালে তালে নির্ঝরের মত্ত কলরোল—
স্তব্ধতার রক্তের কল্লোল।
বিশ্বগ্রাসী সে তিমিরে দুইটি আঙুল
পরশিল পরস্পরে অকস্মাৎ! ভুল!
যে সংস্কারের পটে ভুল, ভ্রান্তি, ভয়—
ক্ষণেকের তরে তাহা পেয়েছে বিলয়।
শুধালাম, 'মনে পড়ে সেদিনের কথা,
বারেক দেখার লাগি কত যে ব্যস্ততা
দুজনের!' কহিল সে, 'কথা পুরাতন।'

পুরাতন বটে! পুরাতন!
যত পুরাতন এই নদ নদী বন,
যত পুরাতন এই গিরি হিমালয়,
যত পুরাতন গিরি-কন্যার প্রণয়,
যত পুরাতন এই মানবহৃদয়।
অনন্ত তুষারপটে থাক শুধু লেখা
এইখানে আমাদের হয়েছিল দেখা—
এই পুরাতন সত্য।

মিলালো কুয়াশা।
দেখিলাম এদিকেও ক্রমে যাওয়া-আসা
করিছে পথিক। দেখিলাম দুইজন
দু দিক হইতে আসে করি অন্বেষণ
আমাদের, যুগপৎ দাঁড়ালাম উঠি ;
বলিলাম অতসীরে (স্বপ্ন গেল ছুটি),
'পরিচয় করায়ে দি, পত্নী মোর ইনি।'
অতসী কহিল মোরে (বাজিল কিঙ্কিণী)
দেখায়ে অপর জনে, 'ইনি মোর স্বামী।'
নীলাইয়া উপত্যকা বৃষ্টি এল নামি।

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

বিদ্যাপতির রাধা

রাধা ? কে সে ? জানি তারে ? তারি নাম আমি
কাব্যে গেঁথে চলিয়াছি অস্ত-অনুগামী
শর্বরী যেমন গাঁথে তারার বকুলে
বিরহের নর্মহার ! তারি স্মৃতিশূলে
বিদ্ধ করি রাখিয়াছি মোর জীবনের
আদি অন্ত ভবিষ্যৎ ! তারি চরণের
মদির সঙ্কেতে কাঁপে মোর তনু মন,
মুমূর্ষু শেফালিদলে আলোর মতন
সুপ্রসন্ন সমীরণে ! প্রথম-ফাল্গুনে
উদ্‌ভ্রান্ত অধীর বায়ু যায় যথা বুনে
দিকে দিকে স্বপ্নাঙ্কুর, সেইমতো আমি,
আপনা-বিস্মৃত হয়ে, দীর্ঘ দিবাযামী
সুখে দুঃখে ডোরা-টানা বিচিত্র স্মৃতির,
তারি নাম, তারি লীলা অজস্র গীতির

কল-কণ্ঠে ঢালিতেছি! মনে তো পড়ে না
যৌবনফাল্গুনে মোর কে বসন্তসেনা
হেন মায়াচ্ছায়াময়? চিনি না রাধারে।
পল্লবপেলব ঘন সুস্নিগ্ধ মাদারে
মেদুর তমিস্রারাশি, যেন সে প্রিয়ার
রতিমুক্ত কেশপাশ! নাহি পড়ে চোখে
কোন্ রাধা, কোন্ কৃষ্ণ, আছি কোন্ লোকে!
ছন্দের সঙ্কেত শুনি ছুটি অসম্বিৎ—
নাহি জানি স্বর্গ, শাস্ত্র, দেবতাচরিত।

নহে নহে নহে রাধা, নহে সে রাধিকা,
ছন্দের মুকুরে মোর যেই প্রসাধিকা
অকারণে বেণী খুলে দেখিছে চিকুর;
সিঁথির বীথির পরে পরিতেছে চূড়
রক্তকুরুবকে; আর ঘুচায়ে কাঁচলি
দুর্গম সঙ্কট মাঝে গুঁজিতেছে কলি
স্বর্ণকরবীর; আর নূপুর দুটিরে
অদলি-বদলি পরে, পরে ধীরে ধীরে,
যেন ত্বরা নাই; আর হাসির আভাসে
গালে টোল পড়ে, আর চকিত চাহনি
ছুটে চলে যায় যেন সুবর্ণহরিণী!—
তারি কথা বলিতেছ? সে যে সাহসিকা,
নহে সে নহে সে রাধা, সে নহে রাধিকা।

সেদিন পূর্ণিমাশশী ঘনপুঞ্জ মেঘে
ক্ষণে ক্ষণে আবরিছে, যেন বায়ুবেগে
পদ্মে আর পদ্মপত্রে চলে লুকোচুরি
নীলসরোবরতলে; উঠিছে অঙ্কুরি

বিস্মৃত বাসনা যত চূতমঞ্জরীর
দুর্নিবার অন্ধ বেগে ; বহিছে সমীর
পুলক-জাগানো স্মৃতি ; দিগ্বলয়-ডোর
শ্লথ নীবীবন্ধ-সম রভসবিভোর
সুপ্ত নাগরীর ; যেন সমস্ত ভুবন
আবছায়া-মায়া-ঢালা কাহার চুম্বন-
পরশনে !

হেনকালে সন্ধ্যারতিথালে
পাঁচটি প্রদীপ বহি প্রভাদীপ্ত ভালে
কৃত্তিকারূপিণী ধনী আসিল বাহিরে ;
অপরিচিতের পানে তাকাইল ফিরে
একবার ; তারপরে গেল সে চলিয়া
জলদে-বিজলি-সম দ্বন্দ্ব পসারিয়া
ছায়া-ঢালা বীথিপথে। রূপ যায়, স্মৃতি
প্রেতের আকাঙ্ক্ষা বহে ; দুঃখ হয় গীতি,
চাক-ভাঙা মধুপের হা-হা গুঞ্জরণ !
বিজলি-ঝলিত চোখ সর্বত্র যেমন
বিদ্যুতের আভা দেখে, তেমনি সদাই
সে রূপময়ীর রূপ দেখিবারে পাই।
নিদ্রার খিলানে দেখি আছে সে দাঁড়ায়ে
দীপঙ্করী ; স্বপ্নে আসে চরণ বাড়ায়ে
সকৌতুক কৌতূহলে ; ধরে সে কত-না
অচিন্ত্য অপূর্ব কায়া পথিকললনা
স্মৃতির বীথিকাচারী—উঠি চমকিয়া।
পাওয়া-না-পাওয়ার মাঝে দ্বন্দ্ব পসারিয়া
প্রেমের সে পসারিনী যায় ঝলকিয়া।

সেদিন চলিতেছিনু রাজপথ-পরে,
ভগ্ন চূতাঙ্কুর এক মাথার উপরে
সহসা পড়িল আসি। দেখিনু চাহিয়া,
প্রাসাদ-অলিন্দতলে রয়েছে বসিয়া,
শরতের শুভ্র মেঘে শুভ্রতর শশী,
সে রমণী! আপনার অন্তস্তলে পশি
যেন হারায়েছে পথ, যেন সে দেখে নি
পথের পথিকে কোনো! অয়ি একবেণি,
তবু না ভাসিত যদি কটাক্ষে কৌতুক!
তবু না ঝলিত যদি হাসির যৌতুক
অধরের কোণে কোণে! একি লীলা তব,
পথের পথিকে হানি অস্ত্র অভিনব
কন্দর্পের অভিনয়! তুমি বুদ্ধিমতী,
তাই বলে হতভাগ্য আমি স্থূলমতি
এ কেমন অনুমান? নিলাম কুড়ায়ে
মকরকেতুর ছিন্ন রথের চূড়া এ
পাটল মঞ্জরীখণ্ড; হ'ল সে আমার
স্মৃতির নিষ্ঠুরাঘাতে শয্যা শরাধার।

সখীসনে স্নানরঙ্গে দেখেছি তাহারে।
করবিতাড়নে তার মুক্তাদ্যুতি হারে
উচ্ছ্রিত ফেনিল ঊর্মি; যেত তারা ভাসি,
অতল সুপ্তির মাঝে যেন স্বপ্নরাশি,
অনায়াস কী লীলায়! উঠিত যখন
সোপানশিলার পরে, নিষিক্ত বসন
অঙ্গে অঙ্গে মিলাইত—নব সূর্যোদয়ে
মেঘচ্ছদ গৌরীশৃঙ্গে যায় লীন হয়ে।

তার চেয়ে শ্রেয়স্কর নিষ্কল নগ্নতা।
এ যেন তর্জনী তুলে হৃদয়ের কথা
বৃথা রুধিবার চেষ্টা, যতই শাসন
তত আরো বেশি ক'রে সরম-নাশন
একি মাথা কুটে মরা! রহস্য দেহের
আজো হইল না ভেদ; তাই মানুষের
শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, নাই দিগ্বিদিক্—
তাই তো আজিও সে যে শিল্পের পথিক।

তার পরে কতবার দেখিয়াছি তাকে
রাজসভা-মাঝে। ঊর্ধ্বে জালায়ন-ফাঁকে
নেত্র তার জ্বল-জ্বল; উৎকণ্ঠা গানের
নিঙাড়ি টানিছে যবে নিভৃত প্রাণের
শেষবিন্দু রস—আর সমস্ত ভবন
অনির্বচনীয়তায় করে টন্ টন্
সুপক্ক দ্রাক্ষার গুচ্ছ, দেখেছি তখন
কামনার উল্কা-জ্বলা তার দুটি চোখ
ইন্ধনসন্ধানী; চির জড়ত্বনির্মোক
অজ্ঞাতে কখন খুলি বুভুক্ষু নাগিনী
এসেছে স্বমূর্তি ধরি বাসনারূপিণী
আদিম রমণীশিখা; দুটি নেত্র মম
সে দৃষ্টির নাগপাশে বদ্ধ মৃগ-সম
আপনা-বিস্মৃত আর বিস্মৃত সকল—
স্থান কাল, পাত্র মিত্র, রাজসভাতল।

সেদিন সে চলেছিল সখীসনে মিলি
বিশ্রব্ধ আলাপরঙ্গে; রৌদ্র-ঝিলিমিলি
নব নব অলঙ্কার দিতেছিল তুলে
প্রতি অঙ্গে, কটিতটে, কণ্ঠে, বাহুমূলে,

মুগ্ধ প্রণয়ীর মতো! বনবীথিচ্ছায়ে
অভিনব কী বসন দিতেছে জড়ায়ে
দেহে তার! আলো-ছায়া, প্রণয়ীযুগল
তাহারে করিতে খুশি হয়েছে পাগল—
কেহ দেয় শাড়ি আর কেহ অলঙ্কার,
সমান নিষ্ফল দোঁহে মুখ ক'রে ভার
প'ড়ে থাকে পথে। আমি সম্মুখে আসিয়া
দাঁড়ালেম। সখী তার শুধালো হাসিয়া,
কী চাও পথিক? মুখে না জুয়ালো বাণী।
কী চাই? তাই তো! আমি নিজেই কি জানি

কেন যে এমন হয় কে পারে বলিতে?
আশার চরম লগ্নে কে আসে ছলিতে
বিড়ম্বিতে অকারণ? ভাষা কি শেখে নি
কেমনে ছাড়াতে হয় ঘটনার বেণী?—
ছায়ারে কেমন করি কায়া দিতে হয়?—
বাক্যে যাহা স্থূল অতি তাহারে প্রত্যয়
না পারে করাতে ভাষা; সঙ্গীতের সুর
সেও হার মানে, নাহি যায় তত দূর।
তাই শুধু চেয়ে থাকা!

গেল তারা চলি
অশোক-জাগানো পায়ে আলো-ছায়া দলি
বিশ্রামের বিশ্রম্ভনে। দেখে ফিরে ফিরে,
দেখে আর হাসে দোঁহে। প্রদোষসমীরে
হাসির নিক্বণ আসে রূঢ় অদৃষ্টের
অক্ষধ্বনিসম; মোর জীবন-ছকের

সব ঘুঁটি দেয় উলটিয়া। দুজনায়
মিলালো পথের বাঁকে—বৃথা স্বপ্ন-প্রায়।
ততক্ষণে সন্ধ্যাকাশে হয়ে গেছে টানা
রঙের তুলিকা যত। বিগত-নিশানা
সঙ্গীহীন সন্ধ্যাতারা চেয়ে আছে একা—
তখনো তারার দল দেয় নাই দেখা।

সে কি মধ্যরাত্রি হবে? আরো বেশি কিছু।
কালপুরুষের অসি অতখানি নীচু
না হয় দ্বিতীয় যামে। স্বপ্নে-মনে-পড়া
প্রিয়মুখচ্ছবিসম তরুতলে ঝরা
বকুলের আধো গন্ধ। প্রোষিতভর্তৃকা
বিরহিণী বধূ-সম ঘুমাইছে একা
বিনত রজনীগন্ধা। বেড়াপ্রান্তে হেনা
কত কী ইঙ্গিত করে, চেনা ও অচেনা
জগতের সীমন্তিনী। পুরীর উৎসব
কেবল হয়েছে শেষ; ফিরিতেছে সব
যে যাহার ঘরে। মুখে কারো নাহি কথা;
সকলেরি রক্তে এক আদি-ব্যাকুলতা
চঞ্চলিয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম তারে
স্বপ্নের পথিক-সম গুণ্ঠিত আঁধারে
চলিয়াছে। দাঁড়ালেম সমুখে আসিয়া—
আর না উঠিল তন্বী কৌতুকে হাসিয়া;
কুণ্ঠিত থামিল ধীরে। সে যেন রে জানে
আমি চির-প্রত্যাশিত, যেন এইখানে
দুজনে মিলন হবে অদৃষ্টের লেখা—
পথের জনতাপ্রান্তে মোরা দোঁহে একা।

কোথা গেল নাগরীর কৌতুকভাষণ ?
কোথায় সে মুহুর্মুহু অপাঙ্গশাসন ?
কোথা নিক্কণিত হাসি ? ডুবিয়াছে ভরা ;
বানচাল হয়ে গেছে সমস্ত পসরা,
সুখের বেসাতি যত। আছে শুধু নারী,
আর আছে বুভুক্ষিত হৃদয় তাহারি—
নহে অতিরিক্ত কিছু। প্রণয়স্তিমিত
চক্ষে আধো-অবিশ্বাস। বিহঙ্গিনী ভীত
আঁধারে আশ্রয় খুঁজি ফিরিয়াছে নীড়ে,
তবু না প্রত্যয় হয়। আমি ধীরে ধীরে
কুসুমকোমল কর লইলাম টানি।
তার পরে কী হয়েছে কিছুই না জানি।
তখন ছুঁইল চন্দ্র ধরার কপোল ;
খসে-পড়া পুষ্প পেল ধরণীর কোল ;
সারারাত্রি সাধনায় চঞ্চল সমীর
কুয়াশা-অঞ্চলখানি গৌরীশিখরীর
তখন ঘুচালো সবে ; ত্রিযামা প্রহর
ছায়া দেয় নাই ধরা, মূঢ় তরুবর
সেধে সেধে মরিয়াছে, তখন আঁধারে
তরুছায়া এক হয়ে গেল একেবারে।

অবোধ বালক যথা প্রতিদিন দেখে
নব-অঙ্কুরিত বৃক্ষ মেলে একে একে
নব পত্র নব দল, পরমবিস্ময়ে
কথা না জোগায় মুখে, থাকে মুগ্ধ হয়ে—
সেইমতো দেখিয়াছি তারে, পাই নাই
রহস্যের তল। যবে দূরে চলে যাই

নিকটচারিণী সে যে ; কাছে যবে আসি
সে যেন সুদূরে গেছে দিগন্ত-উদাসী
ক্ষীণ তন্বী বনলেখা বাষ্পমায়াময় ;
বিশ্বাসের তরুশাখে দোলা অপ্রত্যয় ;
কোলে টেনে নিয়ে বুঝি নির্মম বিরহ ;
ছেড়ে দিয়ে জানি সঙ্গে আছে অহরহ
স্মৃতির সুগন্ধ-রূপে ; রাগারুণ গালে
চুম্বনের চন্দ্রকলা মিলায় অকালে
ঝড়ের ইঙ্গিতে কোন্ ; দুরন্তঝটিকা
মেঘ কেটে অকস্মাৎ দেখি স্মিতলিখা
আচম্বিত সুপ্রভাত, আপনার রূপে
আপনি আড়াল হয়ে নিজের স্বরূপে
ঢেকে যেন রাখিয়াছে। এই যদি প্রেম,
আজিও তাহার হায় অন্ত না পেলেম !

এই মোর রাধা। সে যে একান্ত মানবী—
যৌবনযজ্ঞাগ্নি হ'তে বাসনার হবি
উদ্ভিন্ন করেছে নব দ্রুপদনন্দিনী
কামনার গিরিশৃঙ্গ হ'তে নিঃস্যন্দিনী
এই নব ভোগবতী। প্রেম সে মর্ত্তের
আর আনন্দ স্বর্গের। প্রণয়াবর্ত্তের
প্রচণ্ড ঘূর্ণনে হেথা জীবনের হেম
ধরেছে অরূপ কান্তি, তারে বলি প্রেম
নহে তাহা সুখ, নহে দুঃখ নিরবধি ;
অসীম সমুদ্র নহে, নহে ক্ষুদ্র নদী ;
নহে পাওয়া, নাহি-পাওয়া ; নহে আত্মা, দেহ ;
বুকে বেঁধে কাঁদা আর উথলিত স্নেহ

বাহুপাশ মুক্ত করি। কামলোকমাঝে
নিগূঢ় মৃণাল তার ; রূপলোকে রাজে
অনবদ্য অরবিন্দ মেলি দিয়া দল ;
অরূপ লোকের বায়ু তার পরিমল
রেখেছে নন্দিয়া নিত্য। সেই মোর রাধা
ত্রিলোকের অভিজ্ঞতা যন্ত্রে তার সাধা!
কামনার নটী সে যে ; পাপ-পঙ্কজিনী—
মধ্যরাত্রে সুরাপাত্র ঝঙ্কতকিঙ্কিণী
ধরে ওষ্ঠে ; নিয়ে যায় দেহান্তের শেষে
যৌবনযোগিনী যেথা ছিন্নমস্তাবেশে
আপন রুধির পিয়ে। যত কিছু পাপ,
সুরাপাত্র ঘিরে আছে যত-না প্রলাপ
মুখরিয়া মত্ত হয়। স্খলিত নূপুর
মদিরপিচ্ছিল ভূমে ভেঙে করে চূর
সত্য শাস্ত্র প্রভৃতির সঙ্কল্প মহৎ,
কীর্তির নরকে বসি দেখায় সে পথ
উর্ধ্বগামী। আমি কবি তুলিয়াছি তায়
প্রলয়পয়োধি হ'তে বেদবাণীপ্রায়
কল্পনার রূপলোকে। আমি তার কবি,
দেব নহে, দৈত্য নহে, একান্ত মানবী
আমার শিল্পের পদ্মে।

তারে বলো রাধা?
ত্রিলোকের সপ্তসুর কণ্ঠে তার সাধা।
কামনার নটী সে যে, প্রেমের রমণী,
ভাবনার অপ্সরী সে, কবিতার ধনী

বৃকভানুপুত্রী রাধা। সে নহে কৃষ্ণের।
তারে বসায়েছি আমি পালঙ্কে কাব্যের,
যাপিব বাসররাত্রি। নন্দের নন্দন
আসিলে দেখিবে, নাহি দ্বারের বন্ধন
উন্মোচিত। জানো সবে, রয়েছে বসিয়া
সঙ্গোপনে বিদ্যাপতি আর তার প্রিয়া॥

৩১ জানুয়ারী, ১৯৪৫

হংসমিথুন

যুগল

পুরাতন এ পৃথিবী,
পুরাতন আমার হৃদয়।
স্মৃতির গোধূলিক্ষণে
অকস্মাৎ দুজনার একি পরিচয়!
শারদ সোনার স্বচ্ছ চীনাংশুকতলে
নবতন দৃষ্টিবিনিময়।

দুস্তর শতাব্দী কত এলো সন্তরিয়া
অমর গোলাপ,
আদিতম দম্পতির পুষ্পিত প্রলাপ;
যুগান্তের বীথি বহি এলো উচ্ছ্বসিয়া
কুহুস্বর স্বপ্নগীতিময়।
পুরাতন এ পৃথিবী,
পুরাতন আমার হৃদয়।

পুরাতন এ পৃথিবী,
পুরাতন আমার হৃদয়।
দুজনেরি চোখে জল
করিতেছে টলমল;
আমার এ গান নহে,
ওর গালে সন্ধ্যাতারা নয়।
পুরাতন এ পৃথিবী,
পুরাতন আমার হৃদয়॥

১৯৩৭

পদ্মার চর

পদ্মার নতুন চরে কচি কাঁচা ধান,
প্রভাত অম্লান,
হায় ভগবান!
নধর ঘাসের বুকে কৃষ্ণচূড়াটির
ছায়াটি গভীর,
চুম্বনমদির।
বৈশাখী আমের বনে মসৃণ পল্লব,
সুপ্তিমৃদু রব,
স্বপনদুর্লভ।
ওপারের চর হতে কোকিলের গান,
শিশিরের ঘ্রাণ,
হায়, হায় ভগবান॥

১৯৩১

বর্ষার পদ্মা

দুরন্ত পূরব বায়ে পদ্মা উতরোল,
কাঁদে হায় হায়।
তটের মনের কথা তটিনী আজিকে
জানিবারে চায়।
অশান্ত তরঙ্গদোলে ক্ষুদ্র ডিঙিখান
করে টলমল,
কে বল রে জাগাইল সুপ্ত নদীজল
এমন সন্ধ্যায়!
আউশের ক্ষেত্র মাঝে কৃষাণ বালক
তৃপ্ত নিজ গানে,
বুভুক্ষু তরঙ্গদল লক্ষ শির হানে
তটিনীর পায়

বৃষ্টিলুপ্ত নদীচরে পাপিয়ার স্বর
একান্ত নিশিত,
ম্লান ঝাউশাখা হতে অজস্র সংগীত
বেদনার প্রায়।
কে কারে মনের কথা বলিছে এখন,
কে কারে শুধায় ?
কাঁদে পদ্মা, কাঁদে তীর শ্রাবণবন্যায়,
হায় হায় হায়॥

১৯২৭

নির্জন পদ্মা

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা,
দ্বিতীয়ার চাঁদ,
নীলাভ পদ্মার ধারা, শূন্যতা অগাধ।
স্তিমিত হাঁসের দল,
পশ্চিম বনান্ততল
ম্লান কাঁদ-কাঁদ ;
শূন্যতা অগাধ।

শুধু দুটি মুগ্ধ প্রাণী,
শূন্য শরবন,
পদ্মার নাহিকো বাণী—স্বপননির্জন।
অসীম রাত্রির পানে
যায় তারা কোন্ খানে
ছায়ার মতন ;
স্বপননির্জন॥

১৯৩১

মধ্যাহ্নের পদ্মা

শীতের মধ্যাহ্নে আজি স্বপ্নরস ঢালি
তীরে নীরে কে রচিল এমন নিদালি
হে পদ্মা তোমার।
ওপারের ভাঙা তটে ছায়াখানি নীল,
চাক বেঁধে ওড়ে আর ডাকে শঙ্খচিল
কেন বারে বার।
পীতাভ বালুর রেখা, নীলাভ স্রোতের,
স্বর্ণাভ ঘুমের ঘোর পউষ-রোদের
দু পারে বিথার।
শস্যকাটা শূন্য মাঠে বায়ু উঞ্ছলোভী,
এপারের রিক্ত মাঠে দেয় মুগ্ধ কবি
স্মৃতিতে সাঁতার।
সব তব রূপ গান আজিকে নিঃশেষে
এসে যেন ঠেকিয়াছে করুণ চিত্রে সে
একটি রেখার
সূক্ষ্ম তূলিকার,
হে পদ্মা তোমার॥

১৯৩২

সূর্যাস্তের পদ্মা

হে পদ্মা তোমার
বনরেখা-বিবর্জিত দিগন্তের দেশে
ডুবে যায় শ্রান্ত রবি গলিয়া নিঃশেষে
বিন্দুমাত্রসার।

নিশ্চপল জলতলে যেন একটানা
ধূমল পাটল এক বাছড়ের ডানা
হতেছে বিস্তার।
পশ্চিমে ত্রিবলী বর্ণ, কানন নিবিড়,
মুহুর্মুহু স্বচ্ছ ছায়া হতেছে গভীর,
নৃত্যশীল ভঙ্গি যেন লঘু ওড়নাটির
বিদ্যুৎপর্ণার,
হে পদ্মা তোমার।

নদীতে শেহলা শ্যাম, রোদে-পোড়া ঘাস,
দগ্ধ মাঠে উঠিতেছে উদ্ভিজ্জ সুবাস
শিশিরের স্পর্শ লভি ; বিমূঢ় বাতাস
গন্ধে আপনার,
হে পদ্মা তোমার।

ধূমাঙ্কিত পল্লীপথে ঘণ্টা গোধূলির,
তালে তালে দাঁড়-ফেলা ক্বচিৎ তরীর,
হঠাৎ শ্রবণে পশে কুলায়-অধীর
ধ্বনি বলাকার—
বালুস্তূপে মগ্ন দীর্ঘ মাস্তুলের শিরে
দেখিনু জ্বলিছে দীপ্তি আসন্ন তিমিরে
সন্ধ্যাতারকার,
হে পদ্মা তোমার॥

১৯৩২

শীতের পদ্মা

পুরানো দিনের পায়ের চিহ্ন খুঁজি এই নদীতটে
আজি চলিয়াছি বটে।

সেই পথঘাট, ধান-কাটা মাঠ,
শীত-সন্ধ্যায় ধূসর বিরাট
পদ্মার চর,—পদ্মা ভরাট
স্তিমিত মন্ত্র গায় রে,
হায় রে জীবন, হায় রে,
যে পথে দুজনে যায় রে
চরণ-চিহ্ন থাকে না, রাখে না
ক্ষুব্ধ ক্ষণিক বায় রে।

হেরি চারিধারে আঁধার ঘনায়,
শুধু দিগন্তে অস্তসীমায়
ঝামা আলোটুকু মিলায়, মিলায়
মেঘে আর কুয়াশায় রে,
হায় রে জীবন, হায় রে,
যে পথে দুজনে যায় রে
চরণ-চিহ্ন থাকে না, রাখে না
ক্ষুব্ধ ক্ষণিক বায় রে।

পীতাভ বালুর তীরেতে শয়ান
পদ্মার আজি স্বপ্ন-প্রয়াণ,
ধ্যানে নেহারিছে তারকাটি ম্লান
ধরিল কি রূপ হৃদয়াকাশে।

পল্লীর শিরে বেণু-বন-ছায়
ধূমকুণ্ডলী শয্যা বিছায়,
শেষগাড়ি ধান গৃহমুখে যায়,
আর্ত করুণ শব্দ আসে।

হায় রে জীবন, হায় রে,
যে পথে দুজনে যায় রে
চরণ-চিহ্ন থাকে না, রাখে না
ক্ষুব্ধ ক্ষণিক বায় রে॥

১৯২৯

অপরাহ্নের পদ্মা

একদিন এই পথে তুমি আর আমি।
শীতের অন্তিম রোদ দীর্ঘ ডানা ভরে
পড়ে ছিল অন্তহীন আলস্যের ভরে,
কচি মটরের ক্ষেত, সবুজ মশুর,
এপারে ওপারে পদ্মা, মাঝে এই চরে
রাত্রি আসে নামি,
তুমি আর আমি।

একদিন এই পথে তুমি আর আমি।
শীতের নূতন চরে তব দুটি পায়
সম্মুখে চলিতে পিছে ছাপ রেখে যায়,
তখনো লাগিয়া ছিল গত বরষার
ভেসে-আসা খড়কুটা ; জল নাই আর ;
মাঝখানে সরু আল, দুই ধারে তার
শস্যহীন ভূমি,
একদিন এই পথে আমি আর তুমি।

একদিন এই পথে তুমি আর আমি।
এপারের গৃহরাজি, ওপারের বন
আসন্ন কুহেলি তলে হল নিমগন,
পশ্চিম সীমান্তশেষে বিন্দুমাত্রসার
ডুবে গেল নিঃস্ব রবি ম্লান কুয়াশার
রাঙাইয়া পাড়খানি, রাত্রি এলো নামি।
তুমি আর আমি।

আজি বহুদূর হতে বহুদিন পরে
একবার তাকাইনু শূন্য সেই চরে—
শূন্য মাঠ শস্যহীন, শুষ্ক বালুকায়
অতীতের স্মৃতিচিহ্ন কোথা সে প্রান্তরে!
এপারে ওপারে পদ্মা, রাত্রি আসে নামি।
একদিন এই পথে তুমি আর আমি॥

১৯২৯

সন্ধ্যার পদ্মা

সোনার দিগন্তে, সখা, একখানি পাল,
একখানি শশিকলা সন্ধ্যাতারা সাথে,
আর বন্ধু তুমি।
কপোত-পাণ্ডুর ছায়া নামিছে পদ্মাতে,
থামিছে স্রোতের ধ্বনি, ঢাকিছে বিশাল
গাঢ় মর্ত্যভূমি,
আর বন্ধু তুমি।
আকাশে হাঁসের দল দীর্ঘ গ্রীবা ভরে,
দীর্ঘতর ছায়া হানে তৃতীয়ার চাঁদ,
তুমি বন্ধু কোথা?

দুইটি বক্ষের মাঝে স্তব্ধতা অগাধ,—
অনন্ত ধ্যানের মতো দুইটি অন্তরে
ব্যগ্র ব্যাকুলতা—
তুমি বন্ধু কোথা !
আভাসে উজ্জ্বল হল চাঁদের গোলক,
মুমূর্ষু আলোর প্রান্তে রহিয়া রহিয়া
সন্ধ্যাতারা কাঁপে।
তোমার পরশ বন্ধু অম্বর ব্যাপিয়া,
বিরহী ভুবন রচে বেদনার শ্লোক,
বিচ্ছেদের তাপে
সন্ধ্যাতারা কাঁপে ॥

১৯২৮

উত্তরমেঘ

যুগচ্ছন্দ

বাঁধ ভেঙে গিয়েছে,
মানস সরোবরে ঢুকে পড়েছে
বন্যার জল,
স্থির কমল আজ কম্পিত,
উড়ন্ত মেঘের স্রোতে
কম্পমান যেমন চন্দ্রমা।
বাঁধ ভেঙে গিয়েছে,
মানসের দিগ্বলয় আজ চঞ্চল,
চঞ্চল করালীর মণিবন্ধে যেমন কঙ্কণ,
গৌরী হয়ে উঠেছেন কালী।
অন্ধকারের আঙিয়া-পরা পাহাড়গুলোর চূড়ায় চূড়ায়
বিদ্যুতের ঐ যে লুটোপুটি,
সেদিনকার কবিরা হ'লে বলত
পুষ্পাসব-প্রমত্ত দেবতারা কেড়ে নিয়েছে
উর্বশীর বসন,
হাত থেকে হাতে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি।

আদিকবির অনুষ্টুপের মত
অগ্নিগর্ভ ঐ যে সূর্যোদয়,
চন্দ্রকলার ঐ যে নিমীলন আর উন্মীলন,
এ সব আজ নিরর্থক।
যে-ছন্দে এরা সত্য হয়ে উঠত
হারিয়ে গেছে সেই ছন্দ
শকুন্তলার অঙ্গুরীয়ের মত,

পার্থ আজ বৃহন্নলা
দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী।

উর্বশীর স্তনাঢ্য বক্ষের কোথায় সেই প্রচণ্ড সুখোদ্বেগ
আমার ছন্দে ?
কোথায় সেই দিব্য পয়োধরের নিটোল অনবদ্যতা ?
কাঞ্চীদামে কমনীয়, নৃত্যভঙ্গে নমনীয়,
কোথায় সেই কটিতটের লাবণ্য-নিক্ষেপ
আমার ছন্দে ?
আমার ছন্দ আজ বাক্যমাত্র !
তার গিয়েছে ছিঁড়ে,
বাঁধ গিয়েছে ভেঙে,
মানস সরোবরে ঢুকে পড়েছে প্রচণ্ড স্রোত।

বাঁধ ভেঙে গিয়েছে,
অনিশ্চয়ের মহাসমুদ্র থেকে
সাদা ফেনার কেশর ফুলিয়ে
দুরন্ত জোয়ার এসেছে,
কিন্তু সোয়ার কই ?
বিশ্ব আজ ঘাড় থেকে ফেলে দিয়েছে সোয়ারকে ;
তাই সবই এমন অনিশ্চিত।
বন্ধনহীন নিয়মবিহীন তুরঙ্গম আজ অশান্ত।
চরমতম সুখের মুহূর্তেও সংশয় আজ যায় না,
প্রেমের আঁখিপক্ষ্মে নেমে পড়ে অতর্কিত ছায়া ;
চকিত দীর্ঘনিঃশ্বাস কী মন্ত্র দেয় পড়ে,
সব হয়ে ওঠে ছায়াময়।
স্খলিত চুম্বন
ডুবে যায় চোখের জলে—
অশ্রুমুখী শকুন্তলা হয় প্রত্যাখ্যাতা।

সুখের উত্তরীয়ের ভাঁজে ভাঁজে
বেরিয়ে পড়ে সংশয়ের রেখা!
সবই আজ অনিশ্চিত।
সংশয়ের সূচীমুখে
জীবন-পাত্র আজ শতচ্ছিদ্র।
অমৃত যায় ঝরে,
অধরে পৌঁছয় কই!
সন্দেহের দোলায় আজ
জীবনের রাস।
দোলা থামে, তবু দোলন থামে না,
মন কেবলি বলতে থাকে—
এ নয়, এ নয়।

মেঘের তূলি পাহাড়ের মাথায় টানে
ঘন নীল ছায়া,
বনের সবুজ ওঠে শ্যামিয়ে,
নদীর জলে লাগে কলঙ্ক,
গড়িয়ে-নামা মাঠের ধূলোয়
মেঘের ছায়ার লাগে ধূলোট,
শুভ্র মেঘের তুলো
হাওয়ার টানে উত্তরী দেয় বিছিয়ে,
আকাশের নীলে পড়ে কল্পতরুর ছায়া।
তবু সন্দেহ ঘুচতেই চায় না,
তবু অনিশ্চয় থেকেই যায়।
সৌন্দর্যের পুষ্পে ঢুকেছে আজ সংশয়ের কীট,
যে-অমৃত ঘুচাবে তৃষ্ণা,
সেই অমৃতই যে আজ তৃষিত।
কে দূর করবে বিশল্যকরণীর শল্য?

প্রতি যুগ সন্ধান করে আপন ছন্দ
এ যুগের ছন্দ কই ?
বাল্মীকির অনুষ্টুপ প্রাঞ্জল, সরল,
জানকার মানব-দুঃখের অক্ষয় আধার।
কালিদাসের মন্দাক্রান্তা
'শ্রোণীভারাদলসগমনা
স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং',
মালবিকার অভিসারযাত্রার কুণ্ঠিত নূপুর
বেজে উঠছে তার গাঁঠে গাঁঠে।
বিদ্যাপতির ছন্দই যে তার রাধিকা,
দুজনেই বিলাসকলাচতুরা,
দুজনেই সমান বাঙ্ময়ী,
সমান অলঙ্কারশালিনী।
রবীন্দ্রের মুক্তপয়ার
বদ্ধ-পিঞ্জরের মুক্ত বিহঙ্গম,
পাখায় তার আকাশের আমন্ত্রণ,
চোখে তার দিগন্তের অঞ্জন,
নীড়ে বসেও সে বৈরাগী।
রবীন্দ্রের ছন্দ তাঁর জীবন-বাণীর বাহন।
কিন্তু হায়, এ যুগের ছন্দ কই ?
কুয়াশার চাঁদ যেমন হাতড়ে হাতড়ে পথ চলে
এ যুগের বাণী তেমনি অন্ধ,
তেমনি ছন্দোহীন।
এ যুগের ছন্দ কই ?

এ যুগের সুখ পৌঁছয় না আনন্দে,
এ যুগের দুঃখ নিতান্তই ব্যক্তিগত।
কোথায় সে আনন্দের অভ্রভেদী উচ্ছ্বাস ?

কোথায় সে উল্লাস ?
হিমালয়ের তুষারতুঙ্গ শিখরের মত
স্বসমুখ প্রচণ্ডতায়
মর্ত্যের জীর্ণ মঞ্চ থেকে
স্বর্গের সিংহদুয়ারে পৌঁছয় কই
এ যুগের আনন্দ ?
কোথায় বা সেই দুঃখের আত্মভেদী
অর্থভেদী রব ?
সায়াহ্নের মন্দির-চূড়া যেমন উধাও হয়ে যায় উর্ধ্ব পানে,
আমূল বিদ্ধ হয় আকাশের হৃদয়ে,
তেমন তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা,
বজ্রোপম দার্ঢ্য,
তেমন অগ্নিস্রাবী বিদ্যুৎ
কোথায় আমার ছন্দে ?
যে-বেদনা দুর্জয় গরুড়ের মত প্রোড্ডীন হয়
শিল্পের বৈকুণ্ঠলোকে,
কোথায় সেই বেদনা ?
যে-মন্দার
ইন্দ্রাণীর দুর্গম স্তন-সঙ্কটে
প্রলম্বিত হবার আশায়
আপান প্রস্ফুটিত হয়,
কোথায় সেই স্বতঃস্ফূর্তি
আমার ছন্দে ?
জাল দিয়ে কখনো নদীকে যায় ধরা ?
কুয়াশার আঁচলে বাঁধা যায় সূর্যকে ?
'আমি'র মন্থনদণ্ডে
আর সংশয়ের রজ্জুতে
বিশ্ব-পারাবার হবে মথিত ?

উর্বশী ? পারিজাত ? অমৃত ?
পুঞ্জ পুঞ্জ নাস্তিক্যের বাষ্পীয় শীকর
আচ্ছন্ন করে আমার ত্রিভুবন !
সেই অন্ধকারে আমার ছন্দ পাইনে খুঁজে,
আমি ছন্দোহীন ॥

অনির্বচনীয়া

ওপারের গিরিমালায় আর আকাশের আলোতে
সারাদিন এ কী লীলা !
পাখীর গানে পা টিপে টিপে
আলো আসে,
খুলে ফেলে ওর নীল ঘোমটা,
বেরিয়ে পড়ে চপল হাসি
চাপা ঠোঁটের কোণে কোণে,
কালো চোখের কূলে কূলে।
সারাদিন এ কী লীলা !

আবার কখনো বা আলো আসে চুপে চুপে
ঝাঁ-ঝাঁ করা দুপুরের ঝিমিয়ে-পড়া
নৈঃশব্দ্যের তালে তালে,
হঠাৎ ওর মাথায় পরিয়ে দেয় ময়ূরকণ্ঠী বসন
মেঘের পাঁজ দিয়ে চাঁদের চরখায় বোনা।
আলো হাসে,
গিরিমালার ভাব যেন কতই অপ্রত্যাশিত।
সারাদিন এ কী লীলা !

কখনো বা দেখি মেঘের ফাঁক দিয়ে
গিরির মাথায় ঝরছে আলোর গাঁদাফুল,
সমস্ত উপত্যকাটা যায় ভ'রে,
ঝলমলিয়ে ওঠে নদীর জল,
বনতল হয় আভাময়!
সবুজে শ্যামলে সোনালি নীলিমায়
মুহুর্মুহু এ কী ওড়নার অপসারণ!
কত রঙ আছে আলোর,
কত ওড়না গিরিমালার!
ফিকে আলো থেকে ঘন কালোর মধ্যে
এ কী তুরন্ত সা রে গা মা সাধা
রঙে রঙে,
চোখ পারে না ধরতে কোথায় শেষ আর শুরু,
নাম কেমন ক'রে বলবো!
আলোতে আর গিরিতে
সারাদিন এ কী লীলা!

জ্যোৎস্না-রাতে আলো আসে
শ্বেত ময়ূরের কলাপ মেলে,
গিরিমালা তখন মিলিয়ে যাওয়ার প্রান্তে।
নিঃশব্দ, নির্জন পৃথিবী যেন
কোন্ চন্দ্রলোকের প্রান্তর,
বনের ঘন কালোর উপরে পড়েছে
অপ্রত্যয়ের সাদা!
আকাশের শুভ্রতা আর পৃথিবীর কালিমা
এই দু-কূলের মধ্যে তলিয়ে গেছে সব রঙ,
দিনের সব বৈচিত্র্য।
রঙের এ কী নির্বাণ!

সারাদিন বসে দেখি আমি,
সারাদিন আর সারারাত।
গিরিতে আলোতে এ কী লীলা,
রঙে রঙে এ কী মালা-বদল!

পৃথিবীতে এত রঙ কেন কে জানে!
ঐ যে বেগুনী-ছোঁয়া ধূমল মলমল
টেনে দিচ্ছে আবরণ,
ঐ যে চলতি মেঘের নীল ছায়ার
চলমান কৌতুক,
আর
ঐ যে গোধূলির চেলি গিরিমালার সীমন্তে
পরিয়ে দেয় গুণ্ঠন,
এ সব কেন কে জানে।
কেবল আমার মন ভোলাবার জন্যেই
এমন আয়োজন?
আলো ছায়ার এই পাণিগ্রহণ?
রঙের সাথে রঙের জোড়মেলানো?
ঐ দিগন্ত-জোড়া ভূমিকার লক্ষ্য
ক্ষুদ্র এই আমি?
মন বলে—না, কিছুতেই নয়।

ওদের মনে ওরা রয়েছে,
ওরা আমি-নিরপেক্ষ।
ওদের মনে ওরা রয়েছে,
আমার মনে আমি,
আমি ওরা-নিরপেক্ষ।
তবে রঙ এত রঙীন কেন?

দ্রুত লাইনে লাইনে জট পাকিয়ে যায়,
আবার একটা জট খুলে তিন জোড়া লাইন বেরোয়।
কোথাও বা মালগাড়ির শ্রেণী,
কতক খালি, কতক বোঝাই ;
কিন্তু সমস্ত এমন নিঃসঙ্গ
যেন লোকে ভুলেই গিয়েছে ওদের প্রসঙ্গ।
ঘন ঘন সিগনাল, এঞ্জিন, উর্দিপরা লোক।
মস্ত স্টেশন, প্রকাণ্ড জংশন,
গাড়ি এসে থামলো।
রাবণের পুরীর বারান্দার মত টানা প্লাটফর্ম,
কত মাল, কত মালিক,
কত যাত্রী, কত দর্শক,
বিচিত্র হাঁকডাকের অফুরন্ত ফুলঝুরি।
আমার কিন্তু নামবার তাড়া নেই,
আমি ব'সে আছি সেই জানালার ধারেই।

স্টেশনের বাইরে সারিবদ্ধ সিসু গাছের ছায়ায়
সুরকি-ঢালা লাল পথ,
সেই পথের ধারে এক জায়গায়
ঝুমকো লতার ফুল-দোলানো
লাল টালির বাংলো।
সেখানে আছ তুমি,
তাই সেখানে আছে আমার পৃথিবী,
তাই সেখানে আছে অনন্ত কাল।
অনন্ত সে যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে মুষ্টিমেয় পড়ে আছে
তোমার পায়ের কাছে।
আর এত বড় যে পৃথিবী সে তোমার মছলন্দখানার চেয়ে
অধিকতর প্রসর নয়।

আমি দেখতে পাচ্ছি
তোমার চরণ দুখানি ঘিরে ঝালর ঝুলিয়েছে
শুভ্র শাড়ির সবুজ পাড় ;
চলনের তালে চঞ্চল,
পরনের ভঙ্গীতে কুঞ্চিত,
সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রান্ত
যেন তালে তালে স্তব ক'রে নাচছে সুন্দরী পৃথিবীর।

আমি কি তোমাকে দেখিনি,
অষ্টমী-চন্দ্রের দিব্য কমণ্ডলু
যখন ঢেলে দিয়েছে তোমার শিরে শুভ্র জ্যোৎস্না !
আমি কি তোমাকে দেখিনি,
গোধূলির চেলিতে অপরূপ, অপূর্ব !
আমি যে দেখেছি
কামনার-কুঁড়ি-ভরা তোমার অধরোষ্ঠ !
আমি যে দেখেছি
কিশোরী পূজারিণীর নিপুণ হাতে গড়া
শিবপূজার যুগল বেদী তোমার বক্ষে !
আর দেখেছি
সৃষ্টির শেষদিগন্তের রহস্যময় তোমার দুটি নেত্র,
উমার পূর্বরাগের মত তোমার কপোল,
শচীর দর্পণের মত তোমার ললাট।
কিন্তু সুন্দরী,
আজ সে সমস্ত হার মেনেছে
তোমার ওই চরণ-দুখানির কাছে।
আজ ইচ্ছা করছে আমার হৃদয়খানাকে
প্রচণ্ড বলে আছড়ে ফেলে দিই তোমার পায়ের তলে,

আকাশ কেন এত সুন্দর ?
পৃথিবী কেন মোহাঞ্জনময় ?

তোমার দিকে তাকালে
উত্তরের যেন আভাস পাই।
তোমার মুখে চোখে কপোলে,
তোমার অঞ্চলের মালিনীতে,
তোমার কুন্তলের ভুজঙ্গপ্রয়াতে,
তোমার কণ্ঠের স্রগ্ধরায়,
মন্দাক্রান্তায় তোমার চরণের,
তোমার ললাটের বসন্ততিলকে
আর
তোমার বক্ষের শিখরিণীচ্ছন্দে
এই রহস্যের সদুত্তর যেন লিখিত।
হে সুন্দরী,
তুমি এই বিশ্বকাব্যের
অনির্বচনীয়া মনোরমা-টীকা।
তোমাকে দেখে ওদের কতক বুঝি ॥

দ্যূতক্রীড়া

সদ্যঃপাতী শিউলি ফুলের স্পর্শের মত
এই সকালটি।
হাওয়াতে দুলছে কাশের চামর,
আলোতে উড়ছে হাঁসের সারি,
টুপ টুপ ক'রে মনের মধ্যে ঝরছে
মালতী ফুল,
শিশির ফোঁটার পথ চিহ্ন হারিয়ে
শরৎ পড়েছে এসে।

হঠাৎ পট-পরিবর্তন হ'ল।
কিরাতের মত মেঘের ছায়া নেমেছে অরণ্যে,
নেমেছে পাহাড়ের গায়ে,
প্রস্ফীত হয়ে উঠল পাহাড়ের শিরাধমনী
নির্ঝরিণীর উচ্ছ্বাসে,
কালো কালো মেঘের ছায়া
বনে বনে ছড়িয়ে দিল আলোর ফাঁদ।
শরতের আর বর্ষার দ্যূতক্রীড়া আরব্ধ।
পণে বদ্ধ স্বয়ং প্রকৃতি।

মেঘের ফাঁক দিয়ে আলোকের শুভ্র পাশা
ছড়িয়ে গেল ছক-কাটা বনভূমে,
বেজে উঠল ঝরনার ঝন্‌-ঝনা।

আবার
ছায়ার হাতে কুড়িয়ে নিল আলোর পাশা;
চারিদিক অন্ধকার,
নূতন দানের প্রতীক্ষায় বনভূমি রুদ্ধবাক্।
ঐ যে আবার আলোর অক্ষ ছড়িয়ে পড়ল
নূতন সম্ভাবনায়,
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে জাগল
হাসির চমক।
হাল্কা মেঘের চাদর জড়িয়ে
প্রকৃতি আজ কম্পমান।
চারিদিকে বীর চূড়া যত নিস্তব্ধ।
প্রকৃতিকে নির্গুণ্ঠন করবার জন্যে উদ্যত
হাওয়ার হাত,
মেঘের প্রান্ত ধ'রে কী দুঃসহ আকর্ষণ!
প্রকৃতির নেত্র ছল-ছল।

কিন্তু ঐ ছায়াবসনের অন্ত কোথায় ?
যত টানছে
আলো-ছায়ার ছোপ-দেওয়া বসন
পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে পাহাড়ে পাহাড়ে,
তার অন্ত নাই।
বনে বনে ছড়িয়ে পড়ছে,
মাঠে মাঠে বিছিয়ে যাচ্ছে,
দিগন্তরে জমে উঠছে
আলোর তাঁতে-বোনা নূতন মেঘের নীলাম্বরী।
অন্ত নাই তার, অন্ত নাই ॥

সাঁওতাল পরগনার মাঠ

আমার ভালো লাগে এই সাঁওতাল পরগনার মাঠ।
রিক্ত অথচ শূন্য নয়,
যেমন রিক্ত তবু শূন্য নয়
এখানকার সাঁওতালদের দেহ।
তাদের কালো দেহে আলো পিছলে পড়ে
যমুনার তরঙ্গে রৌদ্রকণার মত।

দিগন্তে নীল ছায়ার পর্দাটানা, বন্ধুর গিরিশ্রেণী
সারিবদ্ধ উষ্ট্রযূথের মত।
গড়িয়ে নেমে এসেছে মাঠ,
তার নিম্নতম প্রান্তে আছে
অদৃশ্য জয়ন্তীর স্বচ্ছ-ধারা,
মৈনাকের শাবকের মত
কালো-পাথর-বের-হওয়া স্বচ্ছতোয়া ফল্গু।

প্রান্তরের ইতস্তত গাছ,
শাল, মহুয়া, হর্তুকি ;
না বন, না বাগান।
এদিকে স্বল্পায়ত লোকালয়ে প্রাচীরঘেরা সব কুঠি।
রঙন, চাঁপা, সূর্যমুখী,
জবা আর জুঁই,
গোলকচাঁপায় আর করবীতে মেশমেশি,
ঝরাফুলের-আলপনা-আঁকা মাঝে মাঝে শিউলির গাছ।
সকাল-সন্ধ্যায় ইউক্যালিপ্‌টাস বনের গন্ধ-বিছানো আকাশ,
আর আছে স্থলপদ্ম।

আশ্বিনের ভোরের আকাশ ওই স্থলপদ্মের মত,
বর্ণাতীত বর্ণে ঝলমল করতে থাকে।
আকাশে আর ফুলে বর্ণবিপর্যয় চলে
প্রহরে প্রহরে ;
একই শিল্পীর একই তূলির টান।
শেষকালে দেখি সন্ধ্যাবেলা ছুটিই নত হয়ে পড়েছে
রঙের ভারে ;
রক্তিম আকাশের পটে আরক্ত স্থলপদ্মের দল,
একই শিল্পীর একই তূলির টান।

ছাতামেলা গুল্‌মোরের সবুজ ছায়ায়
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।
কাক ডাকে, শালিক চরে,
ধূর্ত কাঠবিড়ালি ছোটে আর থমকে দাঁড়ায় ;
গোরু চরছে,
আসছে তাদের ঘাস ছেঁড়ার সম্মিলিত ঐক্যতান।
পথিক বিরল, পথ দীর্ঘ।

হঠাৎ কোথা দিয়ে কি পরিবর্তন ঘ'টে যায়।
সোনার রৌদ্র মধুখোর মৌমাছির মত গুঞ্জরণ ক'রে ওঠে ;
ইন্দ্রাণীর সোনা-মেলা নীল আকাশ উর্ধ্বে যায় উড়ে
ছাড়া-পাওয়া নীলকণ্ঠের মত।
আকাশ যেখানে উপুড় হয়ে পড়েছে পৃথিবীর উপরে
একজোড়া খঞ্জনীর মত
সেখানে কী সুর ধ্বনিত হ'তে থাকে।
বিশ্বের প্রান্ত দিয়ে যেন কোন্ বাউল চলেছে
খঞ্জনী বাজিয়ে,
এ সবই যেন তার গান !
এই মাঠঘাট, নদীগিরি, অরণ্যকান্তার,
এই তরুশ্রেণী, এই শস্যক্ষেত্র,
আর এই লোকবিরল লোকালয়,
তারই গানের এক একটি কলি।
হঠাৎ বিশ্বের নিঃশ্বাস এসে গায়ে লাগে।
জলবিন্দু সমুদ্রে যায় মিশে,
ভুলে যাই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি গুল্‌মোরের ছায়ায়॥

যৌবনের সূর্যাস্ত

যৌবনের সূর্যাস্ত আজ তোমার অঙ্গে।
ঘনতর বনচ্ছায়া
বিলুণ্ঠিত তোমার কেশে,
দূর দিগন্তের কালো আভা
চোখের কোলে কোলে দুলছে,
আর ওই ভুরুর খিলানের তল দিয়ে
নীড়ে-ফেরা হাঁসের দল এখনি উড়ে চলে গিয়েছে,

পক্ষ-বিধূননে
এখনো চোখের পক্ষ্মগুলি কম্পিত।
যৌবনের সূর্যাস্ত আজ তোমার অঙ্গে ॥

এখনো অধর তার মাধুরী হারায়নি,
এখনো গালের গোলাপ দুটি প্রগল্‌ভ,
ললাটের নিষ্কল দর্পণ এখনো
মনোরথের মুকুর,
চিবুক সুকুমার,
তবু,
রজনীগন্ধার গ্রীবাতে নেমেছে
সন্ধ্যার কোমলতা।
যৌবনের সূর্যাস্ত আজ তোমার অঙ্গে ॥

কৈশোরে যখন তোমার লাবণ্য
দিনে দিনে উন্মীলিত হচ্ছিল,
তখন আমি ছিলাম না।
কোথায় ছিলাম ?
তুমি ছিলে তবু আমি ছিলাম না,
এ রহস্যের অন্ত নাই।
তবু তো তোমার লাবণ্যমুকুল মঞ্জরিত হচ্ছিল।
তারপরে এলো যৌবন।
কনককিরণদ্রব মধুমাধুর্যভারাবনত
দীপ্ত দ্বিপ্রহরের মত
তোমার দুঃসহ যৌবন
ফেটে পড়বার মুখে,
বিশ্বের নিষ্পেষণ যেন অনুভব করছে
তোমার উদ্বেল বক্ষ,

আকাশের চুম্বন যেন অনুভব করছে
শুক্তিপাণ্ডু তোমার দুটি কপোল,
ইন্দ্রাণীর নীলাম্বরের প্রান্ত দুলে দুলে ওঠে
তোমার কুন্তলে,
তোমার নিপুণ অঙ্গুলির লঘু চাতুর্যের দিকে
তাকিয়ে রয়েছে বীণাহারা উর্বশী,
আর,
কুন্দ-সুকুমার চরণ-দুটির ধ্যানরসে
মেনকা আজ নৃত্যভোলা।
তোমারি বঙ্কিম অধরচিহ্ন ওই চন্দ্রে,
ছায়াপথে তোমারি ওহাড়নী লুণ্ঠিত,
তোমার সৌন্দর্যের তাপে তপ্ত হয়ে উঠেছে
পঞ্চশরের শরগুলি,
ধূর্জটির ধ্যানে লাগছে উদ্‌ভ্রান্তি,
তোমার যৌবনের প্রচণ্ড বাণাঘাতে
বিশ্বের ভোগবতীকে দিলে উচ্ছ্বসিত ক'রে।
সেদিন ছিল তোমার যৌবন।
সেই যৌবনের সূর্যাস্ত আজ তোমার অঙ্গে ॥

এখনো চন্দ্রোদয় বাকি।
তপস্বিনী মহাশ্বেতার মত চতুর্থীর চন্দ্রকলা
কৃষ্ণ-কমণ্ডলু থেকে ঢেলে দেবে
স্বর্গীয় কিরণ তোমার ললাটে,
সেই হবে তোমার অভিষেক,
অসমাপ্ত যৌবনের অপার্থিব উপসংহার,
অপরিতৃপ্ত বেদনার দিব্য সমবেদনা,
তৃষ্ণার তিরোধান,

নিষ্ফল দ্রাক্ষাগুচ্ছের নির্যাসিত সুরায়
সুরসভার উৎসব হবে সম্পন্ন।
তারপরে আছে কবি।
যৌবনের সূর্যাস্ত আজ তোমার অঙ্গে ॥

এমন সুন্দর তোমাকে আগে কখনও দেখিনি,
দিবস-রাত্রির সম্মিলিত নিপুণতায়
আজ এ কি তোমার বধূসজ্জা!
অস্তোদয়োন্মুখ চন্দ্রসূর্য
বহন করছে তোমার চতুর্দোলা,
সীমন্তে তোমার গোধূলির চেলি,
চোখে তোমার প্রশান্ত বিষাদ,
এ যদি সৌন্দর্য নয়,
তবে সৌন্দর্য আর কাকে বলে?
অক্ষয় হোক এই সূর্যাস্তের মাধুরী।
যৌবনের সূর্যাস্ত আজ তোমার অঙ্গে ॥

উত্তরমেঘ

তুমি লিখেছ, কি ভাবছি।
তোমার বাংলোর জানালা দিয়ে
যে-পাহাড়টার চূড়া দেখা যায়,
আষাঢ় মেঘের কালো ছায়া সেখানে কী মায়া বিস্তার করে
তাই ভাবছি।
ভোর থেকে দিগন্তে মেঘ জমে,
মেঘের সীমানা আর বনের সীমানা এক হয়ে যায়।

তোমার চরণ ছুটি ঘিরে
শনিগ্রহের মেখলার মত
অঙ্কিত করুক এক তপ্ত রক্ত মত্ত দীপ্ত অলক্তকের বেষ্টনী।

আমার বাসনার ফুলবনের উপর দিয়ে
ওই ছুটি চরণ চলে যাক,
আমার কামনার দ্রাক্ষাবন দলে যাক,
আমার কানে কানে বলে যাক,
'ধরা দিইনি বলেই ধরতে চাইছো,
অন্বেষণেই তো মৃগয়ার আনন্দ।
স্বর্ণমৃগী ধরা দেয় না বটে,
তাইতো সেই মৃগয়াসুখেরও অবসান নেই কোনো কালে।
জানালা দিয়ে মন যায় না,
তাইতো জানালা এমন মোহিনীর মন্ত্র পড়া।'
ভোগবতীর হংসমিথুনের মত
ওই চরণ ছুটি আমার কানে কানে বলুক,
'জানালায় ব'সে যদি সুধার স্বাদ পাও
তবে দ্বারের সন্ধান ক'রো না।'
চমকে উঠি!
আমি তো জানালাতেই ব'সে।
আমার নামবার তাড়া কিসের?

ট্রেন ছাড়ে ছাড়ুক,
আমায় বাতায়নিকাকে কাড়বে এমন সাধ্য কার?
আমি জানি টাইম-টেব্‌ল পড়বার আনন্দ
দেশভ্রমণে নেই।
তাই আমি একা একা টাইম-টেব্‌ল পড়ি
জানালার ধারে ব'সে॥

ভাঙা পেয়ালা

আমি নিশ্চয় জানি তুমি এ বাড়িতে নেই,
তবু সংশয় যায় না,
আশার টুকরো ভেসে ভেসে ওঠে
নদীর কালো জলে তারার আলোর মত,
পরিপূর্ণ নিশ্চয়ের উপরে
অনিশ্চয়ের আশ্বাস,
পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডলে চকোরের কলঙ্ক।

হঠাৎ মনে হ'ল ওই চৌকাঠের ফ্রেমে
এখনি সন্নদ্ধ হবে তোমার মূর্তি,
পূর্বাশার পটে রহস্যময়ী উষা।
মনে হ'ল এখনি তোমার স্বপ্ন-নাড়া-দেওয়া কণ্ঠস্বর
ধ্বনিত হবে—হ'ল না,
মনে হ'ল জনান্তর-সৌহৃদানি-জাগানো তোমার আঁচলের সুগন্ধ
প্রবাহিত হবে—হ'ল না,
মনে হ'ল কোন্ দৈব মৃগয়ার
বিভ্রান্ত কৃষ্ণসার চন্দ্রকলার মত
হঠাৎ প্রবেশ করবে তুমি পুরূরবার অগম্য আমার মনের গহন অরণ্যে,
মনে হ'ল—কিন্তু বৃথা মনে হওয়ার
তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই,
তুমি ছিলে না,
তাই এলে না।
থাকলে আসতে
যেমন এসেছ আগে হাজারবার।
ঘোমটা মাথায় টেনে
আঁচলটা সামলে নিয়ে,

তোমার চরণ দুটি ঘিরে
শনিগ্রহের মেখলার মত
অঙ্কিত করুক এক তপ্ত রক্ত মত্ত দীপ্ত অলক্তকের বেষ্টনী।

আমার বাসনার ফুলবনের উপর দিয়ে
ওই দুটি চরণ চলে যাক,
আমার কামনার দ্রাক্ষাবন দলে যাক,
আমার কানে কানে বলে যাক,
'ধরা দিইনি বলেই ধরতে চাইছো,
অন্বেষণেই তো মৃগয়ার আনন্দ।
স্বর্ণমৃগী ধরা দেয় না বটে,
তাইতো সেই মৃগয়াসুখেরও অবসান নেই কোনো কালে।
জানালা দিয়ে মন যায় না,
তাইতো জানালা এমন মোহিনীর মন্ত্র পড়া।'
ভোগবতীর হংসমিথুনের মত
ওই চরণ দুটি আমার কানে কানে বলুক,
'জানালায় ব'সে যদি সুধার স্বাদ পাও
তবে দ্বারের সন্ধান ক'রো না।'
চমকে উঠি!
আমি তো জানালাতেই ব'সে।
আমার নামবার তাড়া কিসের?

ট্রেন ছাড়ে ছাড়ুক,
আমায় বাতায়নিকাকে কাড়বে এমন সাধ্য কার?
আমি জানি টাইম-টেব্‌ল পড়বার আনন্দ
দেশভ্রমণে নেই।
তাই আমি একা একা টাইম-টেব্‌ল পড়ি
জানালার ধারে ব'সে॥

ভাঙা পেয়ালা

আমি নিশ্চয় জানি তুমি এ বাড়িতে নেই,
তবু সংশয় যায় না,
আশার টুকরো ভেসে ভেসে ওঠে
নদীর কালো জলে তারার আলোর মত,
পরিপূর্ণ নিশ্চয়ের উপরে
অনিশ্চয়ের আশ্বাস,
পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডলে চকোরের কলঙ্ক।

হঠাৎ মনে হ'ল ওই চৌকাঠের ফ্রেমে
এখনি সন্নদ্ধ হবে তোমার মূর্তি,
পূর্বাশার পটে রহস্যময়ী ঊষা।
মনে হ'ল এখনি তোমার স্বপ্ন-নাড়া-দেওয়া কণ্ঠস্বর
ধ্বনিত হবে—হ'ল না,
মনে হ'ল জন্মান্তর-সৌহৃদানি-জাগানো তোমার আঁচলের সুগন্ধ
প্রবাহিত হবে—হ'ল না,
মনে হ'ল কোন্ দৈব মৃগয়ার
বিভ্রান্ত কৃষ্ণসার চন্দ্রকলার মত
হঠাৎ প্রবেশ করবে তুমি পুরূরবার অগম্য আমার মনের গহন অরণ্যে,
মনে হ'ল—কিন্তু বৃথা মনে হওয়ার
তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই,
তুমি ছিলে না,
তাই এলে না।
থাকলে আসতে
যেমন এসেছ আগে হাজারবার।
ঘোমটা মাথায় টেনে
আঁচলটা সামলে নিয়ে,

তোমার চরণ দুটি ঘিরে
শনিগ্রহের মেখলার মত
অঙ্কিত করুক এক তপ্ত রক্ত মত্ত দীপ্ত অলক্তকের বেষ্টনী।

আমার বাসনার ফুলবনের উপর দিয়ে
ওই দুটি চরণ চলে যাক,
আমার কামনার দ্রাক্ষাবন দলে যাক,
আমার কানে কানে বলে যাক,
'ধরা দিইনি বলেই ধরতে চাইছো,
অন্বেষণেই তো মৃগয়ার আনন্দ।
স্বর্ণমৃগী ধরা দেয় না বটে,
তাইতো সেই মৃগয়াসুখেরও অবসান নেই কোনো কালে।
জানালা দিয়ে মন যায় না,
তাইতো জানালা এমন মোহিনীর মন্ত্র পড়া।'
ভোগবতীর হংসমিথুনের মত
ওই চরণ দুটি আমার কানে কানে বলুক,
'জানালায় ব'সে যদি সুধার স্বাদ পাও
তবে দ্বারের সন্ধান ক'রো না।'
চমকে উঠি।
আমি তো জানালাতেই ব'সে।
আমার নামবার তাড়া কিসের?

ট্রেন ছাড়ে ছাড়ুক,
আমায় বাতায়নিকাকে কাড়বে এমন সাধ্য কার?
আমি জানি টাইম-টেব্‌ল পড়বার আনন্দ
দেশভ্রমণে নেই।
তাই আমি একা একা টাইম-টেব্‌ল পড়ি
জানালার ধারে ব'সে॥

ভাঙা পেয়ালা

আমি নিশ্চয় জানি তুমি এ বাড়িতে নেই,
তবু সংশয় যায় না,
আশার টুকরো ভেসে ভেসে ওঠে
নদীর কালো জলে তারার আলোর মত,
পরিপূর্ণ নিশ্চয়ের উপরে
অনিশ্চয়ের আশ্বাস,
পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডলে চকোরের কলঙ্ক।

হঠাৎ মনে হ'ল ওই চৌকাঠের ফ্রেমে
এখনি সন্নদ্ধ হবে তোমার মূর্তি,
পূর্বাশার পটে রহস্যময়ী উষা।
মনে হ'ল এখনি তোমার স্বপ্ন-নাড়া-দেওয়া কণ্ঠস্বর
ধ্বনিত হবে—হ'ল না,
মনে হ'ল জননান্তর-সৌহৃদানি-জাগানো তোমার আঁচলের সুগন্ধ
প্রবাহিত হবে—হ'ল না,
মনে হ'ল কোন্ দৈব মৃগয়ার
বিভ্রান্ত কৃষ্ণসার চন্দ্রকলার মত
হঠাৎ প্রবেশ করবে তুমি পুরূরবার অগম্য আমার মনের গহন অরণ্যে,
মনে হ'ল—কিন্তু বৃথা মনে হওয়ার
তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই,
তুমি ছিলে না,
তাই এলে না।
থাকলে আসতে
যেমন এসেছ আগে হাজারবার।
ঘোমটা মাথায় টেনে
আঁচলটা সামলে নিয়ে,

দর্পণকে সাক্ষী ক'রে
মুখের উপরে একবার দ্রুত হাত বুলিয়ে নিয়ে।
তারপরে আরম্ভ হ'ত তুচ্ছ কথার গীতাপাঠ।

চায়ের সময় হ'লে পেয়ালা-চামচে টুং টাং
শব্দ তুলে চা ঢালতে,
দুধে আর চায়ে কেমন মিশতো,
যেন দৈবী উষার আবির্ভাব।
রঙের সঙ্গে রঙের জোড় লাগতো আকাশে,
পর্দায় পর্দায় ঘটতো মেলবন্ধন,
কাকলির কলধ্বনি উঠতো চামচে আর পেয়ালায়।
লোক যতই থাক না,
আমার ভাগ্যে পড়তো ভাঙা পেয়ালাটা!
ভাঙা পেয়ালার ভাগ্য নিয়েই এসেছি সংসারে,
আস্ত পেয়ালা আর জুটল না।
না-ই জুটল—দুঃখ নাই।
ভাঙা পেয়ালায় যে চাক-ভাঙা মধু পেয়েছি
তা কয়জনে পায়?
ভাঙা পেয়ালায় পেয়েছি তোমার বিশ্বাস,
ভাঙা পেয়ালা তোমার পরাজয়ের ভগ্নদূত,
ওতেই স্বীকার ক'রে ফেলেছ
ভাঙা পেয়ালার অপমানে লোকটা পালাবে না;
ওই ভাঙা পেয়ালাতেই আমি চিহ্নিত,
আমি বিশিষ্ট
তোমার আপনার ব'লে।
চিরন্তন হয়ে থাক আমার ভাঙা পেয়ালা,
আস্ত-র দাবি আমি রাখবো না।

কিন্তু আজ তুমি নেই।
থাকলে আসতে
আর ভাঙা পেয়ালাটা এগিয়ে দিতে আমার দিকে,
অষ্টমী শশীর ভাঙা পেয়ালায়
রজনী যেমন বিশ্বকে দেয় সুধা॥

তার ছোটবোনের দিদি

হঠাৎ তার ছোটবোন ঘরে ঢুকলো,
চমকে উঠলাম,
একবার মনে হ'ল ছোটবোন নয়—তার দিদিই!
কিন্তু তখনই,
এক পলকেই
ভাঙা-গড়া নিঃশেষ হয়ে গেল।
সেই একটি মুহূর্তের দোলনায়
দুলে চলে গেল আশা আর নৈরাশ্য।
না, সে নয়—তার বোন!

বাস্তবিক দুই বোনে কতখান মিল!
পিছন থেকে দেখলে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়।
এমন কি আমার মত দৃষ্টিরসিকেরও
ভুল তো হ'ল!
শাড়ির মিলের কথা
সে না হয় না-ই ধরলাম,
নিতান্তই আকস্মিক।
কিন্তু শাড়ি পরবার ভঙ্গী,
চলবার ভঙ্গী,
গ্রীবাভঙ্গাভিরাম বেণীর সেই দুলুনি!
আর কুন্তলাগ্রের অকারণ কুঞ্চিমা!

সবই এক রকম,
তবু এক নয়,
কেন না সে তার বোনটি মাত্র !

এক রকম, তবু এক নয় !
বোনটি গম্ভীর, বৃষ্টিথামা আষাঢ়সন্ধ্যার যূথীর মত
একটু নাড়া দিতেই ঝর ঝর ক'রে
জল পড়ে তার চোখ দিয়ে।
কথা কয় না,
তবু বুঝতে পারা যায় মনে কথার অভাব নেই,
অস্ফুট কাঞ্চনের হাল্কা পাপড়ির মত
ঠোঁট দুটো যেন নড়ছেই।
চোখের কোণে কৌতুককণিকা
ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে
গোপন কৌতূহলের প্রচণ্ড আবেগে ;
চাপা ঠোঁটে চিকিমিকি হাসি।
বোঝে সব, কেবল না-বোঝার ঘোমটা টেনে
বোকা সেজে আছে।
এই তার বোনটি।

আর—তার দিদি ?
সে যেন চাঁপার ফুল,
সূর্যের আলোর সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা।
চাঁদের আলো-কে দেয় ধিক্কার,
বলে মেয়েলি !
সূর্যের আলোর তীব্র হলাহলে যে-আকাশ নীলকণ্ঠ
সে যেন তারই পার্বতী !

চোখে তার জল দেখিনি,
কিন্তু কান পেতে শুনেছি
তার অন্তর্লোকের
বিরহ-কল-কলিত গলিত বেদনার তরল বেণীবিন্যাসের
অনির্বচনীয় বিলাপ।
প্রেমের কথা শুনিনি তার মুখে,
কিন্তু প্রেমের বাষ্প দেখেছি তার
মুখে চোখে সর্বাঙ্গে,
যেমন গিরিচূড়ার পথিক দেখতে পায়
অতলস্পর্শী খাদ থেকে উদ্গত পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্পীয় নিঃশ্বাস।

মিষ্টি কথা শুনলে সে হেসে ওঠে,
দুঃখ দেখলে তার চোখে পড়ে কোমল ছায়া,
দাবানলভীত মৃগযূথের মত
প্রেমের বিলাস ছুটে পালায়
তার কিণাঙ্ককটাক্ষে।
সে যোগীর হাতের সুধাপাত্র,
সে ভোগীর হাতের হলাহল,
যে-আঘাত সে নিজে করেছে
সে তারই বিশল্যকরণী।
এই হচ্ছে গিয়ে সে, অর্থাৎ
তার বোনের দিদি!

বর্ণনা থেকে মনে হবে
কবির কিছু পক্ষপাত আছে তার প্রতি।
কথাটা অস্বীকার্য নয়।
তবু বোনটির প্রতিও কৃতজ্ঞতা কম নয়;

দিদির কটূকথায়
বোনের চোখে কোমলতা দেখেছি ;
দিদির কথার প্রতিষেধক
হচ্ছে তার বোনটি।
তবু বোন তো দিদি নয়, বোনই !

আজ তার বোনকে দেখে চমকে উঠলাম !
এক মুহূর্তেই গ'লে পড়লো
শিশিরকণার মুক্তোর মত।
কিন্তু সেই ভুলের মুহূর্তই বা কম কি !
জীবনে কত ভুলই তো করছি,
এমন ভুল তো বেশি হয় না।
তার বোনও যে একটি মাত্র !
আর তার দিদি—
সে তো একমেবাদ্বিতীয়ম্॥

চিরন্তন

মস্ত মাঠের মাঝখানে
ছোট্ট এক টুকরো জমি,
গোটা বারো মেহগনির
বারোয়ারি মেলা,
একদিকে একখানা কাঠের বেঞ্চি,
যুগলের দুর্লভ আসন।
একদিন দুজনে গিয়ে সেখানে বসেছিল।

তখন শীতের অপরাহ্ন।
গাছের পাতার আগায় আগায়
রোদের ফোঁটা
নিভবার আগে উজ্জ্বল।
শীতল বাতাস ঘরে-ফেলে-আসা
গাত্রবাসখানি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।
পুরুষ বলল—আমি তোমাকে ভালোবাসি।
নারী নীরব হয়ে শুনলো।

গাছের একটা শুকনো পাতা
বাতাসে উলটপালট খেতে খেতে
ওই কতদূরে গিয়ে পড়লো!
পুরুষ আবার বলল—তুমি কি সুন্দর!
নারী অবাক্ হয়ে শুনল।
দিগ্বলয়ে ডুবন্ত সূর্য
চুনি-বসানো অঙ্গুরীয়ের মত অপূর্ব।

হঠাৎ কালো মেঘের তল থেকে বেরিয়ে পড়লো
কিরণচ্ছটায় প্রস্ফারিত কলাপ,
যেন ষড়াননের মত্ত শিখী
পক্ষ বিস্তার করে নাচছে।
পুরুষ বলল—তুমি অপরূপ।
নারী রইলো চুপ ক'রে।

মাঠের চার প্রান্ত ঘিরে রাজপথ,
শতশত শকটের আনাগোনায় সচল।
যেন জগৎচক্র চলছে,
যেন বিশ্বঘুর্ণি ঘুরছে,

যেন কালাম্বুধির তরঙ্গমালা
নিরন্তর আছাড় খেয়ে পড়ছে আর উঠছে।
আর মাঝখানে বসে রয়েছে
চিরন্তন পুরুষ আর নারী।

একজন বলে, আর-জন শোনে,
একজন দেয়, আর-জন নেয়,
একজনের চিরন্তন প্রশ্ন,
আর একজনের চির-নিরুত্তর।
একজনের চিরন্তন তৃষ্ণা,
আর একজনের অফুরন্ত সুধা।
সে তৃষ্ণাও মিটবে না,
সে পাত্রও শূন্য হবে না,
শুধু দুইজনে মুখোমুখি চেয়ে বসে থাকবে, অনন্তকাল।
ওইখানেই বিশ্বের চিরদিনের রহস্য ॥

বলো, বলো, বলো

তুমি আমার মনের কথা জেনে ফেলেছো,
ওইখানে তোমার জিত।
আমি তোমার মনের কথা জানতে পারলাম কই ?
আপন অন্তরের অগাধ রহস্যের মধ্যে বসে আছো,
অমাবস্যার করপুটে
দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলাটির মত।
ঠিক এতটুকু আলো
যাতে দেখা না দিয়েও দেখতে পারো অনায়াসে।
সত্যি, তোমায় জানতে পারলাম কই !
যদি বলি—তোমায় ভালোবাসি,

তুমি হাসো।
যদি শুধাই—আমায় ভালোবাসো ?
বলো—না।
এত নিশ্চিত, এত অসংশয়।
মরুভূমির সূর্যোদয়ও বুঝি
এত নিষ্কলুষ নয়।

যদি বলি—কেন ভালো লাগে না ?
অমনি বলো—কেন-র উত্তর নেই।
এতদিনেও এই প্রশ্নটির উত্তর পেলাম না।
ছোট একটি প্রশ্নের কী মহতী সম্ভাবনা !
কেবলি শুধাই—কেন, কেন, কেন ?
কেবলি উত্তর পাই—কেন-র আবার উত্তর কি !
ওই উত্তরহীন উত্তর দেবার সময়ে
কখনো মুখ তুলে চাওনি।
হঠাৎ একদিন চোখে চোখে গেল ঠেকে,
প্রত্যাশিত উত্তর গেল বেধে,
শুধু বললে—তুমি না কবি !
বললে—কবিরা নাকি অন্তর্যামী !

না গো না, তবে আমিও বলি,
আমি কবি নই, শিল্পী নই, আমি অন্তর্যামী নই,
আমি মনের কথা মুখে শুনতে চাই ;
মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার দুই চক্ষে প্রস্ফুটিত
মানসসরের অন্তর্ভেদী উদ্ধত, উদ্গত,
উদ্যত, পূর্ণায়ত পদ্মটির মত ;

আমি মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার সর্বাঙ্গে প্রতিফলিত,
তোমার বসনে ভূষণে,
নয়নে অধরে,
তোমার সিঁথির সীমান্ত থেকে
পায়ের নখাগ্র অবধি,
সূর্যকিরণে কচি নারিকেলগুচ্ছ
যেমন চোখ ঝলসিয়ে দিতে থাকে, তেমনি।
প্রসারিত পদ্মপত্রের মসৃণ নীলিমায়
সেই কথাটি টলমল ক'রে উঠুক
তোমার অন্তরের শুক্তি-নিঃসৃত
একটিমাত্র মুক্তার মত!
বলো, বলো, বলো॥

জুলিয়া

ভোরে ঘুম ভেঙে দেখি
সমুদ্র খচিত হয়ে উঠেছে
ডিঙির রেখায়,
একটি ক'রে দাগ, দুটি কালো বিন্দু,
একখানা ডিঙি
আর দু'জন জেলে।
ক্রমে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ে,
আকাশের গায়ে চিলের মত
দূরে, আরো দূরে,
একেবারে দৃষ্টির সীমান্তের ওপারে।

দূরের সমুদ্র
নিশ্বাসপ্রশ্বাসে দুলছে,
আর তীরের কাছে
ফেনার ঝালরের অবিরাম ঝাপ্‌টা।

শীতের দিনে ওরা চলে যায় অনেক দূরে।
সমুদ্র তখন শান্ত।
কত দূরে?
ওরা বলে পাঁচ ক্রোশ, দশ ক্রোশ,
সে-সব কেবল অনুমান।
ওদের আসল নিশানা
শ্রীমন্দিরের চূড়া।
সেই চূড়া ক্রমে ছোট হয়ে আসে,
সূর্য ওঠে মাথার উপরে,
সূর্য হেলে পশ্চিমে,
মন্দিরের চূড়াও হেলে পড়ে,
এবারে চূড়া ডুবু-ডুবু,
দেখা যায় কি না যায়।
কেবল দেখা যায় চূড়ায় সূর্য,
তাতে সুদর্শন চক্রের প্রভা।
এই অবধি ওদের সীমা।

ওধারের সমুদ্র ওদের চোখে
ভীষণ-করাল,
চিরান্ধকার,
দৈত্যের হাঁ-এর মত অতলস্পর্শ।
আর,
এধারের সমুদ্র নীলাচলের ছায়ায় শিষ্ট
মন্ত্রপূত আর স্নিগ্ধ।

এ দুয়ের মাঝখানে আছে এক চোরাপাহাড়
জলের অনেক নীচে।
ওরা নামিয়ে দেয় সেখানে পাথর-বাঁধা দড়ি,
পাহাড়ের গায়ে শব্দ ওঠে,
বেরিয়ে আসে
বড় বড় সব মাছ,
ধরা পড়ে ওদের জালে।

ওরা ফেরে।
জলতল ভেদ ক'রে দীর্ঘতর হয় চূড়া,
সাথে দীর্ঘতর হয় পৃথিবীর ছায়া।
দেখা যায় পৃথিবীর দিগন্তে
মর্চে-পড়া লৌহচক্রের মত ;
ক্রমে সেই চাকায় জাগে
বনের নীলিমা,
ঝাউ নারিকেলের মাথা,
রৌদ্রে ঝিকিয়ে ওঠে
হর্ম্যরাজির শুভ্রতা।
ক্রমে সৌধমালা আর অরণ্যের
গাঁটছড়া যায় খুলে।
জলের প্রান্তে জাগে
সৈকতের শুভ্রলেখা,
নীলিমার প্রান্তে শুক্লা দ্বিতীয়ার শশী
আর,
সকলকে ছাপিয়ে ওঠে,
আকাশটাকে ঠেলে দিয়ে
শ্রীমন্দিরের তর্জনী,
'জয় জগন্নাথ, জয়!'

ওরা যেখানেই থাক,
বাঁধা থাকে এক অদৃশ্য সূতোয়
ঐ মন্দিরের সঙ্গে,
তাই ওরা এমন নির্ভয় ॥

দুর্জ্ঞেয়

পথের মোড় ঘুরতেই
রুপোর মিনে-করা লোহার হাতুড়ির মত
বুকের উপরে নিক্ষিপ্ত হ'ল
সমুদ্র,
যতদূর চোখ চলে ইস্পাত-ধূসর।
অসীম বিস্ময়,
অনন্ত বেদনা!

মহৎ সৌন্দর্যে মহৎ আঘাত।
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র উদ্বেল,
স্খলদুল্কার তিলক-পরা প্রকৃতি
তাই ভৈরবীর মত মনোজ্ঞা,
দাবাগ্নির গোধূলির আকর্ষণ তাই
চক্রবাক-মিথুনকে,
দুর্গম মেরুর সঙ্কেতে অভিসারিকার মত
চঞ্চল তাই
চুম্বকের শলাকা,
তাই সমুদ্র এঁকে দিল ভৃগুপদ-সংঘাত
আমার বক্ষে।

দিনের আলোয় দেখি
নীলের মধ্যে চমকিয়ে ওঠে
ফেনার বলাকা ;
কাছে আসে আর জোট বাঁধে,
তীরের কাছে হাঁসের সুদীর্ঘ সারি,
ফেনশুভ্র,
শুক্তিস্বচ্ছ,
অর্ধচন্দ্র।
একটার পরে একটা
আসছে, ভাঙছে,
আবার নূতন ক'রে গড়ছে,
আকাশে ছিটে উঠছে
জলের চামর,
নিরন্তর,
নিরবধি।
আর রাতের বেলায়
অনন্ত কালোর মধ্যে
এ যেন ফেনার বিদ্যুৎ !
মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে শাখা-প্রশাখায়
কোন্ দিক্ থেকে কোন্ দিকে !
অসীম বিস্ময়,
অনন্ত বেদনা !

অন্ধকার রাত্রে ঢেউয়ের ওঠা-পড়া,
এ যেন এক শব্দের ঝড়।
দেহহীন বিক্ষোভ যেন
আশ্রয়ের সন্ধানে ;
অন্ধ দৈত্য হাতড়িয়ে মরছে শিকার ;

থেকে থেকে শব্দের অভ্রভেদী তোরণ
ধ্ব'সে প'ড়ে জানিয়ে দেয়
তরঙ্গের তুঙ্গতা,
উন্মূলিত করবে যেন ধরিত্রীকে,
এমনি আক্রোশ !

এই অনন্ত কালোর গর্ভে
ছিন্ন-ভিন্ন সব
নিয়তির শৃঙ্খল ;
চূর্ণ-বিচূর্ণ সমস্ত সংস্কার ;
মথিত প্রমথিত উন্মথিত নিরন্তর
চৈতন্যলোকের রসাতল,
ছিন্নমস্তা জ্যোতিঃশিখা পান করছে
অন্ধকারের তরল রুধির ;
অমাবস্যার তুফানে যেন
নিমজ্জিত
দিগ্‌বারণের বৃংহিত।

নিয়মের আল-বাঁধা
এই ডাঙাটুকুর উপরে ব'সে
যা ভাবছি,
কোথায় তার সমর্থন
সৃষ্টির এই আদি উপকরণের ভাণ্ডারে ?
ওখানে একই সঙ্গে
ভাঙনের হাতুড়ি আর গড়নের হাত সক্রিয়
স্নেহ প্রেম দয়া মায়া নীতি দুর্নীতি
সব ওখানে একীকৃত,

স্বয়ং বিধাতা ওখানে
বটপত্রমাত্রসহায়।
অসংখ্য 'কেন'র বুদ্বুদ ওখানে
অগম্য জিজ্ঞাসার দিগন্তরে ধাবিত।
অসীম বিস্ময়,
অনন্ত বেদনা!

জীব-জগতে যখন ভাষা ছিল না,
উদ্ভিদ্-জগৎ যখন স্পন্দনহীন,
তখন থেকে কী জিজ্ঞাসায়
আন্দোলিত ওই সমুদ্র?
আবার যখন অনন্ত 'না' এসে গ্রাস করবে
অনাদ্য 'হাঁ'-কে,
তখনো থামবে না ওর আর্তি।
ও যেন এক অনাদ্যন্ত আর্তনাদ
দিগন্তের ঘাটে ঘাটে মাথা কুটে মরছে।
মাটির খাঁচায় দুর্জয় গরুড়
'কেন'র টুঁটি ছিঁড়ে
আদায় করতে চায় ব্রহ্মাণ্ডের শেষ রহস্য।
অসীম বিস্ময়,
আর
অনন্ত বেদনা॥

কিংশুক বহ্নি

দোষ নয়, ভুল নয়

আজ যদি ভুলে থাকি তোমার নিষেধ,
সে কি মোর দোষ সখী, সে কি মোর দোষ ?
শরমের বাধা যদি করে থাকি ভেদ,
সে কি মোর দোষ সখী, সে কি মোর দোষ ?
পউষের মাঠভরা সোনালি আলোয়
আকাশের বাহু যেথা ধরণীরে ছোঁয়,
চেয়ে দেখো নাহি সেথা এতটুকু ছেদ।
(সে কি মোর দোষ সখী, সে কি মোর দোষ ?)

আজ যদি আরো কালো লাগে তব আঁখি,
সে কি মোর ভুল সখী, সে কি মোর ভুল ?
অধরে উদার হাত হয়ে থাকে সাকী,
সে কি মোর ভুল সখী, সে কি মোর ভুল ?
ওই যে চাঁদের রসে মদিরা পৃথিবী,
স্ফুরিতেছে ঘন ঘন ক্ষীণ তার নীবী,
জেনো জেনো জেনো সখী, সে নহে একাকী।
(সে কি মোর ভুল সখী, সে কি মোর ভুল ?)

আজ যদি ঘনতর লাগে তব ভুরু,
আমারি কি চোখ দায়ী, আমারি কি চোখ ?
রঙে রসে কেশপাশ ছড়ায় অগুরু,
আমারি কি চোখ দায়ী, আমারি কি চোখ ?
ওই শ্যাম গিরিচূড়া কিসের আভাস ?
বনলেখা পরায়েছে তারে নীল বাস।

কে বলিবে কোথা সখী কামনার শুরু!
(আমারি কি চোখ দায়ী, আমারি কি চোখ ?)

তোমার বসন কেন ছড়ায় আবির ?
সে কি অকারণে সখী, সে কি অকারণ ?
নেশায় বিভোল দুটি নয়ন কবির !
সে কি অকারণে সখী, সে কি অকারণ ?
চেয়ে দেখো বনে বনে একি সমারোহ,
পলাশে শিমুলে শালে ছড়াইছে মোহ,
রতিহীন মদনেরে করেছে মদির।
(সে কি অকারণে সখী, সে কি অকারণ ?)

আজ যদি চোখ তব ত্যজে চপলতা,
সে কি অনুমান শুধু, শুধু অনুমান ?
মন সনে কানাকানি করে কত কথা,
সে কি অনুমান শুধু, শুধু অনুমান ?
আজ দেখো জানাজানি চখীতে চখায়,
কিসের আবেশে দোঁহে এমন বকায় ?
বাতাসে বাতাসে আজ একি তরলতা !
(সে কি অনুমান শুধু, শুধু অনুমান ?)

হাসিতে তোমার কেন ফোটে জুঁই ফুল ?
সে কাহার দোষ সখী, সে দোষ কাহার ?
চোখ দুটি কালো কেন, অধর রাতুল ?
সে কাহার দোষ সখী, সে দোষ কাহার ?
জলে নাহি ঢেউ ছিল মুখর নদীর,
ওপারের বন ছিল ঝিল্লিবধির,
হেন কালে হেন ঠাঁই হয়ে থাকে ভুল।
(সে কাহার দোষ সখী, সে দোষ কাহার ?)

তুমি মনোরম সখী, ধরা মনোহর,
কেন হেন যোগাযোগ, হেন যোগাযোগ ?
দুই জনে কি কারণে করিয়াছ ষড় ?
কেন হেন যোগাযোগ, হেন যোগাযোগ ?
ফাঁদ পেতে পাখী ধরে দোষ দেওয়া তায়,
কেমন বিচার এ যে বোঝা নাহি যায়,
বোঝা নাহি যায় তুমি আপন কি পর।
(কেন যোগাযোগ হেন, হেন যোগাযোগ ?)

ভুল নয় দোষ নয়, এ যে যৌবন—
কার দোষ কার ভুল থাক সে বিচার।
এক ফাঁদে ধরা দিল দু'জনের মন—
কার দোষ কার ভুল থাক সে বিচার।
তুমি টানো একদিকে আমি এক পাশ,
ততই কঠিন হয়ে আঁটিতেছে ফাঁস—
কে জানিত বেদনা যে মধুর এমন !
(থাক সে বিচার সখী, থাক সে বিচার।)

কে জানিত, প্রেম সে যে খর তরবার,
কে জানিত, অজানিতে সকলেই চায় ?
হাসিতে নিশিত তার দুই দিকে ধার,
কে জানিত, অজানিতে সকলেই চায় ?
বুক হতে ঝরে ফোঁটা তরল চুনির,
অধর ধরিয়া রাখে রেখা হাসিটির,
খরধার প্রেমের যে হাতল সোনার।
(কে জানিত, অজানিতে সকলেই চায় ?)

এক দোষে দোঁহে দোষী, এক ভুলে ভুল—
নহে অনুমান আর, শুধু অনুমান।

বিঁধিয়াছে দোঁহে এক বেদনার শূল—
নহে অনুমান আর, শুধু অনুমান।
খরদাহে গলে গিয়ে তুইখানি মন
যুগল দেহের পুটে করেছে সৃজন
বাণীময় একখানি মুকুতার ফুল।
(নহে অনুমান আর, শুধু অনুমান।)

চিরন্তন না

পূরুষ কহিল চুমিব তোমার চরণতল,
রমণী কহিল—না।
আকাশের বুক বিদ্ধ করিয়া
ডেকে গেল পাপিয়া।

পুরুষ কহিল পরাবো তোমারে যূথীর মালা
স্বপ্নঢালা,
রমণী কহিল—না।
দখিন বাতাস ফিরে চলে গেল
কোন্ কথা চাপিয়া।

পুরুষ কহিল বাঁধিব তোমায় বাহুর ডোরে
নিবিড় করে,
রমণী কহিল—না।
আকাশ কাঁদিল আপনার মনে
মেঘে মুখ ঝাঁপিয়া।

পুরুষ কহিল আজি মোর প্রেম নিবিড়তর,
গ্রহণ করো,
রমণী কহিল—না।

ডুবে গেল চাঁদ অস্তাচলে যে
সারানিশি যাপিয়া।

পুরুষ কহিল দাও তবে প্রেম হৃদয় ভরি,
গ্রহণ করি,
রমণী কহিল—না।
ভোরের তিমির উঠিল কেন যে
অকারণে কাঁপিয়া।

পুরুষ কহিল রহিব এমনি দিবস-রাতি
হস্ত পাতি,
রমণী কহিল—না।
ভোরের আলোয় ওঠে চখাচখী
কি তরাসে কাঁপিয়া।

পুরুষ কহিল চলিলাম তবে এবার ফিরে
অশ্রুনীরে,
রমণী কহিল—না।
কাঁদে চখী ধীরে, কাঁদে চখা একা,
হা প্রিয়া,
হায়, হায়, হায়, হা প্রিয়া॥

সে তোমার হাসি

হঠাৎ বসন্তে কবে রাকাদীপ্ত চামেলির বনে
উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল দক্ষিণ পবনে,
ঝরেছিল শুভ্র ফুলরাশি,
সে তোমার হাসি॥

হঠাৎ ঝোটালে কবে উন্মথিত মত্ত পারাবার
জ্যোৎস্নার মর্মরে গাঁথা সৈকতে অপার
ছুঁড়েছিল স্বচ্ছ শুক্তিরাশি,
সে তোমার হাসি ॥

ইন্দ্রের বিলাস-লগ্নে সুখ-স্বর্গপুরে
পুরূরবা-স্মৃতিদষ্ট উর্ব্বশীর বিভ্রান্ত নূপুরে
যে চমক উঠিল উদ্ভাসি,
সে তোমার হাসি ॥

রিক্তপদ্ম মানসের অশ্রুর স্ফটিকে
মধ্যরজনীর চন্দ্র তন্দ্রাহীন চাহি নির্ণিমিখে
যে শুভ্রতা তুলিছে বিকাশি,
সে তোমার হাসি ॥

রজনীগন্ধার দণ্ডে যে পেলব চিক্কণ আবেশ
মূর্চ্ছিত জ্যোৎস্নার মত রচি পরিবেশ
দিব্যকান্তি দেয় পরকাশি,
সে তোমার হাসি ॥

পরম-প্রণয়ক্ষণে ছিন্নগ্রন্থি মুক্তাহারদ্যুতি
স্তিমিত বাসর-ক্ষেত্রে বাসনার যূথী
মুহুর্মুহু তোলে যে উচ্ছ্বাসি,
সে তোমার হাসি ॥

বাণীর মুকুটলগ্ন দিব্যবিভা শ্বেতশতদলে
কবির প্রতিভাস্পর্শে যে আলোক ঝলে
প্রকাশের আতিতে উল্লাসি,
সে তোমার হাসি ॥

আমার বিস্মৃতিতলে চৈতন্যের গোপন প্রবাহে
কোথা হতে পড়ে আলো, জ্বলে ওঠে তাহে
গুচ্ছ গুচ্ছ জ্যোতিঃ-কুন্দরাশি,
সে তোমার হাসি ॥

তোমার অস্তিত্ব-সুধা বিগলিয়া তরল ধারায়
শিশিরান্ত হিমানীর প্রবাহিনী প্রায়
ঝরাইছে ফুল্ল ফেনরাশি,
সখী, সে তোমার হাসি ॥

তুমি মোর কল্পতরু

তুমি মোর কল্পতরু,
দাও, দাও ছায়া।
অঞ্চলের মায়া
যেমন বিছায় মেঘে
অধীর বাতাস লেগে
শূন্যে অবহেলে,
আমারে সমূলে ঢাকি
ছায়া দাও মেলে।

তুমি মোর কল্পতরু
শ্যাম পল্লবিনী,
বল্লভিনী
আমার হিয়ার।
এতদিন সঙ্গোপনে
যে উচ্ছ্বাস ছিল মনে
অশ্রুর নীহার,
তোমাতে তা সমুত্থিত,

দিকে দিকে পল্লবিত
মুক্তাকাশময়,
আমারি সে সৃষ্টি আজ
আমার আশ্রয়।

তুমি মোর কল্পতরু,
গাও, গাও গান।
গুণীর অঙ্গুলি প্রায়
বাতাস লাগুক গায়
নিঙাড়িয়া প্রাণ,
সঙ্গীতের সরস্বতী
দেখা দিক মূর্তিমতী
কমলে অম্লান।
আজো মোর অগোচরে
যে-সুর পরাণে ঘোরে
সীতান্বেষী রাঘবের মত,
তোমার প্রসাদে তাহা
ধ্বনিত করুক, আহা,
রাগ শত শত!
তোমার বীণায়, সখী,
উঠুক না ঝকমকি
আমার পরাণ।
তুমি মোর কল্পতরু,
গাও, গাও গান।

তুমি মোর কল্পতরু,
দাও, দাও সুধা।

সোনার কদম্ব-কুঁড়ি
ফুটুক হৃদয় ফুঁড়ি,
সৌরভে অতুল।
এতদিন ধ্যানে জ্ঞানে
লুকানো যা ছিল প্রাণে,
পায় নাই কূল,
অটল নিটোল রূপে
রোমাঞ্চিয়া চুপে চুপে
ফুটাক সে ফুল।
হৃদয়ের ক্ষুধা, হায়,
হৃদয়ের ধন চায়,
নহে মাংস শুধু;
চাঁদের চৌদোলে বসি
হাসিতেছে যে-রূপসী
কল্পনার বধূ,
তেমনি দেহের পরে
যে মনঃ-কুসুম ধরে
সে যে অপরূপ;
রূপ চাই, সাথে তার
অরূপেরো স্বাদ আর,
সেই তো স্বরূপ।
দেহ মন এক বাগে
জোটে যদি মোর ভাগে,
তবে মোর নাহি চাই
সমগ্র বসুধা।
তুমি মোর কল্পতরু,
দাও, দাও সুধা।

তুমি মোর কল্পতরু,
দাও, দাও ফল।
সোনার শ্রীফল সম
ফলুক না মনোরম
কান্তি অভিনব,
প্রভাতের রৌদ্র তায়
পিছলিবে পায় পায়,
ভ্রান্তি অভিনব
উপজিবে দেবতার ;
এতো নহে মেনকার
মাংস-সার দেহ,
এতো নহে সরস্বতী,
ছায়া শুধু মূর্তিমতী,
নহে তারা কেহ।
প্রেমের এ যজ্ঞযাগে
মিশিয়াছে সমভাগে
দেহ আর মন,
বাসনায়, এষণায়,
মিশিয়াছে দু'সোনায়
অপূর্ব এ ধন।
মিশিয়াছে এক পাত্রে
সমভাগে দিবারাত্রে,
সুধা হলাহল,
রূপারূপ দ্বন্দ্ব ভুলি
ধরেছে নিপুণ তুলি,
হয়েছে সফল।
তুমি মোর কল্পতরু,
দাও, দাও ফল।

তুমি মোর কল্পতরু,
　　　পরম নির্ভর।
তোরে ঘিরে ক্রমে ক্রমে
সব স্বপ্ন ওঠে জমে
　　　সব সার্থকতা,
বাস্তবের ডালে ডালে
কল্পনার তালে তালে
　　　দোলে কল্পলতা।
দোঁহে ভেদ ঘুচে যায়,
সীমা চিহ্ন মুছে যায়
　　　তুমি আমি রূপ,
দু'জনের দুই পক্ষে
চলিয়াছে কোন্ লক্ষ্যে
　　　আত্মার মধুপ।
তুমি নাই আমি নাই,
আছি শুধু আমরাই
　　　অব্যয় অমর,
তুমি মোর কল্পতরু,
　　　জীবনের মরণের পরম নির্ভর॥

উর্বশীর প্রার্থনা

কামতাপে জরজর আমার এ তনু,
　　　হে কুসুমধনু,
এ দেহ অসহ্য মোর, দাও বিস্মরণ,
　　　দাও লুপ্তি অথবা মরণ।
বাসবের ভোগ্য আমি, দেবতাবাঞ্ছিত,
　　　চুম্বন-লাঞ্ছিত

সারা অঙ্গে ফুটিয়াছে ব্যথার মন্দার,
জ্বলন্ত অঙ্গার
দহিতেছে প্রতি রোমে, দহে প্রতি অণু,
ওগো পুষ্পধনু!

অমরীর আর্তি কেন মানবের তরে,
কে বলিবে মোরে?
নাহি যাচি দেবকাম্য নন্দনের সুধা,
হে কন্দর্প, আমার এ ক্ষুধা
মর্তের মাটিতে গড়া দুখানি বাহুর,
মুমূর্ষু রাহুর
ক্ষণিক প্রচণ্ড গ্রাসে চাহি আমি লয়,
প্রেমের প্রলয়,
সুখের বিস্মৃতি মাঝে আত্মনিমজ্জন,
দৃঢ় আলিঙ্গন।

অমরীরে কেন দিলে মর্ত্য-আকুলতা
মানবী-ব্যগ্রতা?
উর্বশীরে কেন দিলে কামনা উর্বীর,
ক্ষুধা তৃষ্ণা অদম্য গভীর?
এ বীণায় কোথা ছিল নিভৃতে গোপনে
অতি সঙ্গোপনে
চৈতন্যের পরপারে একখানি তার,
সহসা তাহার
আর্তরব করিতেছে স্বর্গেরে পীড়ন,
হে রতি-রোচন!

আমিতো সুখের সখী, সৌভাগ্যের দূতী,
অনঙ্গ-বিভূতি,

দেবতার করে আমি সোনার ভৃঙ্গার,
সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুধ তোমার,
মহেন্দ্রের হাতে আমি বাসনার ফাঁদ,
ঘটাই প্রমাদ,
উৎসব-রাতির আমি বিলাসগাগরী,
মোরে বক্ষে ধরি
কত না অভাগ্যজন হইয়াছে পার
কাম-পারাবার।

সত্য ক'রে বলি আজ শোনো, কামচর,
ক্ষুধিত অন্তর ;
স্বর্গসখী উর্বশীর মেটে নাই ক্ষুধা,
এ ত্রিদিবে নাহি হেন সুধা,
নাহি হেন বজ্রগর্ভ বৈদ্যুৎ চুম্বন,
মত্ত আলিঙ্গন,
মিটাতে যা পারিয়াছে উর্বশীর তৃষা,
দীর্ঘ সুখনিশা।
ফিরিয়াছি দেবতার ক্রোড় হ'তে ক্রোড়ে
অতৃপ্ত অন্তরে।

স্বপ্নের নির্মোক সম অমরত্ব-ডোর
খসে যাক মোর,
উর্বশী মানবীরূপে আসুক বাহিরে
জন্মমৃত্যু-সাগরের তীরে,
মানবের ওষ্ঠপুটে যে-অমৃত আছে
সেইটুকু যাচে
স্বর্গরঙ্গে শ্রান্ত ক্লান্ত উর্বশীর প্রাণ,
লভুক নির্বাণ

মানবের বক্ষ পরে ছিল যা ত্রিদিবে,
দীপ যাক নিভে ॥

বনস্থলী

আমার এ বনস্থলী পূর্ণ কবিতায়।
সরল শাল্মলী শাল
বাল্মীকির অনুষ্টুপ্ প্রায়,
বিস্তারিত বটচ্ছায়া রচেছে অধ্যায়
বনপর্ব মহাভারতের,
এর
গলিতে গলিতে
ছায়ানট বৃক্ষরাজি লতার ললিতে
মিশেছে অপূর্ব রাগে;
ফাল্গুনের আগে
বনের নির্মোক খসে পাতায় পাতায়,
তরুর মাথায়
কুসুমের পূর্বরাগ রক্ত কিশলয়ে,
বেদনার লয়ে
আসে তপ্ত মধ্যাহ্ন পবন,
চুরি ক'রে নিয়ে যায় বনশ্রীর মন
কোন্ দূরান্তের পানে;
তন্দ্রাহীন গানে
নন্দনের শেখা সুর সাধে বসে একা
সঙ্গীহীন পিক;
দশদিক্
উঠি মর্মরিয়া
পুরূরবা-হতাশ্বাস দেয় বিস্তারিয়া।

আজি শীত-মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধ প্রহরে
সুখস্বপ্ন ভরে
আমীলিত নেত্র ধরণীর ;
শুধু ধীর
জপমাল্য আবর্তন ঘুঘুর বিলাপে ;
দিঙ্মণ্ডল কাঁপে
প্রচণ্ড ব্যথায় ;
টুপ্ টাপ্ শব্দ শুনি স্খলিত পাতায়,
বিশ্বের সঙ্গীত যেন ফল্গুরূপ ধরি
গেছে কোথা সরি,
শুধু দু'এক অঞ্জলি
তরুর মর্মর আর পাখির কাকলি।

তারপর একদিন অকস্মাৎ প্রাবৃটের মায়া
দিগ্ দিগন্তে মেলি দেয় ইন্দ্রজালচ্ছায়া,
অরণ্যে অঙ্কুর জাগে, পর্বতে নির্ঝর,
নদীতে তরঙ্গমালা, প্রান্তরের পর
নবশষ্পলেখা জাগে নবীন কবির
প্রথম প্রেমের গীতি,
বর্ষান্তের স্মৃতি
জাগে তৃণপুষ্পদলে,
তার তলে তলে
গুপ্তগতি ইন্দ্রগোপ কীট,
সঘন প্রাবৃট্।

আকাশের আলিঙ্গনে নিশ্চল পৃথিবী,
মেঘের আড়ালে তার দিগন্তের নীবী

বহুক্ষণ অপসৃত,
বিচ্ছিন্ন লুণ্ঠিত
বিদ্যুতের সূত্রে গাঁথা অপরাজিতার
বরমাল্য তার।

পড়ে না পায়ের চিহ্ন
ঘনশষ্প মোর বনভূমে,
ভূঁইচাঁপা আঁখি খিন্ন
যেন যজ্ঞধূমে
বধূবেশী বৈদেহীর ;
উর্বশীর
লাবণ্য নিক্ষেপ মুহু
মালতী কুসুমে ;
যক্ষের আর্তির দূত নীলকান্ত মেঘ
নত হ'য়ে বনশ্রীরে শুধায় বারতা
দূর অলকার,
ময়ূরের কণ্ঠে বন কয়ে ওঠে কথা,
মত্ত হাহাকার,
স্তব্ধতারে দীর্ণ করা কর্কশ ক্রেঙ্কার।

আমার এ বনস্থলী পূর্ণ কবিতায়।
তাই আজি পউষের পড়ন্ত বেলায়
চিক্কণ বদরীগুচ্ছে চমকে আলোক,
ডুবে যায় চোখ
সুগভীর নীলে,
যতখানে যত ব্যথা আছিল নিখিলে
ঘুঘুর করুণ সুরে করিছে কাকলি ;

খর্জুর বৃক্ষের গাত্রে পড়িতেছে স্খলি
সুরাগন্ধী রসবিন্দু ধরণীর সীধু;
আকাশের এক প্রান্তে গতপ্রাণ বিধু;
পর্বতের পরপারে অস্ত গেল রবি
নীলচ্ছবি
গিরিমালা নীলতর করি।
অরণ্যে একান্তে ব'সে আছে বিভাবরী।
আমি হেথা শুয়ে
তপ্ততৃণ ছুঁয়ে
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পুটে করিতেছি পান
বনশ্রীর দান
ক্লান্ত শিশু প্রায়।
আমার এ বনস্থলী পূর্ণ কবিতায়॥

যে কাব্য হ'ল না লেখা

যে কাব্য হ'ল না লেখা
তারি হাতছানি
নিত্য মনে শুনিবারে পাই,
তাই
গোধূলির অরণ্যের যত কুহুকেকা,
বিস্মৃতির বীথিকার স্তব্ধ যত বাণী,
দিয়ে যায় দেখা
অলিখিত অক্ষরের পদপঙ্‌ক্তি রচি;
স্বচ্ছ কচি কচি
অনুদ্ভুত কিশলয়
চিত্তময়
সৃষ্টি করে স্বপ্নের কুয়াশা,

আমি বীতভাষা
আপন ছায়ারে করি দুঃসহ দোসর
সারা রাত্রি জেগে মরি নিস্তব্ধ বাসর।
অলিখিত কাব্য মোর
আজিও অভাব্য মোর
হংসদূতপ্রায়
আসে অসহায়,
বিস্তারিয়া যায়
কমল-উন্মীল ডানা মোর মনে মনে
নিঃসীম গগনে ;
বিস্তারিয়া যায়
নক্ষত্র-জননী শুভ্র কুমারিকা নীহারিকা প্রায়
সে দিগন্তে, অনন্তের কোলে
আজো স্বপ্নে দোলে।

এক আমি করে বিচরণ
মর্ত্যতলে,
আর আমি ছায়াপথে চলে,
এক আমি বাস্তবের
বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধা,
আর আমি কণ্ঠ তার সাধা
জ্যোতিষ্কের অশ্রুত সঙ্গীতে,
উর্বশীর নর্তন ভঙ্গীতে
উষা যবে বাহিরায় পূর্বাশার পালঙ্ক রঙ্গিতে
ছন্দে সেই,
সুধাস্পর্ধী দেবাসুর-দ্বন্দ্বে সেই,
সে যে চায় সবারে লঙ্ঘিতে,

অনন্তে আরূঢ়
দুর্জ্জয় গরুড়।

এক আমি কাব্য রচে বেদনার সরস্বতী তীরে
অশ্রুনীরে,
আর আমি রহে বসি বিস্ময়ে নির্বাক্,
অংশভাক্
তার
বেদনার
কোন্ সে লেখনী ?
কেহ কি দেখনি,
যে-গিরি বাজায় বসি তরল কঙ্কণ
আত্মনিমগন
তারি অন্য চূড়া
নির্বাণী বিমূঢ়া ?
যে-বিশ্ব আজিও আছে বিধাতার মনে
সঙ্গোপনে
সহস্র দলেব,
যে-অশ্রুজলের
চিহ্ন আজো দুঃসাহসী স্বপ্ন অগোচর,
সে যে নিরন্তর
করিয়া রেখেছে মোরে ব্যথায় উন্মনা।
অন্য আমি করিবে রচনা
কাব্য তার—
প্রতিজ্ঞা অপার।
ব্যথা আছে, ভাষা নাই,
উদ্যমের আশা নাই,
স্বয়ম্ভু এ-প্রেম তাই

আপনারে ঘিরে ঘিরে উদ্দাম নর্তনে
ধ্বনিছে ক্রন্দনে,
বেদনার ছিন্নমস্তা করিতেছে পান
আপনার শোণিত অম্লান।

সে-কাব্য হবে না লেখা
কোন কালে আর,
আত্মজাত বেদনার পদ্মরাগধার
পাবে না সমুদ্র খুঁজি,
তাই বুঝি
যত কাব্য মহাকাব্য অপূর্ণ সকলি!
যেন কোন্ প্রাতের কাকলি,
যেন শুধু অগম্যের গুণ্ঠনটি কাঁপা,
পত্রপুটে সঙ্কুচিত যেন মুগ্ধ চাঁপা,
শুক্তিপুটে সিন্ধুবারি মাপা,
দুস্তর ব্যথার স্রোতে পরিক্ষীণ বাঁশী
যায় কোথা ভাসি!
বটপত্রে ভাসমান বিশ্ববন্যা মুখে
বাঁশরীবিহীন কবি নিস্তব্ধ যে দুখে,
সে দুঃখের ভাষা নাই, নাই পরিমাণ।
যে দুঃখের ভাষা আছে সে দুঃখ তো গান।

যে-কাব্য হ'ল না লেখা তাহারি বেদনা
আমার সকল চিত্ত করেছে উন্মনা;
ছন্দের চরণে শুনি কি এক নূপুর
বনের মর্মরে যেন বিলাপ ঘুঘুর,
আছে আছে, এই নাই, কান পেতে শুনি,
শ্রুতির সীমান্তে দেয় স্বপ্নতন্তু বুনি,

রহি রহি
বায়ু আনে বহি
অপূর্ব কি জগতের পূর্ব প্রতিশ্রুতি,
যেন সে প্রস্তুতি
কোন্ জীবনের
অ-দৃশ্য মনের।
অপূর্বের এ বিরহ
মোরে অহরহ
করে অন্যমনা,
যে-আঘাত অনাহত
তাহারি বেদনা
অলিখিত কাব্য মোর করিছে বহন ;
নীহারিকা-পূর্বরূপ করিয়া মন্থন
তুলিতেছে নীল হলাহল,
সৃষ্টিছাড়া আকুতিতে
মোর সৃষ্টি হয়েছে চঞ্চল।

এ-ব্যথা নামাতে পাই
নাহি ঠাঁই
হেন চরাচরে,
এ যেন রে বামনের তৃতীয় চরণ!
আকাশে আশ্রয় খুঁজি
আমারে পেয়েছে বুঝি,
পাদপীঠ করি মোরে
নির্দেশিল জীবন্ত মরণ।

কারা যেন ডাকে মোরে
নীহারিকা-পরপার হ'তে,

অলিখিত কাব্যের কি নায়ক-নায়িকা ?
ইন্দ্রিয় ধনুর পরে অতীন্দ্রিয়
সায়ক-সায়িকা ?

জন্মপূর্ব আকুতি সে
চিত্তে মোর যায় মিশে,
রামজন্ম পূর্বে রামায়ণ
করে সংরচন !
যে-কাব্য হ'ল না লেখা
ক্ষণে ক্ষণে পাই দেখা
তার,
আঘাতের পূর্বে স্বাদ অসীম ব্যথার।
উথল পাথাল তাই হৃদয়-পাথার ॥

রবীন্দ্রনাথ

শিলাইদর ঝাউগাছ

দৃষ্টির বলাকা যেথা মিলাইয়া যায়
দিগন্ত সীমায়,
একটানা বনরেখা ঝাপসা করুণ,
আকাশ অরুণ
ডুবে-যাওয়া তপনের অন্তিম আভায়, সেথা—
কত দূরে বলিবে যে কে তা—
চামর-চূড়ার মত দেখিবারে পারি
ঝাউ সারি সারি।
এত ক্ষীণ এত ছায়াময়
যেন ওরা এ পৃথ্বীর নয়,
জগতের শেষ যেথা ওরা যেন তার
ধূমল প্রাকার,
কিম্বা যেথা নব দূর বলে আধো বাণী
ওরা যেন তারি হাতছানি,
এ বিশ্বের শেষ কিম্বা ও বিশ্বের অস্ফুট সূচনা
মনে মোর করে আনাগোনা,
নিস্তব্ধের গীতি যেন, নিঃসীমের পাড়
—ঝাউ সারে সার॥

বালুকাবিবর্ত গতি পদ্মা বহে ধীরে,
আসন্ন তিমিরে
ঘরে-ফেরা গাভীসম ছায়া আসে ফিরে,
গলে বাজে তার
ঝিল্লির ঝঙ্কার।

জলে স্থলে
তরুতলে
ছায়া জমে গূঢ়,
দিবসের রূঢ়
নির্মোক খসায়ে ফেলে স্বপন-নাগিনী
পদ্মা বিবাগিনী।
কুলায়িত পাখিসম সমস্ত ভুবন
তন্দ্রা নিমগন,
মুদিয়া আসিছে তার আঁখির আলোক,
গায়ের পালক
মুদ্রিত কমলসম এবে মুষ্টিমেয়,
প্রশান্তি অমেয়
স্বর্গ হ'তে মন্ত্র ঢালে, তারি প্রতিধ্বনি
পদ্মার স্বাগত শব্দে উঠিতেছে রণি,
লোকে লোকান্তরে
অনন্ত অম্বরে
নক্ষত্রের গোধূলিতে ছায়াপথ গিয়েছে প্রসারি,
ঝাউ সারি সারি
অদৃশ্য চামরসম করিছে বীজন
কাহার শয়ন?

একূলে ওকূলে পদ্মা গড়ায় নিয়ত,
রূপসীর মত
বালুকার আস্তরণে রেখে রেখে যায়
দেহের রেখায়,
শ্রাবণের নিঃশব্দ কেকায়
তরঙ্গ কলাপ দল দেয় বিস্তারিয়া,
যায় সে বহিয়া

ভাঙন-ভঙ্গুর ভূমি লেহিয়া লেহিয়া
দুর্মদ অবুঝ,
শরতে সবুজ,
স্তব্ধ নীলিমায়
হাঁস উড়ে যায়
শব্দের তোরণ রচি সন্ধ্যার আঁধারে,
দক্ষিণে বাঁ ধারে
শূন্য জুড়ি শিবাধ্বনি ছোঁড়ে বেড়াজাল,
ফুলাইয়া পাল
নৌকা ভেসে যায় কত,
ইতস্ততঃ
জীর্ণ হাল, দীর্ণ কাঠ, ছিন্ন দড়াদড়ি
যায় গড়াগড়ি,
মাস্তুলবিদীর্ণশূন্যে তারকা দু'চারি
আর ঝাউ সারি ॥

একদিন ওই কূলে আছিল উৎসব,
তারি গীতিরব
উৎকর্ণ রাখিয়াছিল সমস্ত আকাশ,
চামেলি-চমক-লাগা চূতগন্ধী চৈত্রের বাতাস
থামিত সে,
সে প্রদোষে
যেত খ'সে
বারে বারে বাণীর গুণ্ঠন,
অন্য মনে ঝঙ্কারিত সোনার কঙ্কণ
কবির বীণায়,
চিনা অচিনায়
অকস্মাৎ হ'ত চোখোচোখি,

দু' পারের যত চখা-চখী
মধ্যপথে উড়ে এসে স্খলিত চুম্বনে
ডাকিত কূজনে।
চন্দ্রিকা-চিক্কণ যত আমের পল্লব
মেলে দিত কার যেন নয়ন বল্লভ,
আন্দোলিত তরুশাখে ছায়ার রজ্জুতে
দুলিত জ্যোছনা
স্খলিত-বসনা।
সেদিন বহিত পদ্মা ওই তটতলে,
সেদিন কহিত পদ্মা তরঙ্গ উচ্ছলে
কত কি যে
নিজে নিজে,
সেদিন মোহিত পদ্মা ভুলে যেত গান,
সেদিন সহিত পদ্মা নিজ অপমান
মানব ভাষায়,
দিত সে ভাসায়ে
সে গানের প্রতিধ্বনি তরঙ্গ শিখরে
জ্যোৎস্নার জড়োয়া গাঁথা কিরণ নিকরে
সঙ্গীতের সমুদ্রের পানে,
তার সেই গানে
চাঁদের যুগল মৃগ উৎকণ্ঠিত, হায়,
চাহিত ধরায়,
আর সেই স্বর
সৃষ্টির প্রত্যন্তশায়ী পদ্মযোনি ব্রহ্মারেও
মুহুর্মুহু করিত বিধুর॥

পুরাকালে কতবার মানবের প্রেমে
এলো নেমে

উর্বশী অপ্সরী,
দিল ভরি
বিষামৃতে মানুষের অমর্ত্য হৃদয়,
সৌভাগ্য নির্দয়
উৎসারিল গীতি।
আজিকে প্রকৃতি
স্বয়ম্বরা
দিল ধরা,
দিল তার গানের গোলাপ,
দিল তার প্রাণের প্রলাপ,
দিল তার পুষ্পচাপ কবিবক্ষে তুলি,
আপনা আকুলি
কবি পুরূরবা
ডালে ডালে ফুটাইল বেদনার জবা,
কণ্ঠ দিয়া খুলি
গাহিল গহন গাথা, রজনী সে হ'ল মহোৎসবা।
পাত্র কাল ভুলি
নন্দন-মন্দার-ছায়ে শুনিল তা সবিস্ময়ে স্তব্ধ সুরসভা,
চরাচর উঠিল বিচলি,
ধূর্জটির জটাবন্ধ স্খলি
বিষ্ণুর চরণপদ্ম গলি
গানের গঙ্গোত্রী মুখে নিঃসন্দিগ্ধ মন্দাকিনী
ছন্দোময়ী স্বর্গজ্যোতিপ্রভা,
অনন্ত-গৌরবা॥

সে সঙ্গীত অবসিত, সেদিনের মেলা
আজিকে একেলা।

অন্যমনা পদ্মা আজি ভিন্নকূলচারী,
শুধু ঝাউ সারি
দীর্ঘশ্বাসে উচ্ছ্বাসিছে পুরাতন সুর,
বিরহ বিধুর
প্রোষিতভর্তৃকা যথা প্রিয়কণ্ঠ স্মরে
বসি শূন্য ঘরে।
সুদূরের বাঁশী তুই ঝাউ,
তুই বুঝি স্মৃতির চারণ,
কারণ-সমুদ্রতীরে তুই অকারণ
চন্দ্র পানে চিরোদ্যত।
তুই জোয়ারের মত,
পূর্ণতার কূলে কূলে
উঠেছিস দুলে দুলে
অপূর্ণের চির হতাশ্বাস,
যে-কথার শেষ নাহি
তারি তুই অনন্ত আভাস,
বিস্মৃতির বীথিপথে
ধায় যবে মনোরথে
তাহারি পাংশুল ধূলা উঠেছিস আকাশে প্রসারি,
তুই ঝাউ সারি।
ও কূলের পদ্মা আজি এই কূলে বয়,
নিশ্চল সময়,
স্তিমিত নীলাভ জল ঘন হ'য়ে আসে,
নিস্পন্দ আকাশে
চতুর্থীর চন্দ্রলিখা,
স্বপ্নময়ী সে শিবিকা
বহন করিছে স্কন্ধে ছায়াবাহী দল,
জগৎ চঞ্চল

মুদিয়া আসিছে যেন লজ্জাবতী লতা,
নামে সন্ধ্যা, নামে তন্দ্রা, নামে নীরবতা।
এখনো পড়িছে চোখে দূর পরপারে
বাস্তবের প্রত্যন্তের ধারে
কল্পনার দ্বারী,
ঝাউ সারি সারি
—সেই ঝাউ সারি ॥

অর্ধনারীশ্বর

তোমার প্রতিভার পটে আর একবার রূপ পেল
অর্ধনারীশ্বর মূর্তি।
সেবার দেখেছিলাম,
আজ তা স্মৃতির বীথিকার প্রান্তে,
উজ্জয়িনীর রাজপটে
'জগতঃ পিতরৌ'
পার্বতী পরমেশ্বরকে
বাগর্থের আলিঙ্গনে যুগলে অভিন্ন।
চন্দ্রসূর্যের বহু লক্ষ উদয়াস্তের পরে
আজ আবার উদ্ভাসিত হ'ল
তোমার প্রতিভার প্রস্ফুট প্রচ্ছদে
অর্ধনারীশ্বর কান্তি,
দু'য়ে এক, একে দুই ॥

বামে কোমল, দক্ষিণে কঠোর,
বামে কান্ত, দক্ষিণে রুদ্র,
বামে ললিত কটাক্ষের লীলা,
দক্ষিণে হোমাগ্নিখিন্ন নয়নের ভ্রূকুটি,

অর্ধাধরে অপরিমেয় করুণা,
অর্ধাধরে প্রলয়পয়োধির তরঙ্গভঙ্গের দুঃসহ উচ্ছ্বাস,
বামে দক্ষিণে ভীষণে মধুরে অপূর্ব মালাবদল।
দু'য়ে এক, একে দুই ॥

বামে কুসুমহার, দক্ষিণে শ্বসিত সর্প,
বামে সুধাপাত্র, দক্ষিণে রিক্ত খর্পর,
বামে বীণা, দক্ষিণে ডম্বরু,
লাস্য আর তাণ্ডব,
বিষমের মন্থনদণ্ডে কী অমৃতের সৃষ্টি !
এক পাত্রে সুধা আর গরল,
এক দেহে পুরুষ ও প্রকৃতি,
সৃষ্টি আর ধ্বংস,
দু'য়ে এক, একে দুই ॥

তোমার অর্ধ ললাট যখন ঝড়ের মেঘে ঊর্মিল,
অপরার্ধ
ক্ষান্তবর্ষণ আকাশের মত প্রসন্ন ;
তোমার বীণার নিক্বণ আর
বিষাণের বৃংহিত,
স্বর্ণলতাজড়িত শাল্মলী ;
কুন্তলের কালো সমুদ্রে,
জটার ফেনা যেখানে উত্তাল,
তার উপরে আলগোছে ভাসছে
শিশু শশীর বহিত্র ;
আর তৃতীয় নেত্রের দিব্য দৃষ্টিতে
বিশ্বের যাবতীয় বিষম

মিলিত হ'য়েছে, সমিত হ'য়েছে, মূর্ছিত হ'য়েছে
এক অখণ্ড আলিঙ্গনে,
তোমাতে সমস্তই দু'য়ে এক, একে দুই॥

প্রতি যুগ বেছে নেয় আপন বাণীদোসর,
যুগলক্ষ্মী হন স্বয়ম্বরা।
সে যুগ বেছে নিয়েছিল একান্তভাবে নারীকে,
তাই ভোগবতীর বন্যায়
কিছু রইলো না আর বাকি।
তাই উমার প্রত্যাখ্যান,
শকুন্তলার অপমান,
অগ্নিবর্ণের অবসান
কন্দর্পের আত্মদাহী
কামাগ্নিশিখায়!
আমরা ভীরু, তাই নিয়েছি পার্বতীর শরণ,
মরবো অন্তঃপুরের বিলাসে।
পার্বতীও নয়, ধূর্জটিও নয়,
বেছে নিল অর্ধনারীশ্বর রূপ—
কই তেমন তো দেখলাম না।
উমার কণ্ঠ থেকে ছিনিয়ে নিলাম মালা,
পাতবো তাতে বিলাসের ফাঁস,
হঠাৎ কখন দেখতে.পেলাম
'এতো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
ফেলে দিলাম মালা,
প'ড়ে রইলো তরবারি,
লুকোলাম উমার অঞ্চলতলে;

উমার করুণা কি বাঁচাতে পেরেছিল কন্দর্পকে
আমরাও বাঁচবো না।

যে সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে,
দেয় না শক্তি,
যে সঙ্গীত পার্থকে করে বৃহন্নলা,
যে মাধুর্যে দ্রৌপদী হয় সৈরিন্ধ্রী,
তার দুর্গতি থেকে বাঁচবে কোন্ ভীরু ?
মরবে কোন্ বীর ?
তোমার অঙ্গদে হ'লাম মুগ্ধ,
তোমার খড়গ দিল না আমাদের বীর্য !
"সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি,
তারায় তারায় খচিত,
খড়গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি,
চরম শোভায় রচিত।"

এই যুগলকেই বলি বাস্তব,
কেন না তা পূর্ণ।
একা পার্বতী
সে-ও খণ্ডিতা,
একা ধূর্জটি
সে-ও খণ্ডিত,
যুগ্ম নারীশ্বর পূর্ণ,
কেন না তা সত্য।

যুগে যুগে মানুষের পরীক্ষা হ'য়েছে
এই যুগলকে প্রত্যক্ষ করবার !
কত সভ্যতা গিয়েছে তলিয়ে
খণ্ডদর্শনের অপরাধে,

কেউ মরেছে রণক্ষেত্রে,
কেউ মরেছে অন্তঃপুরে,
কেউ বা হ'য়েছে সার্থক—
উপলব্ধি করেছে দু'য়ে এক, একে দুই!
আমাদের চলছে পরীক্ষা,
ডুববো না বাঁচবো—
যুগলক্ষ্মী, তুমি দাও উত্তর।

নাই তবু আছে

আমার গৃহ নাই, দেশ নাই,
আমি স্থানচ্যুত, আমি উচ্ছিন্ন।
যা একদিন সব চেয়ে সত্য ছিল
কোন্ দুর্ভাগ্যের দীর্ঘশ্বাসে
তা ছিঁড়ে উড়ে গেল ঊর্ণতন্তুর মত।
যে-সূত্র রেখেছিল আমাদের গেঁথে
তার উপরে পড়লো অকস্মাতের টান,
গ্রন্থি গেল ছিঁড়ে,
ছিলাম আমরা,
হলাম অনেক আমি,
এখন একে একে খসে পড়ছি
নৈরাশ্যের অশ্রুবিন্দুর মত
নিতান্ত নিরর্থক।
আমার গৃহ নাই, দেশ নাই,
আমি স্থানচ্যুত, আমি উচ্ছিন্ন,
আমি মর্ত্যের ত্রিশঙ্কু।

নাই তবু আছে,
আছে তোমার কাব্যে।
বাস্তবের সত্য উজ্জলতর মূর্তি ধরেছে
তোমার কাব্যে,
আকাশের তারা যেমন
মানস সরোবরের দর্পণে।
যে সব চলতি মুহূর্তের বুনো পাখিগুলোকে
ভরেছিলে তোমার সোনার পিঞ্জরে,
তাদের গান আজও থামে নি,
যে সব ছায়াছবির শোভাযাত্রাকে
গেঁথে নিয়েছিলে সোনার সূতোয়,
আজও তারা অম্লান!
সেদিন ছিল তারা আমার দেশের,
আজকে তারাই আমার দেশ!

ঘরে-ফেরার ঘণ্টা বাজানো
সন্ধ্যা-তারা যখন দেখা দেয়,
নীড়ের ব্যাকুলতা যখন
নিঃশ্বসিত হ'য়ে ওঠে চিত্তে,
পড়ি ব'সে তোমার কাব্য—
ক্ষণিকা, চৈতালি আর
ছিন্নপত্রের চিঠিগুলো।
তাদের কণ্ঠে আমার দেশের ভাষা,
তাদের চক্ষে আমার দেশের ছবি,
তারা প্রবাসে-দেখা আমার দেশের লোক!

তখন কানে শুনি
পদ্মার কলধ্বনি,

যে-পদ্মা আজ নির্বাসনের দিগন্তরে
  ঝাপসা অশ্রুরেখায় বিলুপ্ত !
সেই ইচ্ছামতী, সেই নাগর নদী,
  সেই বড়ল, সেই আত্রাই,
মাথুর পালার কীর্তনে আজ
      বিধুর করছে চিত্ত
  তোমার কাব্যের প্রাঙ্গণ।
ভেঙে-পড়া নদীর পাড়িতে
  বেরিয়ে পড়েছে ঝাউগাছের শিকড়,
  গোরু নেমেছে জল খেতে,
  মাছরাঙা আছে অপেক্ষায়,
  শান্ত জলে শঙ্খচিলের ছায়া,
  চরে ঘনায়মান রবি শস্য,
      কৃষাণের কুটীর,
      মন্থর নৌকা !
একি স্বপ্ন না সত্য ?
দেখি বইখানা কখন খ'সে পড়েছে,
      মন আঁকছে ছবি !

চলন বিলের গূঢ় দুস্তরতা ভেদ ক'রে
      চলেছে তোমার বোট !
  আকাশে মেঘের ষড়যন্ত্র,
      মেঘে বকের চমক,
নিস্তব্ধ গাছগুলোর ভাব—
      'হুকুম পেলেই হয়'।
আবার কখনো দেখি
  নাগর নদীর ঘাটে
      তোমার বোটের নিঃসঙ্গ মাস্তুল।

আর শিলাইদর সেই ঝাউগাছগুলো
সবুজ কুয়াশার মত!
আর সবার উপরে আছে
চিরন্তনী পদ্মা!
সেই কালনাগিনীর শিরোদেশে
বিধৃত তোমার কাব্যজগৎ!
সে জগৎ তোমারও যেমন,
আমারও,
তোমার চেয়ে বেশি করেই আজ আমার!

কবিকে বলা হয় স্রষ্টা।
তুমি সৃষ্টি করেছ আমার দেশ।
নিমের শাখা নুয়ে-পড়া
আমার গাঁয়ের পথটি,
কাঁকন-বাজা দীঘির ঘাট,
শর্ষে ক্ষেতের মৌমাছির দল!
এ সব দেখেও দেখিনি,
আজ আর দেখবার উপায় নেই,
তাই দেখছি তারা স্বপ্নের মত সত্য,
কাব্যের মত সুন্দর,
স্বর্গের মত শাশ্বত!
এ সবই তোমার সৃষ্টি!

যে-অলকায় ফিরবার পথ
চিরকালের জন্য রুদ্ধ,
তুমি রচনা করেছ তারই মেঘদূত।
কোথায় আমার সেই পল্লী
আর কোথায় আজ আমি!

কোথায় রামগিরি,
কোথায় অলকা!
মাঝখানে আছে তোমার কাব্য,
আছ তুমি।

নৈরাশ্যের কণ্ঠ থেকে
জয়ধ্বনি শুনে নাও—
'অক্ষয় হয়ে থাক তোমার কাব্য'।
সেখানে আমার যে দেশ
রচিত হ'ল,
কারো সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে,
কারো সাধ্য নেই তাকে খণ্ডিত করে,
তোমার কাব্যের মতই সে অক্ষয়
উদ্বাস্তুকে দিয়েছ বাসা,
নির্বাককে দিয়েছ ভাষা,
নির্জিতকে দিয়েছ ভালবাসা।
তাদেরই কণ্ঠে তোমার
জয়ধ্বনি শুনে নাও—
'অক্ষয় হোক তোমার কাব্য'।
কে আমাকে করে দেশ-ছাড়া!

চিরকালের মালা

পথে দেখলাম মেয়েরা চলেছে ইস্কুলে,
হাতে তাদের শাদা ফুলের মালা।
এ কেমন ইস্কুলের সাজ!
বই নেই, খাতা নেই,
হাতে তাদের শাদা ফুলের মালা!
হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল আজ বাইশে শ্রাবণ।

কবি, এ কেমন তোমার লীলা ?
মৃত্যুর পরেও ওরা মালা গাথছে তোমার জন্যে,
ছুঁড়ে দিচ্ছে তোমার উদ্দেশ্যে,
যেমন ছুঁড়ে দেয় বর্ষার দিগঙ্গনা
শুভ্র বলাকার পাঁতি
অলক্ষ্য কৈলাসের অভিমুখে।

যুগে যুগে মালা গাঁথবে ওরা,
নূতন যুগের তরুণীরা,
নূতন শাখার ফুলে,
চিরকালের মালা তোমার, চিরকালের কবি !
নবীন কবির বৃথাই আশা,
বেঁচে থেকেও যে মালা জুটলো না,
তোমার জন্য তা গ্রথিত হচ্ছে
কালে কালে চিরকাল,
তুমি চিরকালের কবি ॥

২. ১০. ৪৫.

সঞ্চয়িতা

শিশু, তুমি জানো না কি অমূল্য ধন
বহন করছ হাতে,
ওই যে তোমার বইখানা।
তুমি এখন পড়ছ প্রথম ভাগ,
সঙ্গে আছে তার ধারাপাতের নামতা,
ও বই পড়বার বয়স তোমার নয়।

হয়তো তোমার দাদা বলেছে নিয়ে আসতে,
হয়তো মাকে রাগাবার জন্যে

চলেছ কোথাও লুকিয়ে রাখতে।
তুমি জানো না ওযে কি অমূল্য ধন।

একদিন আসবে
যখন হৃদয়ের গ্রন্থিতে পড়বে টান,
সন্ধ্যার ছায়ায় পা টিপে টিপে বেড়াবে
প্রথম মাধবীর সুগন্ধ,
শেষ আলো মিলিয়ে যাবে স্তব্ধ জলের ওপারে।
সূর্য অস্ত গিয়েছে,
ওঠেনি চতুর্থীর চাঁদ।
শূন্য মনে ডুব দিয়ে যখন তল মিলবে না,
বোবা ব্যথা যখন নিরুত্তর,
যৌবনের বেদনা যখন ভাসিয়ে দেবে কূল
কাশ্মীরের বসন্তের বন্যার মত,
তখন খুলো ওই বই খানা।
হাসি কান্নার স্বর-ব্যঞ্জনে
লেখা আছে ওর পাতায় পাতায়
চির কালের দুঃখ,
চির কালের সুখ॥

২.১০.৪৫

গুরুদেব

আমার ছোট মেয়ে দাড়ি-অলা ছবি দেখলেই
করে নমস্কার,
বলে গুরুদেব।
বোঝাতে পারিনে ও তাঁর ছবি নয়।

মুখ বুজে আমার কথা শোনে,
কথা শেষ হলে দেখিয়ে বলে,
কেন ওই যে দাড়ি,
বোঝাতে পারিনে তাকে—ও তোমার ছবি নয়।

একদিন এল তোমার ছবি
নূতন মাসিকের প্রচ্ছদে,
দাড়ি তখন স্বল্প,
উঠ্‌তি কেবল বয়স।
ছুটে এল আমার মেয়ে,
কত কি বলে গেল আবোল তাবোল,
হঠাৎ নজর পড়লো
প্রচ্ছদের দিকে—
চেঁচিয়ে উঠল—এই যে!
কি?
গুরুদেব।
তোমাকে চিনলো কি করে?
দাড়ি তখন স্বল্প।
জন্মপূর্বেও কি তোমার মহিমা সক্রিয়?
মাতার স্তন্যে?
পিতার রক্তে?
স্বপ্নরূপে তুমি প্রবেশ করেছ মজ্জায়,
ধমনীতে ধ্বনিত তোমার ছন্দ,
গানের ভারে ভেঙে পড়েছে আমার স্নায়ুতন্ত্রী
বসন্তের ফুলে যেমন ভাঙে মালঞ্চের বিতান।
পিতামাতার জীবনের তোরণে
প্রবেশ করেছ তুমি
ভাবী বংশধরের সত্তায়।

তাই তোমাকে চেনে ওরা সহজেই,
ছবিতে দাড়ি থাক
আর নাই থাক।

২. ১০. ৪৫

কবির পদ্মা

কবির পদ্মাকে আমি দেখেছি,
তুই তীরের মাঝখান দিয়ে
অনিশ্চয়ের স্রোত।
এপারে আম কাঁঠালের বাগানের মধ্যে
শঙ্কিত পল্লী,
আর ও পারে অন্তহীন ধূসরতার প্রান্তে
কম্পমান ছায়া,
প্রেতের শোভাযাত্রার সুদীর্ঘ শ্রেণী।
মাঝখানে নীল জল,
ইস্পাতের মতো নীল জল, শাণিত, তুর্বার।
অতিদূর ওপারে যেখানে পৃথিবী আর আকাশ
পরস্পরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে
প্রণয়ীযুগলের মত,
একদিন আষাঢ়ে সেখানকার ক্ষীণ দিগন্ত
বিস্রস্ত বেণীর মত স্থূল হ'য়ে ওঠে ;
বকের সারি অলিখিত মেঘদূতের
চলন্ত শ্লোকের মত
অলক্ষ্য অলকার দিকে ভেসে চলে নূতন পূবে হাওয়ায়,
মেঘের রেখায় রেখায় বিদ্যুৎ ওঠে চমকিয়ে,
তীরের বনরাজি যুদ্ধের ঘোড়ার মত
কান খাড়া ক'রে তৈরি হয়,

পদ্মার ধূসর জল রেখামাত্রহীন
সে পদ্মা কবির।

আশ্বিনের নির্মল নদী
দিগ্বিজয়ী সম্রাটের কোষনির্মুক্ত
তরবারির মত,
পাশেই প'ড়ে আছে
কাশের রূপালি কাজ করা তার খাপখানা।
সে পদ্মা কবির।

স্বচ্ছ শীর্ণ পরিশ্রান্ত শীতের পদ্মা।
উঁচু পাড়ের ঝোপে ঝোপে গাংশালিকের বাসা।
ধানকাটা তটের প্রান্ত ঘেঁষে
গুণটানা মাল্লার দল।
নৌকাগুলো চলেও যেন স্থির।
শঙ্খচিল তার শাদা ছায়ার সঙ্গে
পাল্লা দিচ্ছে।
আকাশে বিক্ষিপ্ত শুভ্র মেঘ।
সব যেন ছবি।
সোনার রোদের ঘামতেলে চিক্কণ।
সে পদ্মা কি তোমার নয়, কবি?

তোমার দৃষ্টি দিয়ে ওকে গড়ে গিয়েছ,
তোমার কল্পনায় ওর নব জন্মলাভ,
তোমার প্রেমে ওর গঙ্গোত্রী।
এ পদ্মা তোমারি।
তাই ওকে বুঝি,
তাই ওকে দেখি,

তাই তো অনায়াসে হ'ল মুক্তবেণী
আমার হৃদয়ের সঙ্গমে।

ও যদি হ'তো কেবল মাটি আর জল,
তবে আমার চৈতন্যের চতুর্দোলে
ও কি বসতো বধূবেশে?
ও তোমার ইন্দুমতী।
ওকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছ তুমি
মানব হৃদয়ের
স্বয়ম্বরের সভায়।
এ পদ্মা যে কবির।

১০. ১০. ৪৫

তোমার বাড়ীর ছাদে

তোমার বাড়ীর ছাদে একটি ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে,
বয়স বারো তের-র গা-ঘেঁষা।
শূন্য মনে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে,
যে-আকাশে বর্ষা আনত করেছে
শাদা মেঘের সন্ধির পতাকা।

হঠাৎ আমার মন উজান ঠেলে চলে কোন্ দূরে
শরৎ কালের এক সকাল বেলায়।
নাবালক শিউলির দল
তখনো মালা গাঁথতে শেখেনি
নিজের সঞ্চিত অশ্রুতে,
ছায়ার আবরু টেনে আগলে রেখেছে
শিশিরকণার মুক্তাগুলি।

সে কি আজ!
সে যে অনেক দিনের কথা,
সে যে অনেক দূরের ছবি!

আশ্বিনের আসরে হঠাৎ প্রবেশ করে দূরন্ত পূবে হাওয়া,
মন নিয়ে যায় উড়িয়ে কোন্ দূরে।
সেখানে কত যুগের বেদনায় মেঘের প্রান্ত নত,
সেখানে কত যুগের বিরহে
নিস্ফল বিদ্যুৎ মিথ্যা মাথায় হানছে কঙ্কণ,
সেখানে ঢেউয়ের মাথাগুলো
ক্ষুব্ধ আক্ষেপে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে
ভেঙে ভেঙে পড়ে,
সিক্ত কদম্বের গন্ধে রুদ্ধ অভিসারিকার চিত্ত
সেখানে ঘর ছেড়ে হয় নিরুদ্দেশ।
পূবে হাওয়ার হাতছানিতে মন চলে গেল সেই দূরে।

তখন তুমি বালক,
বয়স বারো তের-র গা-ঘেঁষা।
অমনি ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলে ছাদে
অনাগত কবি-জীবনের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে।
সে কি আজ!
সে যে অনেক দিনের কথা,
সে যে অনেক দূরের ছবি!

আজ কোথায় সেই ঝুরি-নামা বটগাছ?
কোথায় সেই স্নানরসের পুকুর?
দক্ষিণের বাগান আজ নীরস জমির টুকরো।
আর সেই মানুষগুলিই বা কোথায়?

সেই স্বপ্নপ্রয়াণের বড় দাদা,
যিনি তোমার মাথা নেড়ে দিয়ে বলেছিলেন,
'রবি হবে ফিলজফার'!
আর সেই অর্গানে-বসা জ্যোদা!
স্নান-সারা, জল-ঝরা, চুল-মেলা
কোথায় আজ নতুন বৌঠান!
তাঁর শুভ্র শাড়ীর লাল পাড়ের সীমান্ত
সীমন্তের সিন্দুরকে অনুসরণ ক'রে
কোথায় গিয়েছে আজ!

আর সেই সদর স্ট্রীটের বাড়ী!
সেখানে তিমিরঘ্ন পূষণ
নবজন্মের স্বর্ণপাত্রের মুখ করলেন অবারিত
তোমার কাছে,
এক মুহূর্তে
অতর্কিতে।
কোথায় গেল সেই সব দিন!
সে যে অনেক দিনের কথা,
সে যে অনেক দূরের ছবি!

এখনো আছে বাগানের কোণে সেই বাদাম গাছটা
ভূতে-পাওয়া লাল পাতার স্তর
আকাশের দিকে সাজিয়ে।
আছে নতুন যুগের বালক দলের
আকাশমুখী চাওয়া।
আর আছে তোমার অতীত,
ভবিষ্যতের স্বর্ণকোষের ক্ষৌম সুন্দর চেলি,
যার অবগুণ্ঠনে

প্রকৃতি আর মানুষে শুভদৃষ্টির প্রথম বিনিময়
গানের গোধূলি লগ্নে।
সে কি আজ!
সে যে অনেক দিনের কথা,
সে যে অনেক দূরের ছবি।

১১. ১০. ৪৫

পঁচিশে বৈশাখ

ও বাড়ির দুষ্টু ছেলে গাবু,
বয়স খুব বেশি তো আট।
তার জ্বালায় পাড়ার লোকে অস্থির।
মা বলেন, পড়,
বাবা বলেন, একটুখানি চুপ করে বোসতো।
পাঠশালায় যাবার নাম ক'রে
সে বেরিয়ে যায়,
কোথায় পাঠশালা,
আর কোথায় বা পাঠ!
রায়েদের আমবাগানে তার পাঠশালা,
তার এবং আর কয়েকটি পোড়োর,
গাবু তাদের সর্দার।
ও জানে না এমন নয়,
অনেক কথাই জানে।
কার বাগানের লিচুতে রং ধরেছে,
কাদের গোলাপজাম পাখির চঞ্চুগ্রাহী হ'ল,
কোন্ গাছের আম সকলের আগে পাকে,

আর কোন্ গাছের আমই বা
সকলের চেয়ে মিষ্টি,
ও সব জানে !
কোথায় গাছের ডালে শালিকে বেঁধেছে বাসা,
জল-শুকানো কার পুকুরে
রুই উঠছে ভেসে,
সকলের আগে ও খবর পায়।
গাবুর জ্বালায় পাড়ার মানুষ পশু পক্ষী
সবাই অস্থির।

একদিন দেখি যে গাবু চুপটি ক'রে বসে আছে,
তা-ও আবার একা !
ব্যাপার কি ?
নিঃশব্দে পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম,
কান পেতে শুনি সে আওড়াচ্ছে—
"অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে
পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে,
জীর্ণ ফাটল-ধরা এক কোণে তারি
কুঞ্জ নিয়েছে বাসা অন্ধ ভিখারী।"
আমি তো অবাক্ !
গাবু কবে লেখাপড়া শিখলো,
কবে হ'ল তার কবিতা মুখস্থ,
কবে শিখলো সে এমন আবৃত্তি !
সে আউড়ে চলেছে—
"হরি হরি রব ওঠে অঙ্গন মাঝে
ঝন্‌ঝনি ঝন্‌ঝনি খঞ্জনী বাজে।"
ঐ গুঞ্জনের তালে তালে
দুলছে তার মাথা,

নড়ছে তার হাত,
গাবুর আজ এ কী অবস্থা!
অবাক্ করলে আমাকে।
বোধ করি পায়ের শব্দ হ'য়ে থাকবে,
বোধ করি কেশে থাকবো,
গাবু মুখ ফিরিয়ে দেখলো আমাকে,
অপ্রস্তুত হ'ল,
এমন ভাব দেখালো যেন পাখির ছানার সন্ধানে এসেছে
বলে উঠল—নাঃ পালিয়েছে পাজি পাখিটা,
আর তখ্‌খনি গেল চ'লে দ্রুত।

আমি রইলাম দাঁড়িয়ে,
মনে পড়লো রত্নাকর দস্যুর কাহিনী,
মনে পড়লো
আদি শ্লোক শুনে আদি কবির চমকিয়ে ওঠা।
আদিম অরণ্যের সরীসৃপ ছায়া
মর্মে মর্মে শিউরে উঠেছিল
ডম্বরুর সেই মন্দ্রিত নির্ঘোষে,
স্তব্ধতার অহল্যার বুকে জেগেছিল প্রথম স্পন্দন,
আর রত্নাকর
বৃক্ষতলে বৃক্ষের চেয়েও জড়বৎ রইলো দাঁড়িয়ে,
ওষ্ঠাধর শুধু নড়ছে,
নিশ্চল বনস্পতির পাতাগুলো যেমন চঞ্চল।

কবি তুমি বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ,
সেই ফাঁদে ঐ গাবু পড়েছে ধরা।
অভ্যস্ত দুষ্টুমিতে পড়লো তার ছেদ,
পাকা আম রইলো শাখায়,

পাখির ছানা গেল বেঁচে,
শুকনো পুকুরে রুই কাৎলা পেল রক্ষে।
এখন থেকে ওর জীবনে ঘটলো দ্বিধা,
ফাটল দিয়ে ঢুকলো আলো,
শব্দ হ'য়ে উঠল সঙ্গীত,
ওর কোষ্ঠিতে শুরু হ'য়ে গেল রবির দশা!
এমন আমাদের সকলেরি হ'য়েছে
আজ ক'পুরুষ ধরে,
আর চলবে এমন অনন্তকাল।
তুমি যখন ছিলে না বাঙালী ছেলেরা আবৃত্তি করতো কী?
তখনকার গাবুর দল কি কখনো আত্মবিস্মৃত হ'ত না?
দুর্ভাগ্য তখনকার পশুপাখির,
রুই কাৎলার,
আর পাড়ার বাগানের মালিকগুলোর,
ছেলেদের দুষ্টুমি ভুলিয়ে দেবার জন্যে
যখন তোমার জন্ম হয়নি।

কয়েকদিন পরে গাবুদের বাড়ির পাশ দিয়ে আসছি,
শুনলাম মহা হৈ হৈ!
ব্যাপার কি?
দেখলাম গাবুকে তার পিতা শিক্ষা দিচ্ছে,
অর্থাৎ গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে
তাকে মেরে চলেছে।
পাশে আরো কয়েকজন উপস্থিত,
বোধ করি অতঃপর তারা করবে শিক্ষাদান
—কি হ'ল খুড়ো, শুধোলাম তার বাপকে।
—দেখ না, পাশের বাড়ি থেকে নোট চুরি ক'রে এনেছে,
ও আসবার পরেই দশ টাকার একখানা নোট পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি বললাম, না, না, তাও কি সম্ভব ?
—তবে কেন ও মুঠ খুলছে না ?
দেখি সত্যি তার ডান মুঠ পাকানো,
এত মারের পরেও এতটুকু শিথিল হয়নি।
অভিযোগটা নিতান্তই চোখ পাকিয়ে রয়েছে,
তবু মনে হ'ল এ হ'তেই পারে না,
সেদিনের কথা পড়লো মনে।
আমি বললাম, আমি জানি তুই নিসনি,
মুঠ খুলে ওদের দেখিয়ে দে না!
এবারে আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো,
এতক্ষণ মুখ ছিল গুঁজে,
চোখে জলের সঙ্গে অপ্রস্তুতের মিশল,
সেদিন যেমন দেখেছিলাম তার চোখে।
আমাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে মুঠ খুলল,
ঘামে-ভেজা মুচড়ে-যাওয়া খবরের কাগজ-কাটা
একখানা ছবি—
রবীন্দ্রনাথের!
সে কানে কানে আমায় বললো,
আজ পঁচিশে বৈশাখ কিনা,
বিকালে সভা করবো আমবাগানে,
ছবি তো একটা চাই,
তাই ঐ........
সবাই শুধোলে—পেলে ?
পেলাম বই কি!
দশ টাকার নোট ?
না।
তবে ?
এর মূল্য দশ টাকার চেয়ে অনেক বেশী।

দশ টাকা যাদের সন্ধানের সামা
তারা চলে গেল।
রইলাম আমি আর গাবু।
বিকালে আমবাগানে হল সভা,
আমি সভাপতি, বক্তা শ্রীমান গাবু।
আমাকে তার আর লজ্জা ছিল না,
বুঝেছিল, আমিও তার মত কবির বন্দী!

সবিতৃদেব

রাজকুমারী রাজ্যশ্রী ছেড়েছে তার রাজ-আভরণ,
ধরেছে কাষায়—
উদার, নির্মল।
আভরণের আবরণে ঢেকেছিল তার যৌবন,
মহত্তর জীবনের
প্রসন্ন সূচনার
স্বর্ণ-করঙ্কবাহী।
এখন সে রিক্ত তাই পূর্ণ।
যেমন পূর্ণ নিরাবরণ সিন্ধু,
যেমন পূর্ণ নিঃস্বতায় ভাস্বর
গৌরীশৃঙ্গ চূড়া,
তেমন পূর্ণ, কবি, তোমার শেষ বয়সের কবিতা
অনাড়ম্বর মহিমায়।

অলঙ্কার প'রে সে মন ভুলিয়েছে,
অলঙ্কার ছেড়ে সে করে নিয়েছে চিত্তজয়।

তারার ঐশ্বর্যে মন ভোলায় শর্বরী,
কিন্তু সবিতার জন্মলগ্নের আসন্ন প্রভাতে
খুলে ফেলে দেয় তার সমস্ত আভরণ,
খুলে ফেলে দেয়
হীরামুক্তা চুনিপান্না প্রবাল বৈদুর্যের চোখ-ভোলানো
অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছতা।

বারে বারে তোমার কবিতা দাঁড়িয়েছে নবজন্মের প্রান্তে,
বারে বারে তোমার কবিতায় বেজেছে
নবজাতকের শঙ্খ।
এক জীবনে তুমি রচনা করেছ
বহু জন্মের জাতক।
নীহারিকার পুঞ্জিত স্বর্ণসূত্রভেদী
তোমার কবিতার গতি কোন্ নিরুদ্দেশে ?
প্রাতঃসূর্যদীপ্তি কোন্ সিংহদ্বারের পানে ?
নতুন যুগের,
নতুন জগতের,
নতুন জীবনের কোন্ দুর্নিবার লক্ষ্যে ?
তুমি নবজন্মের প্রজাপতি।
নতুনের গায়ত্রী তোমার কবিতা,
নতুনের গঙ্গোত্রী তোমার কাব্য,
পুরাতনের বন্ধনছেদী
সুদর্শন তোমার সঙ্গীত,
রাত্রির অন্ধকার সমুদ্রে স্নান-সমুজ্জ্বল
চিরকালের সবিতৃদেব তুমি ॥

১১. ১০. ৪৫

অগ্রন্থিতা

রেল ষ্টেশনের গল্প

ভোরের আলোর ফিঁকা সবুজ আঁধারে
ঠাহর না পাই কিবা ডাহিনে বাঁ ধারে
পড়িবে ষ্টেশন, তাই হু'দিকেই ঝুঁকি।
ক্রমে লৌহ এঞ্জিনের বক্ষ-ধুকধুকি
মন্দীভূত হ'য়ে এলো, উঠিল গুঞ্জন,
বাঁ দিকের প্ল্যাটফর্মে যাত্রী অগণন
পোঁটলা পুঁটুলি সহ; তারি এক পাশে
রেলিঙের দাগ-কাটা খণ্ডিত আকাশে
মূর্তি তার, ঘুম-ভাঙা নয়ন-উৎসুক
জানলার ফাঁকে ফাঁকে খুঁজিতেছে মুখ
পরিচিত। বুঝিলাম জেগেছিল আজ
শেষ রাত্রে, ব্যস্ততার চিহ্ন বহে সাজ
শিথিল শাড়ীতে, অশাসিত চূর্ণালক
সীমা অতিক্রমি এসে ললাট ফলক
করেছে চিহ্নিত, আর দৃষ্টি নয়নের
না-ঘুমানো নাহি-জাগা, এখনো স্বপ্নের
পদাঙ্ক বহন করে মহুয়া-পাণ্ডুর
হু'কপোল, ভাসমান নিদ্রার ভঙ্গুর
কলস ছুঁয়েছে সবে জাগৃতির তীর,
ফেটেছে এখনো তবু হয়নি চৌচির।
চোখে চোখে বেধে গেল, দৃষ্টি হু'জনার
অদৃশ্য মল্লিকারাশি করিল বিস্তার
ভোরের আকাশ ভরি, তাহার অধরে
অঙ্কুরি উঠিল এক হাসি থরে থরে,

পূর্ণাঙ্গ পল্লবে পুষ্পে, কালিন্দী-নয়ন
দুরন্ত কানুর স্নান-কর-বিতাড়ন
সুখের উদ্বেগে সহি তরঙ্গে পুলকে।
ওই মূর্তিখানি শুধু রয়েছে ভূলোকে
আর কিছু কোথা নাহি।

থামিয়াছে গাড়ী।
ব্যস্ততারে চাপা দিয়ে এলো তাড়াতাড়ি।
মুখ বলে ব্যস্ত সে যে, আস্তে চলে পদ,
গোপন প্রণয় সখী কেমন বিপদ
দেখো ভেবে। যদি হ'তে সত্যই স্বজন,
কালোচিত ব্যস্ততাই হইত শোভন,
নহিলে পাইতে নিন্দা। যদি হ'তে পর,
ধীরে সুস্থে কথা বলে হইতে তৎপর
স্বকর্ম সাধনে। এ যে গোপন প্রণয়!
সতর্কে লালিত এ যে কুন্তীর তনয়
কালস্রোতে নিত্য ভাসমান! সখী,
সত্য ক'রে বলো দেখি কখনো পরখি
নিজেরে আপন ভেবে বলেছ কি কভু,
এ প্রেম আমার? ভাবিয়াছ, হায়, তবু
আপনার বলিবারে হয়নি সাহস;
উদার অঞ্জলি ভরি ধরিয়াছ রস
সভয়ে, স্বভয়ে তারে ছোঁয়নি অধর,
গুপ্তপ্রেম আপনারে ক'রে দেয় পর।
যতক্ষণে ভাবিতেছি এই সব কথা,
তাহারে আনিল টানি গোপন ব্যস্ততা
আমার গাড়ীর দ্বারে, নামিলাম আমি,
ততক্ষণে গাড়ী গেছে একেবারে থামি।

বলিলাম,

"অবসর দশ মিনিটের,
আবার ছাড়িবে গাড়ী, ছাড়াছাড়ি ফের
অনিবার্য, কতকাল পরে পুনরায়
দেখা হবে কোন্‌খানে, কে বলিবে হায়।"

মুখে তার চেয়ে দেখি হাসির হাতুড়ি
উঠেছে উদ্যত হ'য়ে, দেবে ভাঙিচুরি
আমার রোমান্স স্বর্ণ! সে যে মণিকার,
হাসির আঘাতে তার গেছে কতবার
স্বপ্নের সুবর্ণ ভাঙি, কিন্তু সে কি জানে,
দলিত সে স্বর্ণ লয়ে এক মনে-প্রাণে
গড়েছি যে অলঙ্কার সাজায়েছি তায়
তিলমাত্র জীবনের তিলোত্তমায়?
সে কহিল,

"তত্ত্ব কথা না হইতে শেষ
গাড়ী ছেড়ে চলে যাবে, তার চেয়ে বেশ
সরল ভাষায় বলো শরীর কেমন?"

সে বলিল,

"রাগিও না, রেলের ষ্টেশন
নৈমিষ অরণ্য নহে, নিমিষ-গণিত
সময় নির্দিষ্ট হেথা। এ যদি হইত
কালের সমুদ্র! এ যে নিতান্ত পল্বল,
দশটি মিনিট মাঝে বেধে আছে জল
গল্পের গণ্ডুষ মাপে, তত্ত্বে কাজ নাই,
অল্পে যাহা বলিবার বলে যাও তাই।"
এবার আমার পালা। বলিলাম তারে,
"তত্ত্বনাশা তত্ত্ব তব, আকারে প্রকারে

নিতান্ত সে ছোট নহে।” কহিল সে হাসি,
“তা-ও বটে”, তারপরে আরো কাছে আসি
ভৃত্য-হস্ত হ’তে লয়ে কাগজের পেটি
বলিল সে,
“কামরায় রেখে দাও এটি,
পথে খেয়ো, এখনি না, যখন বিরহে
মনে হবে চিত্ত তব তুষানলে দহে,
লাগিতেছে চতুর্দিক মরীচিকাময়,
তখনি এ খুলিবার প্রকৃষ্ট সময়।
দেখিবে রয়েছে বাক্সে নতুন গুড়ের
স্বর্ণাভ সন্দেশ, আর টাট্‌কা ঘিয়ের
খানকত লুচি, আর সঙ্গে আছে তার
আলু ও বেগুন ভাজা ; যখন সংসার
সাহারা হইবে ভ্রম, এই মরূদ্যানে
ঢুকে প’ড়ো, মগ্ন হ’য়ো মধুরের ধ্যানে।
রসনায় সঞ্চারিত সন্দেশের স্বাদ
অন্তরের অলকায় পাঠাবে সংবাদ।
এ যে নব মেঘদূত। নিশ্চয় জানিও
ভুলিবে বিরহ দুঃখ, এই যে স্থানীয়
ঘটনা ও কথাবার্তা তা-ও তুলিবে না
মনের দিগন্তে মাথা, সব লেনা দেনা
চুকে যাবে। হৃদয়ের নিম্নেতে জঠর,
কবিকুল অনাদৃত বাস্তব কঠোর।”
কহিল সে,
“তুমি কবি, তাই এত করে
বুঝায়ে বলিতে হ’ল।” বলিলাম,
“থামো,
অযোধ্যা ছাড়িয়া যবে চলমান রাম ও

লক্ষ্মণ সীতারে সহ, তখনো তোমার
বিদ্রূপ মানে না ক্লান্তি।" সে বলিল হেসে,
"উপমার মৃগয়ায় রামায়ণে শেষে
যেতে হল, কবিদের দৃষ্টিই কি পায় না
নিকটে দেখিতে কভু? তারা বুঝি আয়না
অনন্তের। শিথানের দীপজ্যোতি ফেলি
ধ্রুবতারা উদ্দেশেতে দেয় পক্ষ মেলি
পড়িতে প্রিয়ার পত্র হতভাগ্য কবি।"
আমি বলি,
"রাখো, রাখো, বুঝিয়াছি সবি।"
সে বলিল,
"বোঝো নাই, পুরুষে বোঝে না,
কবিরা অবুঝ আরো। আকাশের শশী
সংসার সরসী নীরে পড়ুক না খসি,
কবিদের মুগ্ধ আশা, তাদের মানসী
মানসের মরীচিকা, পুরুষ সাহারা।
তাহার দিগন্ত ঘেরি কাঁপিছে যাহারা
তারা ওই তৃষাদগ্ধ চিত্তের বিকার,
বাস্তবে অস্তিত্ব তার নাই কোথা আর।"
"বিধাতা সাহারা করি গড়িয়াছে যদি,
সে কি আমাদেরি দোষ? চিত্ত নিরবধি
অনাদি কালের তাপে দগ্ধ হয়ে মরে,
সে কি আমাদেরি দোষ? পিপাসার শরে
হৃদয় আমূল বিদ্ধ; সোনার ভৃঙ্গার
সবারে সন্তোষ দেয়, ভোগবতী ধার
কবিদের আকাঙ্ক্ষিত। সে ত নহে দোষ!
কবিদের ভাগ্যে আছে অদৃষ্টের রোষ।
হতভাগ্য, কৃপাপাত্র, অভিশপ্ত তারা,

অপরাধী কেন ?   অসম্ভবের পাহারা
দাঁড়ায়ে রয়েছে নিত্য দিবস শর্বরী
সম্ভবের স্বর্গপানে পথ রুদ্ধ করি।"
সে কহিল,
        "থাক্, থাক্, এসো না বরং
সাধারণ গল্প করি।"

                    ঢঙ ঢঙ ঢঙ
বাজিল প্রথম ঘণ্টা, বলিলাম তারে,
"তত্ত্বকথা বলিবার সুযোগ সংসারে
অবিরল, শুধু নাই গল্পের সময়।"
সে বলিল,
        "এটাও তো কম তত্ত্ব নয়।
খেজুরের রস হ'তে কেহ করে গুড়,
মদ করে অন্য জনে ; আখের লগুড়
কারো পক্ষে চিনি আর কারো পক্ষে সুরা,
দুয়ে মিলে জীবনের পরিচয় পুরা।
কেহ গল্প করে, কেহ তত্ত্বজাল বোনে,
তত্ত্ব হ'তে গল্প শ্রেয় রেলের ষ্টেশনে।"

পুনরায় ঢঙ ঢঙ, সিগনাল নত,
দুলিছে নিশান নীল, কথা ছিল যত
অকথিত উড়ে গেলো নীলাভ্রের তীরে,
লৌহ অজগরখানা নড়ে ওঠে ধীরে।
কহিল সে,
            "কতবার বিদায়ের ক্ষণে
উঠায়ে দিয়াছ ট্রেণে, নিঃসঙ্গ ষ্টেশনে
দাঁড়ায়ে থেকেছ একা, আজ তার শোধ।
দেখোনি কি পথোপরি বদলায় রোদ

এপার ওপার করি ; আজ তুমি গেলে,
অতল শূন্যতা মাঝে একা মোরে ফেলে।”

যেই মনে হ'ল বাক্যে অশ্রুর আমেজ,
অমনি পড়িল এসে খর-হাস্য তেজ।
আপনারে সংশোধিয়া কহিল,
“অর্থাৎ,
এখনি বাসায় ফিরে খেয়ে ডাল ভাত
ইস্কুলে ছুটিতে হবে, রাঁধে যা জঞ্জালি,
রান্না খেয়ে কান্না আসে, বেঁচে থাকা খালি,
কেবলি জিনিষ নষ্ট।”—সব ব্যর্থ হায়,
বিদ্রূপের চেষ্টা আজ লুটালো ধূলায়।
মনে হ'ল চোখে তার একবিন্দু জল,
সমস্ত অস্তিত্ব তার করে টলোমল
আঁখির পল্লব প্রান্তে, অশ্বত্থের শিষে
কম্পিত শিশির বিন্দু। জানি তারে তাই
বুঝিলাম কি দুর্জয় চলেছে লড়াই
ওই অশ্রুটির সাথে। বলিলাম ধীরে,
“ 'যেতে নাহি দিব' বলে যাও চলে ফিরে।
যদিও বয়স তব চারের অধিক,
বুদ্ধির বিষয়ে নাহি বলা যায় ঠিক
সে কথাটা।”—বাস্, এই হাসির হাওয়ায়
ফলিল বিরুদ্ধ ফল, অশ্বত্থ আগায়
ঝরিল শিশির বিন্দু। ছাপাইয়া কূল
নিটোল সুডোল শুভ্র মুক্তাসম স্থূল
নামিতে লাগিল অশ্রু, যেন মজ্জমান
শকুন্তলা-অঙ্গুরীয় করিছে প্রয়াণ
জল তলে ধীরে, যেন জ্বলহুল্কা খসি

আকাশে গড়ায়, যেন জলঘটিকার
অন্তিম বিন্দুটি পড়ি করিবে প্রচার
শুভ লগ্ন ; অশ্রু যদি এমন সুন্দর,
না কাঁদিয়া হাসে কেন মুগ্ধ চরাচর !
পাষাণ মূর্তির মতো দাঁড়ায়ে সে আছে,
একটিরে অনুসরি আর গুলি পাছে
দেখা দেয়, না জুয়ায় তুলিতে রুমাল,
ও যেন পরের অশ্রু, অপরের গাল।

গাড়ী চলে, মূর্তি তার দূরে চলে যায়,
আন্দোলিয়া বাহুখানি জানালো আমায়
নীরব বিদায়। আরো দূরে, দূরে আরো
ফিকে হ'য়ে এলো ক্রমে রঙখানি গাঢ়
সবুজ গাড়ীর, শেষে ষ্টেশনের ভীড়ে
পাষাণের মূর্তিখানি মিলাইল ধীরে।
এতক্ষণে সুনিশ্চিত হাতের রুমাল
মুছিয়াছে গাল।

কিন্তু সে অশ্রুর কণা গড়ায় আমার
এখনো চিত্তের পরে, দর্পণে তাহার
বেদনার বিশ্বরূপ হেরি নির্নিমিখ ।
সুখ হ'তে দুঃখ, আর অশ্রুর স্ফটিক
সৌন্দর্যের শিখিপুচ্ছে বিশ্ব ঢাকিয়াছে,
যৌবনের কার্তিকেয় নিত্য ব'সে আছে
সে বাহনে অচঞ্চল ; প্রেমিক সে, তাই
অ-দার গৃহীত সত্তা, কন্দর্পের ছাই
তার জন্মবাসরের টানে যবনিকা,
বেদনার বিশ্বরূপ লিখিতেছে লিখা

বিচিত্র বৃহৎ। দুঃখ আছে, আছে প্রেম ;
অনুরাগ পদ্মরাগ, দুঃখ সে তো হেম,
দুয়ে মিলে রচিয়াছে অপূর্ব অঙ্গুরী,
একটি হইতে হ'লে আরেকটি চুরি
অসম্পূর্ণ দোঁহে। লোকে চাহে ভালবাসা,
তারি সঙ্গে সুখ চাহে, কি বিরুদ্ধ আশা!
দুঃখের সমুদ্র এ যে, মত্ত দশদিক,
জীবন-তরীর শীর্ষে চঞ্চল নাবিক
নাচিছে যে তালে তালে সে-তাল প্রেমের।
সমুদ্রে করিয়া যাত্রা আরাম গৃহের
কেবা চায়, কেবা পায়? যদি চাও সুখ,
আঁকড়িয়া থাকো তবে ধরিত্রীর বুক।
প্রেমে চিরচঞ্চলতা, যদি চাও সুখ,
দুঃখের গুণ্ঠনতলে অশ্রু-ঝরা মুখ
দেখিতে উদ্যম করো ; আমি দেখিয়াছি,
মর্ত্য সে সুধাবিন্দু চিরকাল যাচি
চাতকের চেতনায়। তৃষ্ণা আর বারি
সুখী পায় একপাত্রে, নিত্য ছাড়াছাড়ি
প্রেমিকের ভাগ্যে দোঁহে ; আছে তৃষ্ণা সুধা,
শুধু একপাত্রে নাই ; আছে খাদ্য ক্ষুধা,
শুধু একপাত্রে নাই ; আছে এই আশা!
পাওয়া আর চাওয়া ধায়, যেমন পূর্বাশা
একচক্ররথবেগে করিয়া চকিত
সূর্য চির-অন্বেষক, উষসী লজ্জিত
পালায় প্রেমের দ্বন্দ্বে, তবু কোনকাল
উষাপূষণের মাঝে প্রেমের জাঙাল
ছিন্ন নাহি হয় কভু। সাতাশ তারার
প্রেমিক চন্দ্রের পথে কি অমাবস্যার

আবর্তন। সুখী চন্দ্র, সূর্য সে প্রেমিক,
তাই তার দহনের সাক্ষী দশ দিক।

গাড়ী ছুটিতেছে বেগে, লাইনের পাশে
শ্যামগুল্ম ঝোপঝাড়, তখনো আকাশে
অপ্রখর সূর্যতেজ, কিরণ-অঙ্গুলি
শিশিরের জপমাল্য লয় নাই তুলি
ধরার অঞ্চল হ'তে, দু'দিকের মাঠ
নিদাঘের চিহ্ন বহে, ধরিয়াছে ফাট
গভীর সুদীর্ঘ কত, দূর গিরিশ্রেণী
রুক্ষ, দগ্ধ, অনুর্বর, ঝরায় না বেণী
ঝরণার, হেথা হোথা নদী শুষ্ক খাত,
বিস্তারিত দিকে দিকে কি অভিশম্পাত
দুর্বাশার! মাঝে মাঝে ক্বচিৎ ষ্টেশন,
গাড়ী থামে, ওঠে নামে দুই চারিজন,
আবার অনন্ত মাঠ। রৌদ্র ক্রমে বাড়ে।
ধূসর শাড়ীর জমি কিংশুকের পাড়ে
কে অঙ্কিল ক্লান্তিহীন! বিবর্ণের পরে
অন্তহীন পলাশের মেঘ থরে থরে
কে আনিল, যেন এক রঙীন কুয়াশা,
এখনি মিলায়ে যাবে, পিপাসার ভাষা
মিলাবে তৃষ্ণার তলে! আবার ষ্টেশন,
স্তব্ধতার মরুভূমে ক্ষণিক গুঞ্জন,
ক্ষুদ্র মরূদ্যান সম। গাড়ী দিল ছাড়ি,
দুরন্ত অনন্ত বেগে দেয় দীর্ঘ পাড়ি
ভেদ করি দুদিকের চিত্র একটানা।
ভূগোল রহস্যটুকু না থাকিলে জানা

মনে হবে একই ছাপ কোন্ বেরসিক
ছাপিয়াছে বারংবার। দুদিকেই ঠিক
একই ছবি, রুক্ষ গিরি, গাছ বেঁটে বেঁটে,
ভাঙা মাঠ, রাঙা পথ, পোড়া কালো মেটে
তৃণহীন ভূ-প্রাঙ্গণ, বালুর রেখায়
অনুমানগম্য নদী, বলি-চিহ্ন প্রায়
ঊর্মিল বালুকাস্তূপ, পৃথিবীর মুখ
বেদনার বিকারের ব্যর্থতার দুখ
করেছে বিকৃত যেন ; গাড়ী ছুটিয়াছে,
জনহীন, প্রাণীহীন রিক্ত পড়ে আছে
দু'দিকে বিস্তৃত মৃত চাঁদের জগৎ—
মাঝখানে সরু এক দীর্ঘ রেলপথ।

১৯৪৮

একদা

রক্তে আমার জ্বলতো আগুন দেখলে তোমায় সখী
যখন সেদিন কোথায় গেছে চলে,
চুম্বনেরি চকমকিতে ফুলকি বরখি
সাধের সৌধ কতই গেছে জ্বলে।
চলুক সখী, জ্বলুক সখী,
স্বপ্ন-সোনা গলুক সখী,
ভাসিয়ে দিয়ো মূর্তি গড়া হ'লে।

সে-সব স্মৃতি মেঘদূতের হারিয়ে যাওয়া শ্লোক,
দৈববশে হঠাৎ মনে পড়া,
স্মরগরলে কাজলটানা তোমার দুটি চোখ
মুহুর্মুহু বিষামৃত ঝরা।

পড়ুক সখী, ঝরুক সখী,
মদন পুন মরুক সখী,
স্মরণে হোক সুখ-সরণি গড়া।

সে-সব স্মৃতি মশাল হাতে করছে ছুটোছুটি,
অতীতটারে বহ্নিশূলে হানে,
দস্যু তারা, ভীষ্ম তারা, যা পায় লহে লুটি
ভাঙন ধরা সর্বগ্রাসী টানে।
হানুক সখী, টানুক সখী,
বিরহ কিবা জানুক সখী,
উদাসী যে-বা বসিয়া আছে প্রাণে।

যে-আগুনে সাগর জ্বলে কেমন দাহ তার!
অকূল নীল আবেগে হয় রাঙা।
চাঁদের টানে টলমলিয়ে ওঠে যে পারাবার
বৃথা মিলন স্বপ্ন সুখ ভাঙা।
রাঙাক সখী, ভাঙাক সখী,
অতল মাঝে আনাক সখী
চরণ দুটি রক্ষা তরে ডাঙা।

দাবানলের হরিণ ভীত যে দিক পানে ধায়
জাগে সেথায় অগ্নিময় দ্বারী,
পালাতে শেষে ভুলিয়া গিয়ে দাঁড়িয়ে মরে ঠায়,
চক্ষে লাগে মৃত্যু মনোহারী।
জাগুক সখী, লাগুক সখী,
ঘাতক কাছে মাগুক সখী
সুখ মরণ চরম তরবারি।

নয়নানলে জ্বালিয়ে দিলে আমার যত সব,
এখন হেরি ভস্ম শুধু ওড়ে,
সে রাজপুরী আজিকে হায় নীরব-উৎসব,
স্মৃতি-বাহুড় অন্ধভাবে ঘোরে।
উড়ুক সখী, ঘুরুক সখী,
দগ্ধ পুন পুড়ুক সখী,
সে তাপে প্রাণী ধন্য হ'য়ে মরে।

জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে নয়কো এত সোজা,
ফুলের ভারে ডাল যে ভেঙে পড়ে,
কেমন করে নামবে বলো অদৃশ্য যে বোঝা,
উষা রঙীন পূষণ প্রেম ভরে।
ভাঙুক সখী, রাঙুক সখী,
মন যে তোমার মানুক সখী,
একদা ভালো বাসিয়াছিলে মোরে॥

২১. ১১. ৫৮

দ্বন্দ্ব

গোপন প্রেমের চুম্বন সম
আমার কবিতাগুলি
বড় ভয়ে ভয়ে আকাশে তাকায়
করুণ নয়ন তুলি।
করুণ নয়ন তুলি,
পাছে বনফুলধূলি
তোমার মূরতি করে গো আবিল
রচিয়া কুয়াশাতম।

ধরা দিল তার পাপড়ির পরে
সন্ধ্যা মেঘের লীলা,
রেখায় রেখায় মিশায়ে নিয়েছে
দূর আকাশের নীলা।
দূর আকাশের নীলা,
অরুণ জতুঃশিলা
নিপুণ তুলিতে মিশিয়া গিয়াছে
কত না সোহাগ ভরে !

নবীন কবির কবিতার মত
গূঢ় চুম্বন তব,
আপনার রবে আপনি চকিত
সাধ্বসে অভিনব।
সাধ্বসে অভিনব,
যেন কোন্ কবি নব
গোপন ভাবের মূর্ত বিকাশে
বিস্ময়ে থতমত।

কালবৈশাখী-বিদ্যুৎদ্যুতি
চুম্বনে তব সখী,
কোন্ অতলের রহস্য হতে
মুহূর্তে ঝকমকি,
মুহূর্তে ঝকমকি
মুক্ত করিল ও কি
বাসনার ডোরে বাঁধা পাখিটারে
শুনিল না কোন স্তুতি।

আমার কবিতা তব চুম্বন
লক্ষি পরস্পরে
জীবনের চির মল্লদ্বন্দ্বে
ফিরিছে জগৎ পরে,
ফিরিছে জগৎ পরে,
কেহ কারে নাহি ধরে,
অদৃশ্য সেই মন-সজ্ঘাতে
বিদ্যুৎবরিষণ
ভরি তোলে ত্রিভুবন ॥

২৫. ৫. ৫৯

শেষ চুমুকের সুধা

এখনো রয়েছে জীবনপাত্রে
শেষ চুমুকের সুধা,
এখনো রয়েছে নিভৃত পরাণে
শেষ চুমুকের ক্ষুধা।
আছে আছে সখী আছে।
পূর্ণিমা গেলে হয় না আঁধার,
কৃষ্ণা দ্বাদশী শশী
হৃদয়-গলানি অমৃত তলানি
ছড়ায় দু হাতে বসি।
আছে আছে সখী আছে।

নয়নে এখনো স্তিমিত বাসনা
উঁকি মারে কোণে কোণে,
অধর এখনো স্বপ্নের কানে
চুম্বন-রব শোনে।

আকাশে যে চাঁদ শান্ত তাহার
ছায়াখানি জলে নাচে।
আছে আছে সখী আছে।

আছে আছে সখী আছে।
সুখের সেতার দুখের আঙুলে
বাজে বক্ষের কাছে।
দূর হতে যারা শোনে ভাবে তারা
কেবলি এ হাহাকার,
শেষ চুমুকের চরম আশায়
কাঁপে যে অন্ধকার।
সুধার স্পর্শ ভোলে নি সাগর,
কত মন্থু মরিয়াছে,
আজিও চাঁদের পেয়ালা হেরিয়া
দুই হাত তুলে যাচে।
আছে আছে সখী আছে॥

২৫. ৫. ৫৯

চন্দ্রোদয়

দেখিয়াছি চন্দ্রোদয় সাগরের নীরে,
ভাসমান শিশু কর্ণপ্রায়
ক্ষুদ্র অসহায়।

দেখিয়াছি চন্দ্রোদয় শিখরের শিরে,
মৃগবাহী ক্লান্ত পদপাত
মন্থর কিরাত।

দেখিয়াছি চন্দ্রোদয় নগরীর ভিড়ে,
নাহি জানে কোথা দিগ্বিদিক
উদ্‌ভ্রান্ত পথিক।

সে চন্দ্র উদিল যবে তোমার আড়ালে
কাল সন্ধ্যাকালে,
নব অর্থ নব জ্যোতি করিল সে লাভ,
ছন্দের কিরীট যেন পরিল প্রলাপ
শ্রান্ত ভাল ঘিরে।
দেখিয়াছি চন্দ্রোদয় কত না তিমিরে॥

৭. ৬. ৫৯

কি সান্ত্বনা

কে জান্‌ত যে বিদ্যুতের চলিষ্ণু চমকে
রূপ চলে যায়,
কে জান্‌ত যে সৌন্দর্যের অসি ঝকঝকে
আঁধারে মিলায়।
কে জান্‌ত! বলেছে তারা করি নি বিশ্বাস,
এমন রূপের পড়ে অন্তিম নিশ্বাস!
দেবকাম্য উর্বশীর দেহে ছিন্ন বাস,
বিষাদের অশ্রু নাকি দেবতার চোখে!

কে জান্‌ত যে তুষারের অবার্য নিয়মে
প্রেম চলে যায়,
দ্বিখণ্ডিত ইন্দ্রধনু লুপ্ত হয় ক্রমে
দিবাস্বপ্নপ্রায়।

চন্দ্রমুগ্ধ সমুদ্রের ছন্দে ওঠাপড়া,
সাধ যবে স্বপ্নরূপে দেয় প্রায় ধরা,
কোথা যায়, কোথা গেল, কাঁপে সে থথরা,
অতর্কিত মেঘ যদি নভঃপ্রান্তে জমে।

রূপ নাই, প্রেম নাই, তবু বেঁচে আছি,
এও এক থাকা,
মধুহীন পুষ্পহীন মনের মৌমাছি
বন্ধ করে পাখা।
রূপ দিয়ে প্রেম দিয়ে এই পৃথিবীর
এঁকেছি বাসর সাধে অঞ্জন আঁখির,
নেভালো নয়নবহ্নি নয়নের নীর,
আজ তবু দাবানল কি আশ্বাসে যাচি॥

১৩. ১২. ৫৮

বিগত

কুসুমের কাল গত আমাদের,
পড়ে আছি শুধু দু জনে,
ফুলহীন বনে সূত্র বুনিছে
কত কোকিলের কূজনে।
জমায়ে রোদের আভা যে
উঠেছিল ফুটে চাঁপা যে,
কত না বহ্নি মেলিল রসনা
বনাঙ্গনার ব্যজনে।

কুসুমের কাল এসেছিল বনে
একটি বানের কোটালে,
শিমুলে পলাশে রঙনে অশোকে
কত না কুসুম ফোটালে।

চুম্বনসার করবী
কার বিলাসের গরবী,
আমের মুকুলে অলিগুঞ্জনে
কত খর শর ছোটালে।

কবিতার কাল গত হল মোর,
গেল কোন্ দূরে সরিয়া,
ছন্দ আজিকে জ্যা-হীন ধনুক,
লুটায় মরমে মরিয়া।
কার কাঁকনের ঝলকে,
ভাষা উছলিত বলকে,
কৃষ্ণা শশীর দলগুলি যায়
তিথিতে তিথিতে ঝরিয়া।

কুসুম ঋতুরে বিঁধেছে হঠাৎ
কাল নিষাদের সায়কে,
ক্রৌঞ্চীকরুণ কবিতা আমার
কেঁদে ডাকে তার নায়কে।
সে কাঁদনি খানি ভাসিছে,
কোন্ দূর হতে আসিছে,
গাহিছে সে কোন্ মনোলোকবাসী
ত্রিদিববিরহী গায়কে॥

১. ২. ৬০

অসম্ভব

কেউ কখনো মনের কথা বলতে পেরেছে,
প্রকাশ ক'রে বলতে পেরেছে,
নিঃশেষিয়া বলতে পেরেছে ?
কেউ পারে নি কেউ।

চাঁদ কি পারে মনের কথা
আকাশ-জোড়া তন্ময়তা
বলতে তারার কানে ?
তবে কলঙ্কে মুখ মলিন কেন,
বলবে কে তার মানে ?
কেউ পারে না কেউ।
গোলাপ যতই প্রলাপ বকুক,
মনের গোপন শেষ কথাটুক
বলবে পাতার কাছে ?
তাই কাঁটার ছুতোয় রাঙিয়ে উঠে
বাউল হয়ে নাচে।
কেউ কখনো মনের কথা বলতে পেরেছে,
প্রকাশ ক'রে বলতে পেরেছে,
নিঃশেষিয়া বলতে পেরেছে ?
কেউ পারে নি কেউ।

কেউ কখনো মনের কথা জানতে পেরেছে,
আপন জনের জানতে পেরেছে,
আপন মনের জানতে পেরেছে ?
কেউ পারে নি কেউ।
রোদের রেখা দীঘির জলে
তলিয়ে ক্রমে যায় অতলে
মনের কথা খুঁজে,
শেষে সন্ধ্যাবেলা মিলিয়ে যায়
আঁধারে মুখ গুঁজে।
দুপুর বেলা ঘুঘুর ডাকে
আকাশ যবে ঘুমিয়ে থাকে,

বাতাস পাতে কান,
যদি   স্বপ্ন-সূতোর জটিল পথে
পায় কোন সন্ধান।
কেউ কখনো মনের কথা জানতে পেরেছে,
আপন জনের জানতে পেরেছে,
আপন মনের জানতে পেরেছে ?
কেউ পারে নি কেউ।

কেউ কখনো আপন জনে ডাকতে পেরেছে,
নামটি প্রিয় ডাকতে পেরেছে,
পরাণ ভ'রে ডাকতে পেরেছে ?
কেউ পারে নি কেউ।
সাগরবারি হাজার সুরে
ডাকছে দিবারাত্রি জুড়ে,
নীরব তবু ধরা,
সে নাম কোথা স্বপ্ন ভেঙে
হবে স্বয়ম্বরা।
একলা রাতে বিপুল বিধু
ছড়িয়ে মরে নামের সীধু
আলোক সুধাসার,
ওরে   ঘুমভাঙানো জীয়নকাঠি
নাইকো হাতে তার।
কেউ কখনো আপন জনে ডাকতে পেরেছে,
নামটি প্রিয় ডাকতে পেরেছে,
পরাণ ভ'রে ডাকতে পেরেছে ?
কেউ পারে নি কেউ।

কেউ কখনো চরম ভাল বাসতে পেরেছে,
আপন ভুলে বাসতে পেরেছে,
জগৎ ভুলে বাসতে পেরেছে ?
কেউ পারে নি কেউ।
যতই ভাল বাসুক তবু
নিঃশেষিয়া যায় না কভু,
একটু থাকে হাতে,
না-পাওয়া সেই বেঁধায় কাঁটা,
তৃপ্তি নাহি যাতে।
যতই পাবে প্রণয়সুধা
একটু কোথা রইবে ক্ষুধা,
সেইটুকুরি তরে,
তোমার সকল পাওয়া ব্যর্থ লাগে
জগৎ ভেঙে পড়ে।
কেউ কখনো চরম ভাল বাসতে পেরেছে,
আপন ভুলে বাসতে পেরেছে,
জগৎ ভুলে বাসতে পেরেছে ?
কেউ পারে না কেউ॥

১৯. ১২. ৫৮

ঝাউ

রে ঝাউ উদাস,
উদ্‌গ্রীব প্রত্যাশাভরে কি দেখিতে চাস ?
জন্ম-সমুদ্রের তীর
নারিকেলে সুনিবিড়,
যেথা তোর ছিল আদি বাস,
হেথা হতে দেখিতে কি পাস ?

ঝাউ উদাসীন,
উৎকর্ণের কানে কানে পশিছে কি ক্ষীণ
মাঝে মাঝে আচম্বিত
সমুদ্রকল্লোল গীত,
যেন কোন্ সন্ত-থামা বীণ ?
শুনিস কি সারা নিশিদিন ?

রে ঝাউ উদাসী,
উৎকণ্ঠের চোখে কোন্ স্বপ্ন ওঠে ভাসি !
সিক্ত সিকতার পরে
তরঙ্গ আছাড়ি পড়ে
ছড়াইয়া মুক্তা রাশি রাশি,
রবিকরে বিদ্যুৎ উদ্ভাসি।

রে ঝাউ ধূমল,
কার দীর্ঘশ্বাসে গড়া দেহ তোর বল্।
পুঞ্জিত বেদনা কার
করে নিত্য হাহাকার,
গুমরিছে বেদনা অতল !
এর চেয়ে ভাল অশ্রুজল।

ওরে ঝাউ শোন্,
উচ্চকিত করে শূন্য বিদ্ধ পাখী কোন্ !
দুঃখ যার ভাষা পায়
ম'রেও সে বেঁচে যায়,
বোবা দুঃখ হৃদয়ের ব্রণ,
কণ্ঠরোধী নির্বাক বেদন॥

২৯. ১১. ৫৮

সেই খানে

দিগন্তে যেথা গিরি উঁকি মারে,
অরণ্য টানে কাজলরেখা,
ছায়ার আঁচল চোখে টেনে নিয়ে
দূরে সরে যায় বাষ্পলেখা—
সেইখানে মন সেইখানে।

কৃষ্ণসারের শঙ্কাপাণ্ডু
কৃষ্ণা তিথির চন্দ্রকলা,
আপন আলোয় আপনি চকিত
দিগন্ত ঘেঁষে অচঞ্চলা—
সকল স্বপন সেইখানে।

গেরুয়া মাটির জোয়ারের শিরে
জাগে যেথা নব কাশের শিষ,
পাখির পাখায় ধানের আভায়
অমিল যেথায় উনিশ-বিশ—
তন-মন-ধন সেইখানে,
সেইখানে মন সেইখানে।

রাত্রি যেথায় তারা-ভাস্বর,
হীরকপ্রখর দিনের আলো,
ঘুঘুর বিলাপ তল নাহি পায়,
নীরবতা যেথা নিথর কালো—
সেইখানে মন সেইখানে।

পাখির তানেতে গুণ টেনে চলে
প্রহরের ভারী তরণীগুলি,

আকাশধেনুর তারা-ক্ষুর-ছাওয়া
পশ্চিমে যেথা নামে গোধূলি—
সকল স্বপন সেইখানে।

আকাশ যেথায় প্রেমে নেমে এসে
ধরারে পরায় দিগ্‌বলয়,
স্বর্গ যেখানে ভূস্বর্গরূপে
নবরূপরসে কি তন্ময়—
তন-মন-ধন সেইখানে,
সেইখানে মন সেইখানে॥

অক্টোবর, ১৯৫৯

সংসার

অলীক মায়ায় কর নি মুগ্ধ,
হে সংসার,
কহ নি মিথ্যা কথা,
বৃথা আশা দিয়ে কর নি লুব্ধ,
কর নাই চপলতা,
হে সংসার।

অমৃত-ঘটের কর নাই ছলা,
বলেছিলে চাঁদে আছে ষোল কলা,
তবু অমাবস্যার দিয়েছ ইশারা
পূর্ণিমা যবে গতা,
কহ নি মিথ্যা কথা,
হে সংসার॥

বলেছিলে বটে আছে হেথা প্রেম,
হে সংসার,

নহে সে মিথ্যা নয়,
বল নাই তাহা নিকষিত হেম
স্বর্গের সুধাময়,
হে সংসার।
ফুলে আছে কাঁটা, প্রেমে অবসান,
চকিতে কখন নিভে যাবে প্রাণ,
অকপটে তুমি বলেছিলে সব,
কতটুকু লাভ ক্ষয়,
নহে সে মিথ্যা নয়,
হে সংসার॥

বলেছিলে তুমি আছে আছে রূপ,
হে সংসার,
বল নি চিরন্তন,
বলেছিলে আছে কুসুমের স্তূপ,
আছে মক্ষিকা, ব্রণ,
হে সংসার।
ফুলের কাঁটায় শোণিত ঝরায়,
রূপের আগুনে ঘর পুড়ে যায়,
হবে না এমন বল নি কখনো
জানে তা আমার মন,
আছে ফুল, আছে ব্রণ,
হে সংসার॥

বল নাই তুমি হাতে তুলে দেবে,
হে সংসার,
আশার অতীত ফল,

বলেছিলে তুমি—'দেবে আর নেবে,
এ নিয়ম মেনে চল্,'
হে সংসার।
আধেক শুনেছি, শুনি নাই আধা,
শুনেও ভুলেছি, সেখানেই বাধা,
আপনার মনে ব্যাখ্যা করিয়া
গড়েছি আশার ছল,
চেয়েছি চরম ফল,
হে সংসার॥

তুমি নির্দোষ, তবু তোমা দুষি,
হে সংসার,
তবুও না পাই লাজ,
সাধ্য মতন সকলেরে তুষি
তুমি করে যাও কাজ,
হে সংসার।
স্বর্গ নহ যে জানি তাহা জানি,
অসীম সুখের নহ রাজধানী,
সব জেনে তবু সব পেতে চাই
চির বুভুক্ষা-রাজ,
তবুও না পাই লাজ,
হে সংসার॥*

২৯. ১১. ৫৮

* টমাস হার্ডির একটি কবিতার প্রেরণায়



প্রমথনাথ বিশীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে আর তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'কিংশুক বহ্নি' প্রকাশের কাল ১৯৫৯ সাল। মাঝখানে ছত্রিশ বৎসরের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে তাঁর দশ বারো-খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতার সংখ্যাও অল্প নয়। 'প্রাচীন আসামী হইতে' ও 'প্রাচীন পারসীক হইতে' পর্যায়ের চতুর্দশ পদাবলী ছাড়া আর সব কাব্য থেকেই কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। সঙ্কলনের ভার কবি নিজে নিয়েছেন। কবি নিজে এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিচারক কিনা সে তর্ক না তুলেও বলা যায় যে কবি নিজে এই ভার গ্রহণ করাতে আর বহু বিতর্ক নির্মূল হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে কবির প্রথম ও সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ প্রকাশের সময়ের মধ্যে যে ছত্রিশ বছরের ব্যবধান—তা যে কোন কবির কাব্যপ্রকৃতি বিচারের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। সেই বিচারে প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে যে প্রমথবাবু বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধের কবি। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ ছুটি বিষয়কে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কাব্যে—প্রকৃতি ও নারী। সৌন্দর্যবোধ যখন মানুষে আরোপিত হয় তখন তাকে প্রেম আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই বলা চলে যে প্রমথবাবুর প্রেমের কবিতাও রূপান্তরে সৌন্দর্যের কবিতা। এ-যুগে কবিদের মনকে এমন বিষয়ে নাড়া দিয়েছে আগের যুগে যা কবিতার বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হতো না। প্রমথবাবুর কবিমন যুগের হাওয়ায় আন্দোলিত হয়নি। কিন্তু তাঁর কবিমনটি আন্দোলিত হয় নি বলেই যে তিনি যুগের দাবী অস্বীকার করেছেন তা মনে করলে অন্যায় হবে, তাঁর গদ্য রচনায় যুগের বিচিত্র প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। যুগ প্রভাবের ঊর্ধ্বে অবস্থিত তাঁর কবিমনকে রুচি ও বিচারবুদ্ধি ভেদে সঙ্কীর্ণ বা অনন্যতন্ত্র বলা যেতে পারে। প্রমথবাবুর কাব্যে চারজন কবির প্রভাব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়—কালিদাস, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ ও কীট্‌স্‌। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ঋণ সমধিক হলেও কীট্‌স্‌ যে তাঁর প্রিয়তম কবি একথা গোপন রাখেন নি প্রমথবাবু।